৬ষ্ঠ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৬। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।
July 1909.

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ডাঃ মাঃ লাগে না।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

সুরমা

সুরমা মর্ত্তের পারিজাত !

স্বর্গের পারিজাতের রং কেমন, গন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মন-মাতান, তার আর কোন্ সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পারিজাতের প্রত্যক্ষসৌরভ কতকটা ধারণায় আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় "সুরমা" ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের "সুরমা" মর্ত্তের পারিজাত। "সুরমা" সকলগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ সুগন্ধি কেশতৈল।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৷০ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৷৶০ তের আনা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী এসেন্স

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুল ফুলের মত অটুট সুন্দর

দিল্ অব্ রোজ্।—ইহার সৌরভ কেমন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। বস্তুতঃ ইহা একটী অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপসার।—নামমাত্রেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গমাতা।—বাঙ্গালার "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ।

খস্‌খস্।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খস্‌খসের মত এমন আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড়—বড় মধুর।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ টাকা। মাঝারি ৷৷৷০ বার আনা। ছোট ৷৷০ আট আনা। প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট তিন শিশি ১।০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৷৷৷০ বার আনা, ডাকমাশুল ।৶০ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ৷৷০ আট আনা। মাশুলাদি ।৶০ পাঁচ আনা। আমাদের অটো ডি রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস্ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অভিনয় ও অভিনেতা।

যখন প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাশন্যাল থিয়েটার ত্যাগ করিয়া আমি ষ্টার থিয়েটারে আসি, তখন প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে মহেন্দ্রলাল (বসু) মৎপ্রণীত "সীতার বনবাস' নাটকে লক্ষ্মণের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। ষ্টারে 'সীতার বনবাস' অভিনয় আরম্ভ হইলে অমৃতলাল লক্ষ্মণের ভূমিকা গ্রহণ করেন। উভয়েরই অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলেও অমৃতলালের অভিনয়ে একটু বিশেষ পার্থক্য দেখা গেল। লক্ষ্মণ আসিবামাত্র হঠাৎ যখন রামের মুখে শুনিলেন—"সীতা দুষ্টা নারী, তাহাকে বনে রাখিয়া আইস"—তখন অমৃতলাল-লক্ষ্মণ অমনি বসিয়া পড়িলেন; অমৃতলালের এই নূতন অভিনয়টী দর্শকের বড়ই মর্ম্মভেদী হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারে যখন 'মেঘনাদ বধে'র অভিনয় হইত, তখন রামের ভূমিকা মেঘনাদের তুলনায় দর্শকের চক্ষে নিকৃষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয়ে রামের ভূমিকা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও মেঘনাদের ভূমিকায় প্রায় সমতুল্য হইয়াছিল।

গোপাল নামে একজন ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনেতা মাইকেলের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।" প্রহসনে গদা খানসামা সাজেন। এই খানসামা অভিনয়কালে সিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দু তাহাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দিতেছিলেন —ইহাতে গদা চটিয়া আগুন; সে বলিল, "কর্ত্তাবাবু, তোমার কোন পুরুষে খানসামাগিরি জানে না, তুমি খানসামাগিরি আমায় কি শেখাতে এসেছ? — আমরা সাতপুরুষে খানসামা।" সে সময়ে যদি মাইকেল হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইতেন, তবে তিনি গদার মুখে এই অভিনব কথাগুলি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেন,—এ আবার কোন্ "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।" অভিনয় হইতেছে! গোপালের এই গদার অভিনয় অন্য সকল গদা হইতে পৃথক হইয়াছিল এবং ইহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে তাঁহাকে সকলে 'গদাগোপাল' বলিয়া ডাকিত। তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীর প্রহসনে মুন্সেফের ভূমিকা পাইয়াছিলেন। এই মুন্সেফের ভূমিকা তৎপূর্ব্বে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করিয়া

"জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন" বটে কিন্তু 'গদা গোপাল' স্বীয় নিপুণতাবলে এ ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর পার্শ্বে দাঁড়াইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়েও সুধিগণ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, একই ভূমিকা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাগণ স্ব স্ব প্রথায় সুন্দর অভিনয় করিয়া থাকেন। উক্ত দৃষ্টান্ত-গুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে "অমুক অভিনেতা এই ভূমিকা জ্বালাইয়া দিয়াছে" এরূপ কথা সমীচীন নহে।

একই ভূমিকা যে দুই ভাবে অভিনীত হইতে পারে তাহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত 'সিডন্‌স্‌' ও 'সারা'র লেডী ম্যাকবেথ্‌। এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটী বৈদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলেন যে "To be or not to be, that is the question, &c. &c." হ্যাম-লেটের এই অংশটুকু দুই ভিন্ন রঙ্গালয়ে দুইজন ভিন্ন অভিনেতা ভিন্নরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। একজন ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে—আর একজন চিন্তামগ্ন ধীরভাবে। রায় মহাশয় বলেন যে, উভয় নটই কৃতী; তবে এই দুই নটের দুই প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে কেন স্থির করিতে পারেন নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি না। হ্যামলেট সম্বন্ধে হাজ্‌লিটের "Character of Shakespear's plays" নামক প্রবন্ধে আছে এবং অধিকাংশ সমা-লোচকেরই মত এই যে "It is not a character marked by strength of will or even of passion, but by refinement of thought and sentiment," অর্থাৎ এই চরিত্রে ইচ্ছাশক্তির বল বা মনোবৃত্তির বেগ নাই। মার্জ্জিত ভাব ও চিন্তাই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং এই চরিত্র বিশ্লেষণের সার্থকতা—"To be or not to be" &c. এই স্বগত উক্তিতে যেরূপ পরিস্ফুট অন্যান্যস্থলে সেরূপ নহে। হ্যামলেট বলিতেছে—'জীবনধারণ কিম্বা বিসর্জ্জন —ইহাই ত সমস্যা আমার। মৃত্যু—হয়ত সে নিদ্রামাত্র। কিন্তু স্বপ্ন যদি রহে সে নিদ্রায়—ঐ ত হতেছে ভয়।" হ্যামলেট নির্জ্জনে তন্ন তন্ন করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার উত্তর বিচার করিতেছে। অতএব হ্যামলেটের এ ভূমিকায় যে অভিনেতা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করে সে ব্যক্তি,—আমাদের রঙ্গালয়ে যাহারা বীররসে তর্জ্জন গর্জ্জন ও করুণরসে পুরুষের ভূমিকায় স্ত্রীলোকের ন্যায় হাউ হাউ করে, তাহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ অভিনেতা বলিয়া উক্ত হইতে পারে। সে যে আদৌ সেক্‌সপিয়ার বোঝে নাই—ইহা নিশ্চিত হইতে নিশ্চিততর।

একই অংশের বিভিন্নভাবে অভিনয় সম্বন্ধে দেশীয় রঙ্গালয় হইতে পুনশ্চ একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নটশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার প্রশংসা কথনে উক্ত রায় মহাশয় অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় "বিল্বমঙ্গল" নাটক হইতে একটী দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থলে চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—"তুমি অতি সুন্দর,—অতি সুন্দর!" পূর্ব্বে একজন অভিনেতা এই "অতি সুন্দর" ছত্রটী উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কর্তৃক শিক্ষিত নট এই স্থলে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্নকণ্ঠ করিয়া আনিত। রায় মহাশয় বলেন অর্দ্ধেন্দু কৃত এই পরিবর্ত্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমি বিনীতভাবে বলিতেছি, তাঁহার এই মতের সহিত আমার অনৈক্য আছে। রায় মহাশয় বলেন যে উত্তরোত্তর চীৎকারে কামভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু ক্রমে নিম্নকণ্ঠে বলিলে কামভাব বর্জ্জিত হয়,সেইজন্য দ্বিতীয় প্রকারের অভিনয় তাঁহার চক্ষে সুন্দর। আমার মতে এ স্থলে কামপ্রভাব প্রকাশই নটের উচিত। ক্রমে কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করিলে প্রদর্শিত হয় যে সরলহৃদয় কুহকিনীর রূপজালে জড়িত হইয়াছে। সেই মায়াজাল ছিন্ন করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম "অতি সুন্দর" আছে—"নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও" এই কথার পর। দ্বিতীয় বারে আছে—"চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!" তৃতীয়বারে এইরূপ—"নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী, কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর"! বিল্বমঙ্গল 'অতি সুন্দর' বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা করিতেছে না—বলিতেছে—এ রাক্ষসীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু ঘৃণিত! কাম-দৃষ্টিতে সুন্দর, কিন্তু বস্তুতঃ রাক্ষসীর রূপ। কণ্ঠস্বর ক্রমে নিম্ন করিয়া আনিলে প্রকাশ পাইত,অতি সুন্দর রূপ দর্শনে রূপের পূজা অন্তরে বিকাশ পাইয়াছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের রূপ পূজা করিবার অবস্থা নয়। এতদিন সে পূজা করিয়াছে এখন সে ঘৃণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি করিলে সে অবস্থা প্রকাশ পায়। কামশূন্য রূপ-পূজা সাধনার চরম—যে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিল্বমঙ্গল রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি দর্শনে "আহা!" বলিয়াছিলেন। কামভাব প্রকাশ হওয়াতে বিল্বমঙ্গল ছোট হয় না। কাম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ভাবের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব—মধুর ভাব লাভ হয়। বৃন্দাবনে গোপীদের এই ভাব লাভ হইয়াছিল। ভাগবতে আছে—"গোপ্যঃ কামাৎ"—গোপীরা কামের দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন—কামই শ্রীরাধার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের জনক। রায় মহাশয় বক্তৃতায় বিদ্যাপতি

হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়া কবির প্রশংসা করেন তাহার ভাব কামজনিত এই অষ্টসাত্বিক ভাবের অন্তর্গত। *

শুনিতে পাই বিল্বমঙ্গলের এই স্থল নিম্ন সুরে অভিনয় করাতে খুব করতালি পড়িয়াছিল। উচ্চ সুরে অভিনয় করিলে যদি করতালি না পড়ে আর নিম্ন সুরে ঘন করতালি পড়িতে থাকে, তবে প্রকৃত নটের তাহা উপেক্ষা করা উচিত। 'মেঘনাদ বধে'র অভিনয়ে যদি কেহ পরীক্ষা করেন তবে দেখিবেন যে মন্দোদরীর নিকট বিদায় লইবার সময়ে মেঘনাদ তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে খুব করতালি পড়িবে। কিন্তু এরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন প্রকৃত নটের ঘৃণার সহিত ত্যজ্য। তর্জ্জন গর্জ্জন বীররসব্যঞ্জক নহে—অভিনয়ে বীররসের অপর লক্ষণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বীরবাহু বধের পর আছে—

বাপের অবস্থা দেখি হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর॥
মেঘনাদ বলে পিতা ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নরবানরের রণে॥
লুকায়ে থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে॥

আবার কাশীদাসের মহাভারতে সুভদ্রাহরণ স্থলে যাদবগণকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া অর্জ্জুন সারথি দারুককে বলিলেন—

ফিরাও দারুক রথ—ডাক ক্ষত্রগণে।
না দিয়ে প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥

---

* এইস্থলে রায়মহাশয় ভ্রমক্রমে Burnsএর নাম না লইয়া Shelleyর কবিতার সহিত বিদ্যাপতির কবিতার তুলনা করিয়া বিদ্যাপতিকে উচ্চাসন দেন। কিন্তু Shelleyর কবিতা ও বিদ্যাপতির কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর—Shelley কঠোর, সমালোচক বলেন—; Shelleyর ভাব তারার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ; কিন্তু তারার শোভা যেমন অন্ধকারে, Shelleyর ভাবের দীপ্তিও তেমনি দুর্ভেদ্য তমোময় পটের উপরে।

যে দেশে রাধাকৃষ্ণ নাই সে দেশে বিদ্যাপতি হয় না। Burns বিদ্যাপতি নয়, তিনি বিদ্যাপতির অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর কবি। Burns গাহিয়াছে—

"Had we never loved so blindly
Had we never loved so blindly,
Never met—or never parted,
We had ne'er been broken—hearted."—

বৈষ্ণব-কবি-রচিত এই ভাবের গান বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভিখারীদিগকে গাহিতে শুনা যায়।

কিন্তু যে রথ হইতে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিবেন সে রথ কৃষ্ণভক্ত দারুক ফিরাইতে অসম্মত হইয়া যখন বলিল—

"গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত"—

তখন অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—

কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা ভীম যুধিষ্ঠির সমরে প্রবেশে॥

উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি অতি উচ্চ বীররসব্যঞ্জক। এ সকল স্থলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে রঙ্গালয় করতালি ধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই করতালি-প্রত্যাশী নট নটনামের যোগ্য থাকেন না।

বিল্বমঙ্গলের উক্ত অংশ অভিনয়ে হয়ত কথিত প্রকার উত্তরোত্তর নিম্নসুরে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয় কিন্তু তাহাতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না। নাটকেও পরে প্রকাশ আছে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াও কামের হাত এড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং স্থানীয় একটু মাধুর্য্যের অনুরোধে চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা নটের কর্ত্তব্য নহে। কবি বলেন—

"It is not an eye or a lip we beauty call,
But the joint result and the full force of all."—

অর্থাৎ কেবল সুন্দর চক্ষু বা সুন্দর ওষ্ঠ থাকিলে যে সুন্দর হয় তাহা নহে, সমস্ত অঙ্গের সুসম্মিলন দেখিয়াই আমরা সুন্দর বলি।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় বুঝিয়াছিলাম যে মৎকর্ত্তৃক অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসা কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন নিন্দা জ্ঞান করিয়াছেন।* তাঁহাদের ধারণা, আমি যেরূপ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় বর্ণন করিয়াছি তাহা প্রকৃত নয়। তাঁহাদের এরূপ ধারণা বোধ হয় আমার দোষেই হইয়া থাকিবে, বুঝিবা তাঁহাদের মস্তিষ্ক উপযোগী ব্যাখ্যা

---

* অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর তিন দিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধ পাঠ করি তাহাতে বলিয়াছিলাম—"অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই ;—অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন তিনি তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন.................দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা তাহা নয়.........অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে (সেইরূপ) আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকবর্ণিত চরিত্রের ঠিক উপলব্ধি হয়...............'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর' নামক পুস্তিকা ৭—১০ পৃষ্ঠা।

করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহারা বলিতে চান যে যখন অর্দ্ধেন্দু তাঁহার ভূমিকা লইয়া তন্ময় হইতেন, তখন তিনি আদৌ অর্দ্ধেন্দু থাকিতেন না; যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত যে ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। মদ খাইয়া মাতাল মাতলামোতে তন্ময় হয় কিন্তু সে মাতাল মাতালেরও অভিনয় করিতে পারে না—নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—একখণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপরখণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কিনা—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কিনা—প্রতিযোগী অভিনেতা (Co-actor) ঠিক চলিতেছে কিনা—যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কিনা—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা? এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিন্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশে অভিনয় চলে সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে কখন কখন সাক্ষী অংশ বেশী হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশী থাকিত। একটী প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেছি। অর্দ্ধেন্দুর পক্ষপাতী জনৈক অভিনেতার মুখে শুনিয়াছি—কোন এক ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু 'হরে চাকর'কে ডাকিলে জনৈক দর্শক উত্তর দিল—"আজ্ঞে যাই"; অর্দ্ধেন্দু তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"ও গুওটা তুমি ওখানে ব'সে আছ"—এ উত্তর অর্দ্ধেন্দুর মনের সাক্ষী অংশ দিয়াছিল—তন্ময় অংশ নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধেন্দুর প্রত্যেক অভিনয় হইতেই দেওয়া যায়। অন্য অভিনেতার পক্ষে এরূপ রহস্যকরণ দোষের হইত, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর এরূপ অসাধারণ অর্দ্ধেন্দুত্ব অনেক সময়েই দোষের না হইয়া গুণের হইত—কারণ অর্দ্ধেন্দুকে লোক অর্দ্ধেন্দু দেখিতে ভালবাসিত। অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি এখানে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা যদি আমার অপর পক্ষ না বুঝেন তবে তাঁহারা অভিনয় বিষয়ে কিছু পাঠ করিবেন—অন্ততঃ 'Recent Actors' নামক পুস্তকে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা প্রশংসা—প্রচ্ছন্ন নিন্দা নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

হিন্দুস্থান-পর্য্যটন।

রাজপুতানা।

আলোয়ার।

(শেষাংশ)

নিদ্রাভঙ্গের পরেই আমি ভ্রমণে বহির্গত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। পণ্ডিতজীর ইচ্ছা আমি অদ্য বিশ্রাম করি। কিন্তু আমার আগ্রহাতিশয্যে তিনি টম্‌টম্ আনাইয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্র অম্বনাথকে আমার সঙ্গে দিলেন। অপরাহ্নে সহর দেখিতে যাত্রা করিলাম। আমাদের টম্‌টম্ নগরদ্বার অতিক্রম করিয়া তরুশ্রেণীশোভিত রাজপথ দিয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তার অপর দিক হইতে আর একটি টম্‌টম্ বেগবান অশ্ব-সংযুক্ত হইয়া তীব্রবেগে চলিয়া গেল। আরোহীর বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর, পরিধানে সবুজ রঙের রেশমের চুড়ীদার পায়জামা ও চাপকান, মস্তকেও সুদৃশ্য রেশমের উষ্ণীষ, কণ্ঠে মুক্তার মালা। তিনি আমাদিগকে মস্তক নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া গেলেন। আমি অম্বনাথকে জিজ্ঞাসিলাম এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন—ইনি মহারাজার একজন 'মোসাহেব' মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। আমি বলিলাম 'বেশ—ভাল।'

ক্রমেই আমরা মতিডুংরি প্রাসাদের তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রহরী আমার অনাবৃত মস্তক দেখিয়া প্রথমে প্রাসাদ প্রবেশে আপত্তি করিল।

মতিডুংরি রাজপ্রাসাদ।

আমি বলিলাম যে, আমরা জাতীয় পরিচ্ছদের সহিত টুপী কিম্বা পাগড়ী ব্যবহার করি না। সঙ্গী আমাকে বুঝাইলেন যে উন্মুক্ত মস্তকে অর্থাৎ নগ্নশিরে প্রাসাদ প্রবেশের রীতি প্রচলিত নাই। ইহার ব্যতিক্রমে রাজসম্মানের লাঘব হয়। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার গোলাপী উত্তরীয়ে আমার পাগড়ী বাঁধিয়া দিলেন। প্রহরীও সসম্ভ্রমে দ্বার উন্মুক্ত করিল।

মহারাজ সময়ে সময়ে গ্রীষ্মকালে এই প্রাসাদ ভবনে আসিয়া বাস করেন। প্রাসাদ সম্মুখেই বিশাল চতুষ্কোণ সরোবর। পদ্মপত্রে পত্রে সমগ্র সরোব

সমাচ্ছন্ন। তাহাতে অসংখ্য কমলদল অর্দ্ধমুদিত অবস্থার রহিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণের জন্য সুন্দর পাদপথ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।১টি সুন্দর সেতু বিরচিত হইয়াছে। স্থানটি অতিশয় প্রীতিপ্রদ ও গ্রীষ্মাবাসের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

উপরিউক্ত প্রাসাদ দেখিয়া একটি শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত মহারাজের নবনির্ম্মিত প্রাসাদভবন দেখিলাম। ইহা আধুনিক প্রথায় নির্ম্মিত। দূর হইতে ইহার দৃশ্য অতীব মনোহারী।

এখান হইতে আমরা ষ্টেশনের নিকট গিয়া একটি সুন্দর বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট সমাধি-মন্দির দেখিলাম। ইং ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব ইহার কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীনত্বও আছে। প্রাচীনত্বের প্রতি আমার ভীষণ অনুরাগ। আমি একবার একটি প্রাচীন জীর্ণ দুর্গ দেখিবার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী, নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, ঝোড় ঝাড় প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অনাহারে সমস্ত দিন ছুটিয়াছিলাম। সে দুর্গের নাম তামোলগড়। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ প্রদেশের একটি দুর্গম পর্ব্বতোপরি অবস্থিত।

যে সমাধি মন্দিরের কথা এক্ষণে বলা যাইতেছে, তাহা ফতেজঙ্গের সমাধি। এই সমাধি মন্দিরের জন্য ফতেজঙ্গের নামটি মাত্র আছে। কিন্তু তিনি যে কে ও কোন্ কর্ম্মফলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে এই সমাধি হর্ম্ম্য বিরচিত তাহা এদেশে কেহই অবগত নহে। এমন স্মৃতিহীন কীর্ত্তিহীন মন্দির ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাওয়াই ভাল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। অদূরে তূর্য্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী প্রান্তরে দেখিলাম শত শত অশ্ব দলবদ্ধ হইয়া নগরাভিমুখে প্রত্যাগত হইতেছে। সঙ্গী কহিলেন, দেখুন কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! অশ্বপালক নাই—এই সকল অশ্ব সমস্ত দিন প্রান্তরে আপন মনে চরিতেছিল। দিবাবসান হইয়াছে; অশ্বপালক নগর হইতে তূর্য্যধ্বনি করিয়া রজনী যাপনের জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। সেই সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণ করিয়া অশ্বগণ কাতারে কাতারে চলিয়াছে। বহু অর্থব্যয় করিয়া মহারাজ এই সকল প্রাণী নানাদেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। ইহাদিগকে রীতিমত সামরিক প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। প্রতি বৎসর তিনি শতাধিক অশ্ব ক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহার অশ্বশালা রাজপুতানার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। ইংরাজ পরিব্রাজক মাত্রেই ইহা বিপুল পুলকে পরিদর্শন করিয়া যান। আজ এই পর্য্যন্ত দেখিয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বাণীবিলাস প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। পথপ্রদর্শক (Guide) অম্বনাথ সহগামী হইলেন। অদ্য বাসা হইতেই পাগড়ী বাঁধিয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং তোরণদ্বারে প্রবেশের সময় আর কোন ওজর আপত্তি হয় নাই। রাজপ্রাসাদ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। অতি সুন্দর কারুকার্য্য সমন্বিত শিল্পবহুল সৌধসৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার চক্ষু জুড়াইল। কক্ষ-আস্তরণের শিল্পসুষমা চিত্তহারী। বিবিধ বর্ণবৈচিত্রের উপর সুবর্ণের চিত্র সমাবেশে প্রাসাদ-কক্ষ অপূর্ব্ব শ্রী-সমন্বিত হইয়াছে। প্রাসাদ-প্রাঙ্গনের স্থানে স্থানে প্রস্তররচিত চাঁদনীযুক্ত মণ্ডপসমূহ প্রাসাদ সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে।

বাণীবিলাস প্রাসাদভবন।

বাণীবিলাস প্রাসাদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসমন্বিত দর্পণমণ্ডিত একটি গৃহে আলোয়ারের কারিগর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর দ্রব্য দেখিলাম। ইহা একটি রৌপ্যনির্ম্মিত টেবিল। টেবিলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কাচনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল রচিত হইয়াছে। ঠিক মধ্যস্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম পক্ষী-সমন্বিত একটি সুবর্ণ পিঞ্জর বসাইয়া দেওয়া হইল। নিম্নে টেবিলের একস্থানে চাবি ঘুরাইয়া দিলে উপরিউক্ত খালগুলিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙ্গিন মৎস্য ক্রীড়া করিতে লাগিল ও পিঞ্জরাবদ্ধ কৃত্রিম বিহঙ্গমকুল সমস্বরে গান করিতে লাগিল। আমি দেশীয় কারিগরের দ্বারা প্রস্তুত এই দ্রব্যটি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

শিশখানা।

মহারাজার পুস্তকাগার (Library) বিদ্বান পথিকগণের অবশ্য দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকালয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সুরক্ষিত হইয়াছে। অনেক প্রাচীন পুঁথি, ধর্ম্মগ্রন্থ, সাহিত্য, কাব্য, গীতিকবিতা, খণ্ডকাব্য, শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি বহুমুদ্রাব্যয়ে সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। একখানি চিত্র সম্বলিত পারস্য গ্রন্থ গুঁলেস্তার মূল্য ১৫০,০০০ টাকা শুনিলাম। আশ্চর্য্য বা বিচিত্র নহে। কুবের সদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী রাজপুত মহারাজগণের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।

পুস্তকাগার

এতদ্ভিন্ন প্রাসাদের অন্যান্য কক্ষ-সমূহের প্রাচীরের শিল্পসৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। প্রত্যেকটী বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। আমি সংক্ষেপে দু-একটী কক্ষের শিল্পমাধুর্য্য উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ভরতপুর ও দিগের (Deeg) রাজপ্রাসাদের সহিত আলোয়ার প্রাসাদের অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সৌধশিখরের আলিসার নিম্নে দুই স্তর

(Double) প্রস্তরাগ্র (Cornice) স্বর্ণকলস শোভিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ-অলিন্দ (Balcony) এই প্রাসাদে দৃষ্ট হয়। আরও কক্ষ-আস্তরণে (Ceiling) বিবিধ পৌরাণিক ঘটনাবলী লইয়া নয়নরঞ্জন চিত্রাবলী অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

বক্তিয়ার সিংহের ছৎরি (Cenotaph) বা স্মৃতিমঠ।

পাঠক পাঠিকা! জীবনে যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মানবশিল্পের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে চান, যদি তন্ময়চিত্তে ক্ষণকালের জন্যও সংসারের কঠোর যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে চান, যদি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বার্থের প্রলোভন ত্যাগ করেন, যদি নীরস কুটিল বিশ্বাসঘাতকার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিতে পারেন, যদি অর্থাভাবে আবুশৈল, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে অক্ষম হন, তাহা হইলে আগ্রা হইতে অল্পদূর আলোয়ারে আসিয়া এই রাজপুরী দর্শন করিয়া নয়ন, মন, জীবন সার্থক করুন। কবিবর স্বর্গীয় স্যর এডুইন আর্ণলড্ (Sir Edwin Arnold) ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। আর আমিও তাঁহা অপেক্ষা অল্প বিমোহিত হই নাই।

কি মধুর মনোমদ সৌন্দর্য্য! কি মনোমোহন প্রাকৃতিক শোভা! মাধুর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের কি জীবন্ত সম্মিলন! সাগর-হ্রদ উপকূলে বিশাল শিল্পসৌন্দর্য্য শোভিত রাজপ্রাসাদ। তৎপশ্চাতে উত্তুঙ্গ শৈলপ্রাচীর। হ্রদের এ উপকূলে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসমন্বিত পরলোকগত মহারাজ বক্তিয়ার সিংহের স্মৃতিমঠ—অপর কূলে শ্রেণীবদ্ধ সুদৃশ্য মন্দিরমালা—অন্য তীরে প্রমোদ ভবন! এই ত্রিদিবলাঞ্ছিত হর্ম্ম্যাবলীর প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া নলিনীদলবহুল হরিত হ্রদজল স্নিগ্ধ সমীরহিল্লোলে ঢল ঢল করিতেছে! ধূসর শৈলশিখর দীপ্তোজ্জ্বল হৈমরশ্মিতে কনক মণ্ডিত করিয়া নবোদিত প্রভাতসূর্য্য চক্ররথে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিতেছেন! তালকদলীকুঞ্জের হরিত পত্রপুট ভেদ করিয়া ধীর সমীর মৃদুশ্বাসে ক্রীড়া করিতেছে। অযুত বিহঙ্গমকুল প্রফুল্লচিত্তে কলকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিতেছে; এ সৌন্দর্য্য তুলিকার!—লিখিবার নহে! এ সৌন্দর্য্য দেখিবার—বুঝাইবার নহে!

মহারাজ বক্তিয়ার সিংহের স্মৃতিমঠের শিল্প সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এই দ্বিতল চাঁদনী সংযুক্ত রাজসমাধি ভারতবর্ষের একটী শিল্পরত্ন। আমি এই হৃদয়-হারী শিল্পমণ্ডপে বসিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিশ্রাম ভোগ করিয়াছিলাম। অসীম ভ্রমণ-পুলকে হৃদয় জুড়াইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কেকারব করিতে

করিতে দুইটী ময়ুর কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া সমাধি শিখরে বসিল ! বসিয়াই অনিন্দ্যসুন্দর ইন্দ্রধনুবিনিন্দিত পেখমের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ! আমি আত্মহারা হইয়া দেখিতে লাগিলাম। আমাকে তন্ময়চিত্ত দেখিয়া সঙ্গী বলিলেন—বেলা হইতেছে গৃহে চলুন, আবার আহারান্তে বাহির হইতে হইবে।

বেলা প্রায় একটার সময় রাজোদ্যান দেখিতে গেলাম। লাহোরের শালিমার উদ্যানের অনুকরণে এই উদ্যান রচিত। যেন একটী জলশূন্য বিশাল সরোবরের মধ্যে ধরণীগর্ভে এই একতল উদ্যান অতুল পারিপাট্যে সন্নিবেশিত। ইংরাজী hot houseএর ন্যায় উদ্যানের উপরিভাগ তারের জালীদ্বারা আবৃত। তদুপরে লতিকাজাল সমাচ্ছন্ন। তার নির্ম্মিত জালীর তলে তলে ছিদ্রযুক্ত অসংখ্য জলের পাইপ গিয়াছে। পম্প (Pump)এর দ্বারা পাইপগুলির মধ্যে সলিল সঞ্চারিত হইতে লাগিল। অমনি শ্রাবণের বৃষ্টি ধারার ন্যায় বারিবর্ষণ !—কি অপূর্ব্ব রিম্ ঝিম্ রবে ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আমি ভিজিয়া যাইবার ভয়ে ছাতা খুলিলাম ; অধ্যক্ষ সাহেব একটু হাসিয়া Pump বন্ধ করিলে বৃষ্টিধারা স্থগিত হইল। সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্যানস্থিত নানাজাতীয় দুর্লভ বৃক্ষ লতা পুষ্প প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ও ধন্যবাদ দিয়া উদ্যান ত্যাগ করিলাম।

আলোয়ার দুর্গ—শৈলচূড়ে আলোয়ার দুর্গ অবস্থিত ! পর্ব্বতের গায়ে গায়ে দুর্গপ্রাকার চলিয়া গিয়াছে। দুর্গ দৃশ্য অতীব মনোহারী। দুর্গচূড় হইতে উপত্যকা, অধিত্যকা, বনরাজী দেখিলে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়।

আলোয়ার বাজার

রাজপথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ পণ্যবীথিকা চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এখানে ইস্পাতের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য হইয়া থাকে ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রও প্রস্তুত হয়।

রাজরথ—এই রাজরথ দ্বিতল। চারিটী হস্তীদ্বারা চালিত হয়। সময়ে সময়ে দশহরা পর্ব্ব উপলক্ষে মহারাজ তাঁহার পঞ্চাশটি অমাত্যসহ আরোহণ করিয়া থাকেন।

জয়পুরের ন্যায় এখানেও দেবমন্দির আছে, দেবতার নামটী ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পূজারী। দেব দর্শন করিয়া আমি চৌকের

কৃষ্ণ মন্দির

ত্রিপোলিয়ার ছাদে উঠিয়া নগরীর শোভা অবলোকন করিলাম। চতুষ্কোণ সৌধাবলী একখানি সুদৃশ্য ছকের ন্যায় দেখাইতেছে। সৌধচূড় হইতে অবতরণ করিয়া নগরী প্রদক্ষিণ করিলাম।

নগরী প্রাচীর ও পরিখা পরিবেষ্টিত। পাঁচটী প্রবেশ দ্বার! লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল, বিদ্যালয়, গির্জ্জা, নূতন প্রণালীতে নির্ম্মিত ও দেখিতে সুন্দর। সহরের চতুর্দ্দিকে ফলফুল পরিপূরিত উদ্যানরাজী শ্যামল শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

নগর হইতে ১০ মাইল দূরে হরিত পার্ব্বত্য উপত্যকা। বক্ষে শিলসর হ্রদ খনিত হইয়াছে। তথা হইতে জলপ্রণালী দ্বারা সহরে উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে। তথায় একটী সুন্দর প্রাসাদ রচিত হইয়াছে। হ্রদবক্ষে ক্ষুদ্র বাষ্পীয়পোত (Steam-launch) ভাসমান। এই হ্রদবক্ষে নৌকাবিহার গ্রীষ্মকালে স্বর্গসুখ প্রদান করে।

বাসায় প্রত্যাগত হইয়া আহারান্তে গৃহস্বামীর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় নিবিড় নৈশান্ধকারে আলোয়ার পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

রিপুওয়ালা

পল্লীগ্রাম হইতে কেহ সহরে আসিলে এক প্রকার নূতন জীবের আবিষ্কার করেন, ইহার নাম রিপুওয়ালা। মার্ত্তণ্ড রৌদ্রের তাপে যখন কেহ সাহস করিয়া বাহিরে যাইতে চাহে না, তখন ঐ নিরীহ জীব তারস্বরে "রিপুকর্ম্ম, রিপুকর্ম্ম" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে একমনা হইয়া কাহারো পানে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সহরের রাস্তায় পরিভ্রমণ করে। যাঁহারা উহাদের ঐ মন্ত্রটী শুনিতে অনভ্যস্ত তাঁহারা অনেকেই ঐ মন্ত্রটীকে "কি কুকর্ম্ম" বলিয়া শুনিয়া থাকেন। যাহার সাহায্যে পুরাতন বস্ত্র নূতনবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে রিপুওয়ালা বলে।

রিপুওয়ালা মানব সমাজের একটী বিশেষ উপকারী জীব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্ত্র তালি সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা দেখিয়া মন সহজেই মানবের অপরাপর ব্যবহারীয় দ্রব্য সম্বন্ধে রিপুওয়ালার অনুসন্ধান করে। একটু দেখিলেই অনুভব

করা যায় যে শুধু সহরের লোক কেন, সমগ্র মানব সমাজ রিপুওয়ালা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। তোমার শরীর মন্দ বোধ হইতেছে, তুমি শরীরের রিপুওয়ালার সাহায্য লইলে। তিনি কে? ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি। রিপুওয়ালার মতন নূতন গঠন বা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। পুরাতনের জীর্ণ সংস্কার করা তাঁহার পেশা। সেই জীর্ণ সংস্কার কেহ ভাল করিয়া করিতে পারেন অর্থাৎ চেহারা রিপু করিয়া প্রাচীন স্বাস্থ্যের অবস্থায় সেইটাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, কেহ বা সেই কার্য্যে অপটুতা বশতঃ যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থায় দেহটাকে আনিয়া দেন, কিন্তু উভয়েই নিজেদের পারিশ্রমিক বিষয়ে দৃঢ়জ্ঞানসম্পন্ন, সেটা ইহারা ভুলেন না। তোমার দেহটা রিপু করিতে দিয়াছ সেটা তখন তোমার নহে, আমি রিপুওয়ালা সেটা তখন আমার। আমি নানা প্রকার উল্টা ব্যবস্থাদি করিয়া দেহের ভিতর তাল-খিচুড়ি পাকাইয়া দিই কিন্তু তুমি দেহী তোমার বলিবার যোটী নাই। এই শ্রেণীর রিপুওয়ালার সূচচালনার পারিপাট্য অদ্ভুত। কোন কোন সময়ে সূচ বা অস্ত্র চালনার দ্বারা ইহাঁরা ভেল্কী দেখাইয়া থাকেন বটে কিন্তু অনেক সময়ে তাহা ভেল্কী মাত্র। এই শরীরের রিপুওয়ালা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ বা আমাদের পরিচিত রিপুওয়ালার ন্যায় তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে রাস্তায় রাস্তায় ফিরে। সহরের অধিবাসীদিগকে "ব্যথা ভাল করি, দাঁতের পোকা বাহির করি" চীৎকারকারী রিপুওয়ালার কথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কর্ণকুহরে পটহবৎ এই শ্রেণীর রিপুওয়ালারা অনবরত শব্দ করিতেছে আবার অপর শ্রেণী চক্ষুরিন্দ্রিয় সাহায্যে আমাদের হৃদয়-কুহরে ঢক্কা বাজাইতে থাকেন। ইহাঁরা খ্যাতনামা বিলাত প্রত্যাগত বা গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ ডাক্তার ধাত্রী প্রভৃতি। সংবাদপত্রের স্তম্ভ খোল ইহাদের বিজয় ঘোষণা চারিদিকে দেখিতে পাইবে, পথ দিয়া চলিয়া যাও চারিদিকে সাইনবোর্ড ইহাদের কীর্ত্তিকলাপ বিস্তৃত দেখিবে। এই শ্রেণীর রিপুওয়ালার এত বাড়াবাড়ি দেখিয়া বোধ হয় ব্যবসার ভিতর বেশ রস আছে। ফল সবুরে মেওয়া ফলিবে, এই প্ররোচনায় রোগী ভুলে ইহাদেরও বেশ দু পয়সা দান করে। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা যথা জ্ঞান যথা শাস্ত্র ব্যবসা করেন তাঁহাদের কথা বলিতেছি না, অনেকের দ্বারাই জীর্ণ দেহ খানি জীর্ণতররূপে পরিণত হয়। অনেকে আবার তাহার উপর আত্মাভিমানে মত্ত—"হাঁ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাওয়ালা, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সপুচ্ছীকৃত, আমার ঔষধ প্রয়োগে ভুল, এ কথাই নয়।" রোগীর শরীরের

দোষে ব্যাধির বিপরিণাম প্রভৃতি মত ইহাঁদেরও ওষ্ঠাগ্রে। আমি বলি যে জিনিষটা রিপু করিতে বলা হইয়াছে সেটা আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া কাজে হাত দিলে অনেকটা গোল মিটিয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনটা সহজসাধ্য নহে বলিয়া সে পথে অনেকে অগ্রসর হইতে চাহে না। "হাথুড়ি" হস্তে লইয়াই চিকিৎসা করিতে বসেন।

আর এক শ্রেণীর রিপুওয়ালা হাকিম, ব্যবহারজীবি প্রভৃতি; ইহাদের ভিতর চীৎকারকারীর দল নাই বটে কিন্তু যথা স্থানে অনেক সময়ে ইহাঁরা যেরূপ চীৎকার করেন তাহাতে রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করিয়া বেড়াইবার আবশ্যকই হয় না। সমাজ অঙ্গের ক্ষত মেরামত করা বিচারক রিপুওয়ালার কার্য্য ও তাঁহাকে সেই কার্য্যে সহায়তা করা অন্যান্য ব্যবহারজীবের কর্ম্ম। কর্ম্মটা শক্ত বলিয়াই বোধ হয়, তা না হইলে আবার সহকারীর প্রয়োজন কেন? যাহা হউক, এই রিপুকার্য্য বিষয়ে কিছু প্রণিধান করা যাউক। এই শ্রেণীর রিপুকার্য্য মোটামুটী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম সমাজের অঙ্গ ক্ষত সম্বন্ধে রিপু, দ্বিতীয় সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের অঙ্গে ক্ষতের রিপু। সমাজ একটা প্রকাণ্ড সজীব পদার্থ। ইহা চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাওয়া না যাইলেও "অপানিপাদো জবনো গৃহীতা" প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। অতএব এহেন জীবের অঙ্গে ক্ষত বড় সাধারণ রোগ নহে। তাহার উপর দেশের রাজা সমাজের নায়ক সুতরাং সমাজ অঙ্গের ক্ষত রাজার অঙ্গের পীড়া বলিয়া বিবেচিত হয়, সকল ফৌজদারিতে রাজা স্বয়ং ফরিয়াদি হয়েন। তাঁহার দেহের আঁচড়টা সমাজ দেহের বিষম ক্ষতের সমতুল্য। অতএব এই দুই শ্রেণীর ক্ষত রিপু করার জন্য কত কত বিচারক রিপুওয়ালা রহিয়াছেন। তুমি আমাকে চড়টা মারিলে রামা বলিলেন এত আমাকে চড় মারা নহে ইহা সমাজের অঙ্গে আঘাত করার নামান্তর মাত্র। তোমাকে সমাজ ক্ষত রিপুওয়ালা বিচারকের কাছে যাইতে হইবে তিনি তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন তাহার ফলে তোমার অথবা সমাজ দেহের ক্ষতের উপকার সাধিত হইবে। তুমি ইচ্ছা করিলে অন্য শ্রেণীর রিপুওয়ালা দেওয়ানী বিচারকের কাছেও যাইতে পার। ইহারা ব্যক্তিগত চিকিৎসা দ্বারা ক্ষতের অপনোদনে ব্যস্ত। ইহাঁরা তোমার ক্ষতের জন্য অপর পক্ষকে দায়িক করিয়া দিবেন। তোমার ক্ষত ভাল হউক বা নাই হউক তাহা তাঁহাদের দেখিবার অবকাশ নাই, লোক দেখাইয়া দিয়াই ঠাণ্ডা। এই জাতীয় রিপুকার্য্য মধ্যে আর এক ধাক্কা আছে রাজা বলেন,

তোমরা মস্ত ক্ষতি করিয়াছ আমি রিপুওয়ালা রাখিয়াছি আমার দাম দাও মামলা রুজুর সময় কোর্ট ফি দিলে তবে রুজু হইবে। তুমি হয়ত বলিবে আগে আমার ক্ষত সারে কি না সারে দেখি তারপর না হয় দাম লইবেন। রাজা বলিলেন—তা হইবে না, আগে আমার দাও পরে ক্ষতের উপকার হউক বা না হউক সে আমার দেখিবার আবশ্যক নাই। "মহাজনো যেন গতঃ সপন্থা" সুতরাং ক্ষুদ্র সহকারী ব্যবহারজীব রিপুওয়ালা বলিলেন, "ঠিক কথা রাজা যা বলেন তাতে আর ভুল নাই। এক্ষণে আমাদেরও মজুরি তুমি অগ্রে দিয়া যাও পরে তোমার ক্ষত ভাল হ'বার হয় হইবে না হয় আপীলে দেখিয়া লওয়া যাইবে।" এই শ্রেণীর রিপুওয়ালার মান বা তন্ত বড় বিস্তৃত। ইহাদের সেলাইয়ে সূচী স্বয়ং রাজা বানাইয়া দিয়া থাকেন। তবে কাঠামি এমনি ভাবে নির্ম্মিত যে, যখন তুমি দেখিতেছ যে সোজা দিকে সেলাই হইতেছে তখন বাস্তবিকই অনেক সময়ে উল্টা দিকে সেলাই চলিতেছে। তুমি হাঁ হাঁ করিয়া হাত চাপিয়া ধরিতে যাও রিপুওয়ালা বলিবেন—কি তাত নয় তোমারই চক্ষের ভুল, সেলাই সোজা দিকেই হইতেছে, তুমিও বুঝিলে তাই কিন্তু কি ফল হইল—যে উল্টা সেই উল্টা। এই রাজা ঘটিত রিপুওয়ালা সম্বন্ধে বেশী বলা কিছু নয়, কি জানি যদি হিতে বিপরীত ঘটে।

আর এক শ্রেণীর রিপুওয়ালার জালায় আমাদের স্কুল কলেজের ছোক্‌রারা ব্যতিব্যস্ত। তোমার কাপড় ছেঁড়ে নাই তুমি তাহাদিগকে ডাকিতেছ না কিন্তু ইঁহারা তোমার গায়ে পড়িয়া উপকার করিবেই করিবে। হয়ত উপকার করিবার প্রয়াসে যেখানে ছেঁড়া নাই সেখানে ছিঁড়িয়া দিবে। তোমাদের লেখাপড়া হইতেছে না ভাল লেখাপড়া অন্য উপায়ে হইবে। আইস পথ দেখাই বলিয়া ইহারা যে পথে লইয়া যায় সে পথে অন্ধকার, যাহা একটু পুর্ব্বকার আলোক ছিল তাহাও লুপ্তপ্রায় হইবার যোগাড়। সহরের রাস্তার এক প্রকারের চক্ষু চিকিৎসক বা রিপুওয়ালা আছে তাহারা তোমার খুব ভাল চোখটী দেখিয়াও বলিবে বাবু আপনার চোখে বড় দোষ হইয়াছে আমার সঙ্গে আসুন ভাল ঔষধ দিয়া চক্ষু জ্যোতিষ্মান করিয়া দিব, বলিয়া তোমাকে অন্ধকার গলির ভিতর লইয়া যাইয়া হয়তঃ যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে। শিক্ষিত রিপুওয়ালারা ইহাদের কিছু কম যান বটে কিন্তু আখেরে যে ইহাদের সমকক্ষতা লাভ না করিতে পারিবেন কে বলিতে পারে?

আর এক শ্রেণীর রিপুওয়ালা সমাজ সংস্কারক। হিন্দু সমাজের প্রাচীন

দেহটীতে ইহাঁদিগের চক্ষে নানা ব্যাধির সঞ্চার পরিদৃশ্যমান। কেহ বলিতেছেন যে সমাজ দেহের Heart বা হৃদয় যন্ত্র খারাপ হইয়াছে ইহা না সারাইলে ক্রমে Dropsy বা উদরী হইয়া দেহটী একেবারে যাইবে, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার আর কিছু থাকিবে না। ইহাঁরা বলেন আদৌ বৈদেশিক ভাব পোষণ করিতে দেওয়া হইবে না। লেখাপড়া কার্য্যকলাপ সব প্রাচীন মতে করিতে হইবে তাহা না হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব ঘুচিয়া যাইবে। আর এক শ্রেণী বলেন, যে হাঁ হিন্দুসমাজ দেহের হৃদয় যন্ত্র খারাপ হইয়াছে বটে কিন্তু চিকিৎসা অন্যরূপ এই দুর্ব্বল হৃদয় যন্ত্রে ইউরোপীয় সতেজ রক্তের সঞ্চার করিয়া দাও সমাজ দেহ সবল হইবে। বিলাতী ভাব আনয়ন পোষণ ও সংবর্দ্ধন ব্যতিরেকে আমাদের আর নিস্তার নাই। এই দুই শ্রেণীর রিপুওয়ালারা নিজের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত কিন্তু সমাজ দেহ সাড়াটীও করে না শব্দটীও করে না। উভয় শ্রেণীর কাহারও দোষ নাই সকলেই স্ব স্ব মতে স্থির বিশ্বাসে কার্য্য করিতেছেন কিন্তু কথাটা এই যে সমাজ দেহটা একেবারে নির্জীব পদার্থ নহে। দেশ কাল পাত্র ভেদে ও স্বাভাবিক পরিণামের হিসাব রাখিয়া রিপু কর ফল ফলিবে; আর তাহা না করিলে রিপু টিকিবে না। যাহা সারিতে যাইতেছ তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষত দেখা দিবে তখন তোমার বল বুদ্ধি ভরসা সব লোপ পাইবে। রিপুতে তখন আর সানিবে না আমুল সংস্কার আবশ্যক হইবে যথা যুগধর্ম্মে ধর্ম্মপ্লাবন প্রভৃতি। অন্যান্য দিকে দেখিলেও রিপুওয়ালার অভাব নাই তবে এতক্ষণ ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রটি আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে এবং মনে হইতেছে যে ইহাদের আলোচনা করিয়া "কি কুকর্ম্মই" করিলাম। অতএব এই খানেই ইতি করা যাউক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্, এ।

সমাজ সংস্কার

ভারতবর্ষীয় হিন্দু আর্য্যদিগের সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে কোন লেখকই লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন তিনিই বলিয়াছেন, হিন্দু সমাজ বড়ই স্থিতিশীল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বড়ই পশ্চাদ্‌পদ। তাঁহারা বলেন যদি আবহমানকাল প্রচলিত

রীতি নীতি আচার ব্যবহার দেখিতে চাও, হিন্দুসমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর দেখিবে সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন চালচলন ভাব ধারণা ও সামাজিক বিধান দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বেদগাথামুখরিত প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য্য কৃষক পঞ্চনদধৌত ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে হল চালাইত, আজিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্লীহা যকৃতস্ফীতোদর চিরবুভুক্ষু হিন্দু কৃষকের ভূমিকর্ষণ প্রণালীও ঠিক সেইরূপ। কুম্ভকারের চক্র এই দীর্ঘকালে অতি অল্পই উন্নতি করিয়াছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক তন্তুবায়ের বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি অভিন্ন। এত রাজনৈতিক কুজ্ঝটিকার মধ্যে এত রাষ্ট্রবিপ্লব সমরের অস্ত্রের ঝনঝনা, কাতরের আর্ত্তনাদ, আহতের করুণ ক্রন্দনেও হিন্দুসমাজ প্রাচীন পথ বিচ্যুত হইয়া চক্ষু মেলিয়া আশে পাশে চাহে নাই, জগতের পরিবর্ত্তনের সহিত আপনার অবস্থার সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার প্রয়াস করে নাই, অবস্থাভেদে ভিন্ন ব্যবস্থার বিধান করে নাই, প্রায় সহস্র বৎসরকাল বিদেশীর সংস্পর্শে আসিয়া বড় একটা বিদেশীর ভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করে নাই। হিন্দুসমাজ মোটের উপর পূর্ব্বেও যে পন্থায় চলিতেছিল আজিও সেই পন্থায় চলিতেছে।

আমরা যখন উপরোক্ত উক্তিগুলিকে সংক্ষেপে অধীর ভাবে বিচার করি, তখন সেগুলিকে সত্য বলিয়াই আমাদের ধারণা হয়। কিন্তু একটু স্থির ভাবে এই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুসমাজ ঠিক একই ভাবে রহিয়াছে, এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে আর্য্যসমাজ প্রাচীন উচ্চ আদর্শ ছাড়িয়া বহুদূরে অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে, কেবল বাহিরে একটা স্থিতিশীলতার যবনিকা ফেলিয়া তাহার পশ্চাতে বেশ ধীরে ধীরে মন্দের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। হিন্দুসমাজ প্রাচীন পথ বিচ্যুত হইয়া আপনার অন্তঃসার হারাইয়াছে। যিনিই আধুনিক হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাকেই বলিতে হইবে যে, এই হিন্দুসমাজ প্রাচীন হিন্দুসমাজের বাহ্যিক পরিচ্ছদটা নিজ অঙ্গে রাখিতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজের যে সারাংশ তাহা বহুদিন আদর্শ বিচ্যুত হইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুসমাজ মরিয়াছে বহুপূর্ব্বে—যে সামাজিক অঙ্গটা পড়িয়া আছে, যাহাকে দেখিয়া সেই গৌরবমণ্ডিত উচ্চনীতি অনুসারে গঠিত আদিম হিন্দুসমাজ বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা হিন্দুসমাজের বেশ পরিহিত শব মাত্র। শবদেহের সহিত জীবিত দেহের বাহ্যিক আকারের সাদৃশ্য থাকে বটে, কিন্তু নিকটে গিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সেটাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে পূতিগন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত

হয়,তখন বুঝিতে পারা যায় জীবনে ও মরণে কত প্রভেদ ; আসলে ও ছায়ায় কি পার্থক্য। সিন্ধু-ভাগীরথী-তীরবাসী সরল ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির সহিত তাহাদিগের আধুনিক অকৃতী বংশধরদিগের পার্থক্যের মাত্রা হৃদয়ঙ্গম করিলে আত্মগ্লানিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু আমরা অধঃপতিত হইলেও এত গর্ব্বিত যে, এই প্রভেদের মাত্রাটা মাপিয়া আমাদের অধঃপতনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে এমন লোকও আমাদিগের মধ্যে বিরল। যখন আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা আমাদের পবিত্রসত্ব পূর্ব্বপুরুষদিগের সমকক্ষ বলিয়া জগত সমক্ষে জাহির করি, এবং আপনাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে গলাবাজী করিয়া গগন বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করি, তখন একবার আপনাদের প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করি না, এ বড় ক্ষোভের বিষয়। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রাণটা চলিয়া গিয়া কেবল দেহটা পড়িয়া আছে, ইহা ভাবিয়া আমরা তো একবার আমাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করি না। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাহি, আমরা সভা করিয়া আপনাপন শ্রেণীকে অপর হিন্দু শ্রেণী অপেক্ষা বড় বলিয়া নির্দ্ধারণ করি, নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজের শাখা সমাজ ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির দোষ পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে হেয় করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু যখন প্রত্যেকের জাতিধর্ম্ম পালন করিবার সময় আসে, তখন বলি ব্রাহ্মণকে কেবল বেদ বেদান্ত পাঠ করিতে হইবে, ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে, সদা সত্য কথা কহিতে হইবে, এসবগুলা কুসংস্কার। কিন্তু ব্রাহ্মণের মত জীবনযাপন না করিলেও কেহ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রশ্ন করিতে পারিবে না। ঐরূপ আদর্শে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতেন বলিয়াই যে ব্রাহ্মণ সম্মানিত হইতেন আমরা তাহা বিস্মৃত হই। কেবল ব্রাহ্মণ বংশজাত প্রত্যেক জীবকেই সম্মান করিতে হইবে, আধুনিক সমাজের এই নিয়ম। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ পশুবৎ ব্যবহার করিতে করিতে রাজপথে পড়িয়া থাকিলে যদি দৈবাৎ কোন কৃতবিদ্য সচ্চরিত্র জিতেন্দ্রিয় শূদ্রের পদ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমরা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠি!

আমাদের সমাজ সংস্কার বিষয়ে একটা মহা দুর্ব্বলতা আছে। প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝিতে পারেন যে, আমাদের সামাজিক জীবনটা অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের অনুরাগ অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দু ধর্ম্মটাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে সামাজিক জীবনটাকে আধুনিক জগতের সহিত কতকটা মিলাইয়া লইয়া চলিতে হইবে, ধর্ম্মের সার লইয়া জাতিটাকে

উদ্দীপিত করিতে হইবে, কেবল বাহ্যিক আবরণটা ধর্ম্ম নয় এ জ্ঞানটুকু দেশ মধ্যে রাষ্ট্র করিতে হইবে। কিন্তু এ সকল কথার যাথার্থ্য পদে পদে অনুভব করিলেও যিনি কাগজে কলমে সেগুলাকে প্রকাশিত করিবার সৎ সাহস দেখান, আমরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হই! এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে বলিয়া লেখক বা বক্তার পামরত্ব প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হই। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত বাল্যের পুতুল খেলা ভুলিয়া গিয়া বাস্তব জগতের খেলায় যোগদান করে। আমরা কিন্তু পুতুল খেলাতেই মাতিয়া থাকি, চক্ষু মেলিয়া একবার দেখি না যে, বাহিরের দর্শক আমাদিগকে কিরূপ হেয় জ্ঞান করিতেছে। শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠে সত্য। এখনও দুর্ভিক্ষপীড়িত বঙ্গে ঘরে ঘরে আমোদ হয়। কিন্তু আমোদটা কিসের? আনন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য হইবে সেই আমোদে, না উপহার আদান প্রদান হইবে, পূজার ছুটীতে কেল্‌নারের অন্ন ক্রয় করিয়া খাইতে খাইতে দেশ-ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, সেই সুখ চিন্তায়? বাহিরের লোক বলিতে পারে বাঙ্গালী হিন্দু বড় ধর্ম্মপ্রাণ, পূজার সময় আনন্দে নাচিয়া উঠে, কিন্তু সে আনন্দটা ধর্ম্মজনিত কি তমোজনিত তাহাতো আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু বুঝিতে পারিলেও পূজার সময় পূজা করিয়া জাতীয় উৎসবটার প্রাণ সঞ্চার করিবার চেষ্টা করি কি?

আমরা জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে বলি না, অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন রীতিনীতি আচার ব্যবহারগুলিকে পশু শক্তি দ্বারা বিনষ্ট করিতে বলি না। আমরা বলি, যেগুলি বাস্তবিক প্রাচীন রীতি সেই গুলিকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা কর। যে রীতির যাহা মূল উদ্দেশ্য আধুনিক পরিবর্ত্তিত জগতের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া সেই উদ্দেশ্য লইয়া যেখানে নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার আবশ্যক তাহা কর। যদি শাস্ত্রে থাকে সমুদ্র-যাত্রা করিতে নাই তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ কি অভিপ্রায়ে তখনকার সমাজে এ নিয়মটী বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এখন যদি সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে বা এরূপ বুঝিতে পারি সমুদ্র-যাত্রা করিয়া দেশে ফিরিয়া যুবকগণ মাতৃভূমির অধিক ইষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে সমুদ্র-যাত্রাটাকে উপকারী পরিবর্ত্তন বলিব না কেন? সে কালের ছাত্র জীবনের ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্যটার সার লইয়া কি এখনকার ছাত্রের শিক্ষা দিতে পারি না? ব্রহ্মচারিগণ শিক্ষকের জন্য ভিক্ষা করিত। এখন অবস্থাভেদে সেটা ছাড়িয়া দিয়া অপরাপর বিধিগুলি লইলে কি পুরাতন ব্রহ্মচর্য্য বিধি পুনর্জ্জীবিত হইতে

পারে না? আমাদের কিন্তু সে সার সংগ্রহের মেধা নাই। আমরা ছায়ার উপাসক, প্রকৃত পদার্থকে গ্রহণ করিতে চাহি না। যেগুলিকে আমরা প্রকৃত আর্য্য বিধান বলিয়া মানিয়া লই, সেগুলি অনেক সময় প্রকৃত অনুষ্ঠান নহে। সুতরাং সেগুলিকে সমাজ হইতে বিদায় দিলে কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে না। কানন হইতে শুষ্ক নীরস কাষ্ঠ গুলা ফেলিয়া দিলে কাননের উন্নতি করা হয়, পুরাতন প্রাণহীন কাষ্ঠ কতকটা স্থল অধিকার করিয়া থাকে মাত্র।

যদি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় যে ঠিক যে সকল অনুষ্ঠানগুলি শাস্ত্রসম্মত ও আদিম, সেগুলিকে সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া বক্রী আগাছা গুলির মূলে কুঠারাঘাত করিব, তাহা হইলে যে সকল বিধান অহিতকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেই গুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, বাস্তবিক আধুনিক সমাজের সেই সকল বিধি শাস্ত্রসম্মত কি না। যাহা সত্য, যাহা হিতকর, তাহার উপাসনা করা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু কেবল বহু দিন একটা ভ্রান্ত বিধি চলিয়া আসিতেছে বলিয়া সেটার পূজা করা সমাজের পক্ষে বড়ই অহিতকর। রাজনৈতিক আন্দোলন কর আর শিল্প বিজ্ঞানের যতই উন্নতির বাসনা কর, সমাজ মধ্যে ধর্ম্মরস সিঞ্চিত না হইলে, সমাজ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং যদি প্রকৃত পক্ষে হিন্দু জাতির উন্নতি করিতে চাহ, তাহা হইলে একটা যত্নীকৃত উদ্যমে সমাজের ভ্রান্ত অর্থহীন বিধান গুলিকে বিসর্জ্জন কর, দেখিবে জাতীয় উন্নতিকল্পে যে সকল উদ্যম করিতেছ, সেগুলি কত শীঘ্র ফলবতী হইবে।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি তখন গড়ে ফিরিবার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিলাম। যতক্ষণ ভূতনাথকে দেখা গেল, ততক্ষণ সোজা গড়ের পথে চলিলাম, তাহার পরই মাঠে নামিয়া পড়িলাম। এই লোক কে, কাহার নিকট এই বালক যায়, তাহা না দেখিয়া আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইব না। এরূপ সুবিধা পাইয়াও তাহাকে

যদি ধরিতে না পারি, তবে সে দোষ আমার—অপরের নহে। আর এমন অবস্থায়ও যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে গোবিন্দরাম শুনিয়া কি বলিবেন ?

আমি সেই নির্জ্জন প্রান্তর-পথে চলিলাম, চলিতে ভারি কষ্ট হইতে লাগিল, পথ অত্যন্ত বন্ধুর, পথের প্রস্তরখণ্ড কঙ্করে, স্থানে স্থানে নাতিগভীর গহ্বরে আমার পদস্খলন হইতে লাগিল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ—কেহ কোথায় নাই। এমন কি একটা পাখীও দেখিতে পাইলাম না—পরক্ষণে মনে হইতে লাগিল, যেন এই বিশ্বপৃথিবীমধ্যে আমি একামাত্র।

প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া আমি যেখানে সেই বালককে দেখিয়াছিলাম, সেই-স্থানে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

আমি তখন চারিদিক্ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, অদূরে একটা ক্ষুদ্র পথ দেখিলাম, এই পথের দুইদিকেই পাথর, ক্রমে পথ আরও নীচু হইয়া খাদের মত হইয়া গিয়াছে। সহসা আমার মুখ হইতে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বাহির হইবার মত হইতেছিল, আমি কষ্টে তাহা সংবরণ করিলাম; আমার সম্মুখে মানুষের পদচিহ্ন। চিহ্নগুলি বড়—অবশ্যই সে বালকের নহে।

এই নির্জ্জন ভয়াবহ নির্জ্জন স্থানে লোক আছে, নিশ্চয়ই কোন লোক এখানে আসিয়াছে, নতুবা মানুষের পায়ের দাগ এখানে থাকিবে কিরূপে ? আমার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল, আমি এক প্রকার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া হাতে পিস্তল লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া একটা গহ্বর দেখিতে পাইলাম, গহ্বরের সম্মুখে একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড, সেই পাথরের একপার্শ্ব দিয়া একটা খুব সঙ্কীর্ণ পথ আছে, তাহার ভিতর দিয়া এক ব্যক্তি কষ্টে গহ্বর মধ্যে যাইতে পারে। আমি গহ্বর মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সেখানে কেহ নাই।

তবে এইখানে যে কোন লোক বাস করে, তাহাতে আমার আর কোনই সন্দেহ রহিল না। গহ্বরের মধ্যে কয়েকটী জিনিস পড়িয়া আছে, এক স্থানে এক কলসী জল ও একটা ঘটি রহিয়াছে, গৃহের এক কোণে একখানা তোয়ালেতে বাঁধা কি রহিয়াছে। আমি গৃহমধ্যে গিয়া তোয়ালে খুলিলাম; দেখিলাম, ভিতরে এক থালা ভাত, কয়েকখানা রুটী ও তিন-চার রকম তরকারী রহিয়াছে, সেগুলির নীচে কিছু আছে কি না, আমি দেখিবার জন্য সেগুলি সরাইলাম, দেখি—তাহার নীচে একখানা কাগজ।

আমি ব্যগ্রভাবে কাগজখানা তুলিয়া লইলাম, তাহাতে যাহা লিখিত দেখিলাম, তাহাতে আমি বিস্ময়ে আপাদমস্তক স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

লিখিত আছে ;—

"আজ ডাক্তার বাবু নবদুর্গার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন।"

কয়েক মুহূর্ত্ত আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর আবার আমার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল। আমি ভাবিলাম, "দেখিতেছি, তাহা হইলে এই লোকটা মণিভূষণের পিছু লয় নাই, আমারই পিছু লইয়াছে, নিজে আমার অনুসরণ না করিয়া অন্যকে এ কাজে নিযুক্ত করিয়াছে। এই বালকই তাহা হইলে আমার অনুসরণ করিতেছে। আমি এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার সমস্ত খবরই এই লোক পাইয়াছে, অলক্ষ্যে থাকিয়া সে যে আমাদের চারিদিকে জটিল জাল বিস্তৃত করিতেছিল, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। এই লোকই কিছুদিন পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ছদ্ম শ্মশ্রু গুম্ফ ধারণ করিয়া কলিকাতায় মণিভূষণের অনুসরণ করিয়াছিল।

আরও কোন কাগজ-পত্র এই গহ্বরে আছে কি না, আমি তাহারই সন্ধান করিতে লাগিলাম,কিন্তু আর কিছু পাইলাম না। লোকটা কে—কিরূপ চরিত্রের, তাহা যদি কোনরূপে জানিতে পারি, এজন্য সেই গহ্বরে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম ; কিন্তু এইমাত্র বুঝিলাম যে, লোকটা অতি কষ্টেই এখানে বাস করিতেছে। গুরুতর কিছু উদ্দেশ্য না থাকিলে কেহ কখনই এত কষ্টে থাকিতে পারে না।

লোকটা আমাদের শত্রু না মিত্র? আমাদের হানি করিবার জন্য এখানে এইরূপে বাস করিতেছে, না আমাদের শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানে আছে? যাহাই হউক, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত না করিয়া আমি এখান হইতে নড়িব না। এ সুযোগ ছাড়িলে গোবিন্দ-রাম শুনিয়া বলিবেন কি—লজ্জায় যে আমি তাঁহার সম্মুখীন হইতেই পারিব না।

তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। গহ্বরের মুখ পশ্চিমদিকে ; সেইজন্য তখন বাহির হইতে দিনান্তের ম্লান আলো আসিয়া গহ্বরের ভিতরে সম্মুখভাগে কতকটা স্থান আলোকিত রাখিয়াছিল, এবং ভিতরের অন্ধকার তেমন নিবিড় হইতে পারে নাই। আমি পিস্তল হস্তে নীরবে সেই অর্দ্ধান্ধকার গহ্বরমধ্যে বসিয়া রহিলাম। ঘোরতর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বসিলাম, তাহাকে না দেখিয়া এখান হইতে কিছুতেই নড়িব না। ইহাতে বিপদ্ আছে, তাহা

বেশ বুঝিলাম, বিপদের ভয় করিলে কোন কার্য্যোদ্ধারই হয় না। আর আমার নিকটওে পিস্তল আছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাহিরে দূরে কাহার পদশব্দ শুনিলাম, অমনই আমি গহ্বরের অন্ধকার কোণে লুকাইলাম, দুই হস্তে দুই পিস্তল সুদৃঢ়ভাবে ধরিলাম। তাহাকে প্রথমে না দেখিয়া কিছুতেই তাহাকে ধরা দিব না।

পদশব্দ আরও নিকটস্থ হইল, তাহার পর নীরব হইল; প্রায় দশ মিনিট আর কোন শব্দ নাই—তাহার পরে আবার শব্দ হইল, ক্রমে পদশব্দ গহ্বরের দ্বারে আসিল। এক ব্যক্তির সুদীর্ঘ ছায়া গহ্বরমধ্যে প্রসারিত হইল, তাহার পর একজন বলিল, "ডাক্তার, গর্ত্তের মধ্যে একা অন্ধকারে কষ্ট পাও কেন? বাহিরে এস!"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

একি রহস্য! আমি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত আমি আমার কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—এ কে? এ কাহার কণ্ঠস্বর? এ যে—কি আশ্চর্য্য!

আমি ব্যস্ত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া গহ্বরের বাহিরে ছুটিয়া আসিলাম; বলিলাম, "গোবিন্দরাম—তুমি—তুমি?"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এইদিকে এস, ডাক্তার, সাবধান—তোমার পিস্তল, দেখিও অপঘাত মৃত্যু ঘটাইও না।"

আমি অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, গোবিন্দরাম এক প্রস্তর-খণ্ডের উপরে বসিয়া মৃদুহাস্য করিতেছেন। তিনি যেন আরও রোগা হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চোখের জ্যোতিঃ যেন দ্বিগুণিত হইয়াছে। আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া তিনি আরও হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "সত্যকথা বলিতে কি, তোমায় দেখিয়া যে আনন্দ হইয়াছে, তেমন জীবনে আমার আর কখনও হয় নাই।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বরং আশ্চর্য্য বল—কেমন নয়?"

"হাঁ, তাহাও অস্বীকার করি না।"

"তবে ইহাও বলি যে, কেবল তুমিই যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ, তাহা নহে। তোমায় এখানে দেখিয়া আমিও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি জানিতাম না, তুমি আমার গুপ্ত-আশ্রমের সন্ধান পাইয়াছ, আরও জানিতাম না যে, তুমি এখন

আমার আশ্রমে লুকাইয়া আছ—এই পাহাড়ের কাছে আসিয়া জানিলাম, তুমি এখানে আছ।"

"আমার পায়ের দাগ দেখিয়া বুঝিয়াছিলে, নিশ্চয়।"

"না, ডাক্তার, তোমার পায়ের দাগের বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই; তবে তোমায় জানা শক্ত নহে। তোমার চুরুট কোথায় যাইবে? একটু দূরেই তোমায় চুরুটের গোড়া পড়িয়া আছে; বোধ হয় যখন পিস্তল হাতে এই গর্ত্তে প্রবেশ করিতেছিলে, সেই সময়ে চুরুটটা তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিয়াছিলে।"

"হাঁ, এখন মনে পড়িল।"

"আমি তাহাতেই বুঝিলাম যে, তুমি পিস্তল হাতে এইখানে বসিয়া আছ। তুমি মনে করিয়াছিলে, আমিই হারু ডাকাত।"

"না, তা ঠিক মনে করি নাই, তবে এই লোকটা যে কে তাহা দেখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম।"

"খুব ভাল—ডাক্তার, খুব ভাল। তবে আমি যে এখানে আছি, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? হয় ত যেদিন তোমরা ডাকাত ধরিতে বাহির হইয়াছিলে, সেইদিন আমায় দেখিতে পাইয়াছিলে।"

"হাঁ, সেদিন আমি দূরে তোমায় দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

"তাহার পর এ লোকটা কে দেখিতে আমার জন্য সমস্ত মাঠটা খুঁজিয়াছিলে নিশ্চয়?"

"না—যে ছোকরা তোমার খাবার লইয়া আসে, তাহাকে দেখিতে পাইয়াই এখানে আসিয়াছিলাম।"

"তুমি তাহাকে প্রথমে দেখ নাই; বোধ হয় এটা ভূতনাথের কাজ, তাহা আমি পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিলাম। এই যে গঙ্গারাম কিছু খাবার রাখিয়া গিয়াছে।"

গোবিন্দরাম সেই গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কাগজখানা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এই যে আরও দেখিতেছি, তুমি নবদুর্গার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে?"

"হাঁ, আজ সকালেই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।"

"খুব ভাল। দেখিতেছি, আমি যে ধরণে অনুসন্ধান করিতেছি, তুমিও সেই ধরণে অনুসন্ধান করিতেছ। এখন আমরা আমাদের সন্ধানের ফল পরস্পরে মিলাইলে কতকটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিব। এস ডাক্তার, বসো।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন আমরা দুইজনে সেই নির্জ্জন প্রান্তরমধ্যে প্রস্তরখণ্ডের উপরে বসিলাম। আমি বলিলাম, "তুমি এখানে আসিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখানকার এই সকল গুরুতর রহস্য আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কেবল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলাম। যাহাই হউক, তুমি কবে এখানে আসিলে, কতদিন এখানে এভাবে আছ, আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই; আমি জানি, তুমি নিশ্চিন্তভাবে কলিকাতায়ই আছ।"

"যাহাতে তোমরা তাহাই ভাব, সেইরূপ উদ্দেশ্যই আমার ছিল।"

"তাহা হইলে দেখিতেছি, তুমি আমায় আদৌ বিশ্বাস কর না।"

"ডাক্তার, রাগ করিও না, তুমি কি জান না যে, আমার সমস্ত অনুসন্ধানেই তুমি আমার প্রধান সহায়। তোমায় না জানাইয়া যে এখানে লুকাইয়া আছি, তাহার কারণ ত তুমি। আমি জানি, তুমি এখানে আসিয়া সর্ব্বদাই গুরুতর বিপদে পড়িতে পার, তাহাই আমি কলিকাতায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি আমি তোমাদের সঙ্গে গড়ে মণিভূষণের বাড়ী আসিতাম, তাহা হইলে তোমরা এ সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছ, আমিও সেইরূপ ভাবিতাম। আর আমার প্রকাশ্যভাবে এখানে আসায় অপর লোক সাবধান হইয়া যাইত। এই রকম লুকাইয়া এখানে উপস্থিত থাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার সুবিধা পাইয়াছি। এখন প্রয়োজনমত আবির্ভূত হইতে পারিব।"

"কিন্তু আমাকে এরূপ অন্ধকারে রাখিতেছ কেন?"

"তোমায় জানাইলে তাহাতে আমাদের কাজের কোনই সুবিধা হইত না, অথচ হয় এখানকার সকল লোকেই আমার কথা জানিতে পারিত। আমি গঙ্গারামকে সঙ্গে আনিয়াছি, তুমি ত জান, সে কি রকম চালাক ছেলে। সে গ্রামে থাকে, সেখান থেকে লুকাইয়া আমার খাবার এখানে দিয়া যায়, সেখানে কোথায় কে কি করিতেছে, তাহার সন্ধানও তাহার কাছে পাই। দেখিলে ত তোমারও সকল খবর সে আমাকে দিয়াছে। অনেক দূর হইতে তুমি গঙ্গারামকে দেখিয়াছিলে বলিয়া চিনিতে পার নাই।"

"আর আমি তোমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছি, তাহা সমস্তই পণ্ডশ্রম হইয়াছে।"

গোবিন্দরাম হাসিয়া পকেট হইতে একতাড়া পত্র লইয়া বলিলেন, "এই লও—ডাক্তার, তোমার সব পত্র—সব পত্রই কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আমার

হাতে আসিয়াছে। তুমি যে রকম চেষ্টা করিয়া এই বিষয়ের সন্ধান লইয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রশংসা করি।"

আমি প্রথমে গোবিন্দরামের উপর একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম, এখন তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, তিনি যাহা করিয়াছেন, ভালর জন্যই করিয়াছেন। কাহারা মণিভূষণের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা আমরা জানি না। তবে এটা জানিয়াছি যে, তাহারা আমাদের সকল খবরই রাখিতেছে, সুতরাং গোবিন্দরাম এখানে আসিয়াছেন জানিতে পারিলে, তাহারা নিশ্চয়ই খুব সাবধান হইয়া পড়িত, আমরা তাহাদের কার্য্যকলাপ কিছুই জানিতে পারিতাম না।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এখন নবদুর্গার সঙ্গে দেখা করিয়া কি জানিতে পারিলে তাহাই শুনি। আমি এটা জানিয়াছি, রাজা অহিভূষণের মৃত্যু সম্বন্ধে সে ইচ্ছা করিলে কোন-না-কোন কথা বলিতে পারে। তুমি নবদুর্গার সঙ্গে দেখা না করিলে আমি নিজেই তাহার সঙ্গে দেখা করিতাম।"

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, আমরা দুইজনে আহার করিতে করিতে সেই নির্জ্জন মাঠে বসিয়া নবদুর্গার কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম। নবদুর্গা আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে সকল কথা হইয়াছিল, আমি সকলই গোবিন্দরামকে বলিলাম। তিনি নীরবে অতি মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিলেন; আমার কথা শেষ হইলে বলিলেন, "এই গোলযোগে ব্যাপারের যে অংশটা ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তাহা এখন অনেকটা পরিষ্কার হইল। বোধ হয় তুমি জান যে, এই নবদুর্গার সঙ্গে সদানন্দের খুব ভাব আছে।"

"তাহা শুনি নাই। জানা-শুনা থাকিতে পারে।"

"কেবল জানা-শুনা নয়, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই ইহাদের দুইজনে গোপনে দেখা হয়, গোপনে চিঠী-পত্র চলে। ইহাতে আমাদের বিশেষ কাজ হইতে পারে। যদি এই সদানন্দের স্ত্রীকে কোনরূপে হাত করা যায়——"

"সদানন্দের স্ত্রী! সে কে?"

"তুমি যাহা জান না, আমি তোমায় এখন তাহাই বলিতেছি। মুঞ্জরী তাহার ভগিনী নহে—তাহার স্ত্রী।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "ভগিনী নয়—স্ত্রী—সে কি? আর মণিভূষণের ইহার জন্য টান!"

"তাহাতে মণিভূষণের ক্ষতি ব্যতীত আর কাহারও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক এটা স্থির যে, মুঞ্জরী সদানন্দের স্ত্রী।"

"এ রকম বিশ্রী প্রবঞ্চনায় মানে কি?"

"মানে এই যে, ভগিনী বলিয়া—বিধবা ভগিনী বলিয়া তাহার পরিচয় দিলে তাহার কাজের সুবিধা হইবে।"

আমি গোবিন্দরামের কথার কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। সদানন্দকে অতি ভাল মানুষ—শিক্ষিত লোক বলিয়া বোধ হয়; সে কেন নিজের স্ত্রীকে ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া সকল লোককে এরূপ ভাবে ঠকাইতেছে? তবে ত সে অতি ভয়ানক লোক! আমি বলিয়া উঠিলাম, "তবে সেই এই সকল বদমাইসী করিতেছে—সেই কলিকাতায় আমাদের পিছু লইয়াছিল।"

"খুব সম্ভব।"

"তাহা হইলে এই মুঞ্জরীই মণিভূষণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল?"

"নিশ্চয়ই।"

"এই লোকটাই এই সকল ভয়াবহ কাণ্ড করিতেছে, অথচ আমি ইহাকে একবারও সন্দেহ করি নাই। কি ভয়ানক! সদানন্দের এই সকল করিবার উদ্দেশ্য কি? মণিভূষণ বা অহিভূষণের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার লাভ কি?"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কবিতা-কুঞ্জ।

শমন জারি।

বলাইলালের ছিল না কর্ম্ম
লিখিতে লাগিল কবিতা,
প্রেম প্রণয়ের শ্রাদ্ধ সমাপি'
লিখিল দেশের বারতা।
দেশের মানব মেষের মত
দেশটা ভীষণ শ্মশান—
ক'রে বঙ্গভঙ্গ দেশের রাজা
করলে দেশটা দু'খান।

এ সব কথার দিব্যি রকম
বীররস ছিল মাখানো—
খেলেনি' যদিও কভু সে স্বয়ং
বৈটক কি কুস্তি কখনো।
যা'হোক, পরে করলেন তিনি
মানবলীলা সম্বরণ!
রইল পড়ে তাঁ'র কাব্যখানি—
একটি মাত্র পুত্রধন!

কবি-পুত্রের বয়স যখন
বৎসর পাঁচ কি হয় ;
সিদিশনের ঢেউটা বিষম
বহে গেল বাঙ্গলাময়।
সরস নীরস কতই কবি
খেলেন কত হাবুডুবু,
কারো নাকে মুখে ঢুক্‌লো পানি—
কবির দল হ'ল কাবু।
এমনি সময় পুলিশ হাঁকে
'হাজির হো বলাইলাল'—
কহেন কেহ কোথায় বলাই,
তা'রে ধরেছে মহাকাল!
কবি ভণে, এযে কালের গুণে
হ'বে মহাকালের কাল,
পুলিশ-কালের পড়লে হাতে
তার হবে হাড়ীর হাল!
যা'হোক পরে হাকিম-হুকুম
হ'ল মিঠে কড়ার মত,
ছুটলো পুলিশ ধমকী দিয়ে—
ধল্লে বলাই ছিল যত।
রং বেরঙ্গের একশ' বলাই
হাজির দেখে এক ঠাঁই,
হাকিম কহে, কি ছাই বালাই!
কবি-বলাইলাল চাই!
রামখেলাবন্ সিং ছিল এক
পুলিশ দলে বীরক্ষত্র,
বীরের মতন ধল্লে তখন
বলাই-কবির সে পুত্র!
হাকিম কহে, এ বাপের বেটা,
লাগাও হাতে হাতকড়ি!
খোকা বলে তোরা বাজনা বাজা,
হ'ল আমার হাতে খড়ি!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

মিলন।

(শকুন্তলা ৭ম অঙ্ক হইতে)

দুষ্যন্ত।
মাতলি হে সুতশ্রেষ্ঠ প্রভু দেবরাজ।
করিলা যে সমাদর দেবতা সমাজ॥
অতীব দয়ালু তাঁরা এই অভাজনে।

মাতলি।
চির ঋণে বদ্ধ তাঁরা রাজা তব গুণে॥
দেবলোকে দানবের অত্যাচার ভয়ে।
সুখে নিদ্রা না যাইত নিশীথ সময়ে॥
হে রাজন্ ধন্য তব অস্ত্রশিক্ষা লক্ষ্য।
নরলোকে নাহি কেহ তব সমকক্ষ॥

দুষ্যন্ত।
পূরব পশ্চিমে ব্যাপি ভূধর বিস্তৃত,
বিচিত্র গঠন যেন সুবর্ণ নির্ম্মিত।
কোন্ পুণ্য স্থান ওই দেবেন্দ্র সারথি!

মাতলি।
হেমকূট গিরি ওই শুন নরপতি
ভগবান কশ্যপের আশ্রম মহান্
অপ্সরা কিন্নরাদির বিহারের স্থান।

দুষ্যন্ত।
কিবা কমনীয় অহো এই পুণ্যাশ্রম।
সম্মুখেতে মূর্ত্তিমান শান্তিরস সম।
নব নব পল্লবের রক্তবর্ণ ঢাকি
হোম-ধূমে হইয়াছে কালিমা বরণ
আনন্দে কুলায়ে ডাকে নানা বর্ণ পাখী
সিংহ ব্যাঘ্র সনে সুখে খেলে মৃগগণ।
চাহি দেখ প্রাণে মম কি অমৃত ধারা।
ভুলে সব দুঃখ শোক, পবিত্র আমার
সমগ্র অন্তর—যেন তীর্থ স্নান শেষে
পাইলাম মোক্ষ ফল মূর্ত্তিমান বেশে—
হে সারথে রথ বেগ কর সংবরণ
সুরপতি পিতা পদ করিব বন্দন।

(জনৈক ঋষিকুমারকে দেখিয়া)

আগচ্ছতু মহাভাগ তাপস-কুমার
ভগবান কশ্যপেরে দেহ নমস্কার

ঋষিকুমার।

জয়োস্তু রাজন্ আজ্ঞা দিলা কুলপতি।
ক্ষণেক হেতায় তুমি তিষ্ঠহে ভূপতি।

দুষ্যন্ত। (প্রস্থিত)

কিছুক্ষণ বসি আমি অশোকের মূলে।
মাতলি তুরঙ্গে তুমি লহ নদীকুলে।

মাতলি।

যথা আজ্ঞা (প্রস্থিত)

দুষ্যন্ত। স্পন্দিছে দক্ষিণ বাহু হায়।
ইষ্টলাভ মম কিবা হবে পুনরায়!
যখন হারায়ে জ্ঞান মদগর্ব্বে ভুলি,
বিসর্জ্জন দিছি প্রিয়া সোণার পুতলি,
বৃথা আশা

(নেপথ্যে) বাছা কেন এত অত্যাচারি,
একি কেবা হেন কর বুঝিতে না পারি।
তপোবন ইহা শান্তিময় এই স্থান।
কে এখানে অত্যাচারি করিব সন্ধান।

(পরিক্রমণ তাপসিদ্বয় ও সর্ব্বদমনকে দেখিয়া)

অনায়াসে সিংহ সনে খেলিছে নির্ভয়ে!
কে ওই সুন্দর শিশু কাহার তনয়!

তাপসী।

নাহি দিও ক্লেশ বাছা আশ্রম পশুরে।

দুষ্যন্ত। (স্বগত)

সাধ হয় রাখি বুকে সোণার শিশুরে।

তাপসী। (অপরার প্রতি)

শোন সখি কুটির নহেত বহুদূর।
তথা হতে আন ত্বরা মাটির ময়ূর।

(অপরা প্রস্থিত)

ছাড় বাছা সিংহ শিশু দিবরে খেলনা।

দুষ্যন্ত।

বুঝিতে না পারি কিছু বিধির ছলনা॥

রাজ চক্রবর্ত্তি সম সর্ব্ব সুলক্ষণ।
সে কেন আশ্রম পদে না বুঝি কারণ॥

তাপসী।

গেল বুঝি জীবন এ নির্দ্দোষ পশুর।

(রাজাকে দেখিয়া)

মহাশয় হস্তগ্রহ খুলুন শিশুর॥

দুষ্যন্ত। (ছাড়াইয়া)

একি বৎস তুমি পুত তাপস-কুমার।
অবিনয় এহেন না শোভয়ে তোমার।

তাপসী।

এ নহে তাপস শিশু শুন মতিমান্।
পুরুবংশজাত এই ক্ষত্রিয় সন্তান॥

দুষ্যন্ত।

কহ তবে পুণ্যবতী এই দেবস্থলে।
কিরূপে মানব এল কোন পুণ্যফলে॥

তাপসী।

অপ্সরার গর্ভজাত, তাই হেতা বাস।

দুষ্যন্ত। (সোদ্বেগে)

ইহার পিতার নাম করহ প্রকাশ॥

তাপসী।

কে লবে সে দারা-ত্যাগি পাষণ্ডের নাম!

২য়া তাপসী। (সর্ব্বদমনের প্রতি)

শকুন্ত লাবণ্য দেখ নয়নাভিরাম।

সর্ব্বদমন। (ইতস্ততঃ চাহিয়া)

মা কই, মা কই, ওগো, মা কই আমার!

তাপসী (দূরে শকুন্তলাকে দেখিয়া)

ওই দেখ আসে বাছা জননী তোমার।

দুষ্যন্ত।

একি দেখি যেন মম শকুন্তলা সম।

শকুন্তলা।

ওকি আর্য্যপুত্র না না নয়ন বিভ্রম।

দুষ্যন্ত। (উন্মাদের ন্যায়)

প্রিয়ে প্রিয়ে শকুন্তলে যেওনা চলিয়ে।

শকুন্তলা।

পড়েছে কি মনে নাথ দুঃখিনী বলিয়ে?

দুষ্যন্ত।

পদে ধরি প্রাণেশ্বরি ক্ষম অপরাধ।

শকুন্তলা।

এতদিনে আর্য্যপুত্র ঘুচিল বিবাদ।
লহ প্রিয় পুত্র তব দুঃখিনীর ধন।

দুষ্যন্ত।

চল গিয়া বন্দি প্রিয়ে কশ্যপ চরণ॥

সমাপ্ত।

শ্রীমতী অম্বুজা ঘোষ।

নিরাশা।

(১)

দিবা পরে রাত্রি আসে, রাত্রি পরে দিন;
ষড় ঋতু ঘুরি' পুনঃ করে আগমন।
যায় যাহা—আসে ফিরে—এই যদি রীতি,
কেন তবে কান্তা নাহি দিলা দরশন!

(২)

আজি হেরি শুখতারা শোভিছে গগনে;
কাল পুনঃ যাবে চলে—আসিবে আবার।
যদি এ জগত রীতি কেন তবে হায়!
হৃদয়ের ধ্রুবতারা এলনা আমার!

(৩)

সপ্তমীতে গিরিপুরে গৌরীর উদয়;
দশমীতে পুনঃ তাঁর হয় বিসর্জ্জন।
বৎসরান্তে আসে ফিরি—এ যদি বিধান;
প্রণয়িনী কেন নাহি দিল দরশন।

(৪)

সুদীর্ঘ বৎসর এক গিয়াছে চলিয়া,
হৃদয় উপর দিয়া, দলি' মর্ম্মস্থল।
আসার আশায় তা'র সহিনু যন্ত্রণা;
না মিটিল আশা হায় সার আঁখিজল!

(৫)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি এ কেমন বিধি;
বুঝিতে যে নারি কিছু দাও প্রভু ব'লে।
কোথা হ'তে আসে জীব দুদিনের তরে;
জীবনান্তে কোথা পুনঃ যায় সবে চলে!

(৬)

জন্ম মৃত্যু এই যদি জগতের রীতি;
কেন তবে কোন মোহে মানব সঙ্কুল।
প্রকৃতি শৃঙ্খলে বদ্ধ লূতাতন্ত প্রায়;
বিয়োগে ব্যথিত হৃদি—অন্তর ব্যাকুল?

(৭)

ভেঙ্গে দাও দয়াময় সংশয় জটীল;
কিম্বা এ রহস্যে ঢাকা জগৎ-সংসার।
কেন জীব ফিরে সদা ভ্রান্তের মতন;
সহিয়া হৃদয়ে শুধু যাতনা অপার॥

(৮)

হে দেব নিখিলপতি করুণা নিধান,
তব পদে আজি মোর এই নিবেদন।
ঘুচে যেন তব নামে ভব মায়া ভোর;
অন্তিমেতে লভি তব রাতুল চরণ॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

সাহিত্য-সমাচার।

Indian Review—Vol. X, No. 5—আমরা এই সংখ্যা ইণ্ডিয়ন রিভিউ পাইয়াছি। ইহাতে অনেকগুলি ইংরাজীতে লিখিত সুন্দর প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে Emigration from India শীর্ষক প্রবন্ধে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে কত ভারতবাসী আছে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে; নিম্নে এই প্রবন্ধটীর সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।

			সালে	ভারতীয় প্রবাসীর সংখ্যা।
১।	আণ্ডামান্ দ্বীপ (Andaman Island) *		১৯০১	১৬,০৫০
২।	অষ্ট্রেলিয়া (Australia)	...	...	৯৩৯
৩।	বেলুচিস্থান (Beluchistan) †		১৯০১	২৬,১৮০
৪।	ব্রহ্মদেশ (Burmah)	...	১৯০১	৪২০,৭৭৪
৫।	দারবান (Durban)	...	১৯০৪	১৫,৮৫৭
৬।	ফিজি দ্বীপ (Fiji Islands)	...	১৯০১	১৭,১০৫
৭।	আফ্রিকার পূর্ব্বদেশ ‡ (German E. Africa)	...	...	১০,০০০
৮।	গায়না (British Guiana)	...	১৯০৫-১৯০৬	২৭৮,৩২৮
৯।	ঐ (Dutch Guiana)	...	...	১৭,৯৫৪
১০।	হংকং (Hongkong)	...	১৯০১	৩,৯০৭
১১।	মলয়দেশ (Malay States)	...	ঐ	৫৮,২১১
১২।	মরিসস্ (Mauritius) §	...	...	২০৬,১৩১
১৩।	নেটল (Natal)	...	১৯০৪	১০০,৯১৮

* ভারতবর্ষের দ্বীপান্তর আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে এইখানে নির্ব্বাসিত করা হয়।

† এই দুই দেশে ভারতীয় সৈন্যসমূহ রক্ষিত হয়।

‡ ভারতীয় প্রবাসী ও আরবদেশীয় লোক লইয়া মোট ১০,০০০ লোক আছে।

§ এই স্থানের প্রবাসীদের সংখ্যার মধ্যে ভারতবর্ষীয় মুসলমান ধরা হয় নাই।

		সালে	ভারতীয় প্রবাসীর সংখ্যা।
১৪।	আমেরিকা (North America)	১৯০৭	৩০০০
১৫।	পিটরমরিসবর্গ (Petermaritzburg)	১৯০৪	৫,২৮৯
১৬।	সোমালিল্যাণ্ড (Somaliland)	১৯০৪	৪০০
১৭।	ষ্ট্রেট্ সেট্লমেণ্ট্স্ (Strait Settlements)	১৯০৫	৩৯,৫৪০
১৮।	ট্রান্সভাল (Transvaal)	ঐ	৯,৯৭৯
১৯।	ট্রিনিডড (Trinidad)	ঐ	৮৪,৩৫৭
২০।	উগাণ্ডা ষ্টেট্ রেলওয়ে (Uganda State Ry)	...	২,১০০
২১।	জানজিবার (Zanzibar)	...	১০,০০০
			১৩,২৭,০০০

উপরিউক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় প্রবাসীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের অতি সন্নিকটে এবং ইহার একটী অংশ বিশেষ; পরন্তু ইংরাজের অধিকারের পর হইতে ব্রহ্মদেশের অধিবাসী সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। মরিসস্, গায়না, নেটল্ ও ট্রিনিডড্ প্রভৃতি দেশের ভারতবর্ষীয় প্রবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কুলী মজুরের কার্য্যে নিয়োজিত।

ভারতবর্ষের ১৩,২৭,০০০ লোক ভারতের বাহিরে অবস্থান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত অনেক লোক আফ্রিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আছে তাহাদের সংখ্যা উক্ত তালিকাভুক্ত নহে।

Indian Reviewর প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ ও সুখপাঠ্য। আমরা এ পত্রিকার কুশল প্রার্থনা করি।

দেশপূজ্য, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত সুরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী" পত্রের মন্তব্য—

Chitravali— * * * Remarka style and exhibits a characteristic originality which mmendable. The heroes and heroines are not of the y type and scenes of action are various. The painti truly realistic and we have no hesitation in declari title of the book to be appropriate. * * *

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সান্ধ্য স পত্র "এম্পায়ার" হইতে উদ্ধৃত—

* * Vigorously written and distinctly original in conception. One is struck by th that the heroes and heroines of the writers are not of ype one ordinarily meets with in Bengali novels. *

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "ঃ লিখিয়াছেন—

চিত্রাবলী। * * * ইহা একখানি য় গল্পগ্রন্থ হইয়াছে। * * রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, প্রভাতবাবু প্রভৃতির পড়িয়া আমরা যে প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, আজি এই গ্রন্থখানি পড়িয়া দিনের পরে সেই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। আমরা আলোচ্য গ্রন্থকে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির সমশ্রেণীস্থ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই পুস্তকের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে প্রাণ রসেরই অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। * * আলোচ্য গ্রন্থে আমরা রূপ লিপি কুশলতার পরিচয় পাইয়াছি, আধুনিক উপন্যাস গ্রন্থে তাহা । পুস্তকের বাঁধাই উৎকৃষ্ট এবং ইহার ছাপা ও কাগজ অতি পরিষ্কা * * * ।"

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সংবাদপত্র "এডুকেশন গেজেটের" মত—

চিত্রাবলী। * * * আমাদের খুব ভাল লাগিল।

চিত্রাবলীর মূল্য ১৲ টাকা ভিঃপিঃতে ১৶৹ আনা।

অর্চ্চনা কার্য্যালয়
১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,
অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস, কলিকাতা।

শ্রীউমাচরণ ধর
কার্য্যাধ্যক্ষ, অর্চ্চনা।

কলিকাতা ৫।১২ সুকীয়া ষ্ট্রীট মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

ষষ্ঠ বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩১৬। [৭ম সংখ্যা
August 1909.

অর্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসজ্ঞানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ডাঃ মাঃ লাগে না।

অভিনয় ও অভিনেতা।

অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচকের মুখে আর একটী নূতন কথা শুনিলাম—তাহা এত বৎসর অর্দ্ধেন্দুর সহিত বেড়াইয়া জানিতে পারি নাই। তিনি কাহাকে নাকি বুঝাইয়াছিলেন যে অভিনয়কালে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে বাঙ্গলায় কবিতা পাঠ ত সুন্দর হয়ই, গদ্য পাঠও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে সুন্দর হইয়া থাকে। কখনও গুরু গম্ভীর ভূমিকায় 'দীন' অর্থে দরিদ্র, দিবা নয় ইহা বুঝাইবার জন্য দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কথা কহিতে প্রায় দেখা যায় না। বরঞ্চ কোন আঘাত লাগিলে বৈপরিত্যই দেখা যায়। 'দীন-হীন' শব্দটী তখন দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় না—'দিন-হিন' এইরূপ হ্রস্বই উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিনয় স্বভাবের ছবি—এইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণে অভিনয়—বিসদৃশ হইবে। বলেন্দ্রসিংহ ভীমসিংহের ভাই হইলেও তাঁহার মুখে "এইবারে দূত মহাশয়" এরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখা চলিবে না। রাণীর কথাতেও চলিবে না, কৃষ্ণকুমারীর কথাতেও চলিবে না। 'কৃষ্ণকুমারী'নাটক সাধুভাষায় লিখিত, তাহাতেও ওরূপ উচ্চারণ চলে না, চলিত ভাষায় যাহা লিখিত তাহাতে ত চলিবেই না—আর কবিতায়—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।"

এই সুললিত ছন্দ, নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী ইত্যাদি রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কেমন সুন্দর হইবে তাহা পাঠক একবার পড়িয়া দেখুন।

সংস্কৃত রচনায়—হ্রস্ব দীর্ঘ যাহার জীবন—তাহাতেও পাঠ সুললিত করিবার জন্য কখন কখন হ্রস্ব দীর্ঘ বর্জ্জন করিতে হয়, যথা ছন্দোগ্রন্থ "পিঙ্গলসূত্রে" উদাহৃত "তং প্রণমামি চ বালগোপালম্" এই স্থলে 'গোপালে'র 'গো' দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। উক্ত গ্রন্থে ইহার বিশেষ সূত্র আছে। সংস্কৃত নাটকের যে সকল ভূমিকা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত তাহা অভিনয়কালে কখন কখন হ্রস্ব দীর্ঘ বর্জ্জন করিয়া অভিনয় করিতে হয়। বাঙ্গালা নাটকে অবশ্য কচিৎ কোন ভূমিকায় স্থল বিশেষে

স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা—ভীমসিংহের ক্ষিপ্তাবস্থায় আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া—"রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডারূপে গর্জ্জন কচ্চেন!" ইত্যাদি স্থলের অভিনয়কালে। কিন্তু তাই বলিয়া যত্রতত্র বর্ণে বর্ণে হ্রস্ব দীর্ঘ লক্ষ্য করিলে চলে না।

উক্ত সমালোচক মহাশয় আমায় অভিনয় শিক্ষার পদ্ধতির জন্য আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া কয়েকজন অভিনেত্রীর অভিনয়ের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। তৎসঙ্গে প্রতিভাশালী স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের উপরও তীব্র কটাক্ষ আছে কিন্তু বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে অমৃতলালের পদতলে বসিয়া শিক্ষা লাভের যোগ্য ব্যক্তি কয়জন আছেন তাহা আমি জানি না। আর একটী কথা চলিয়া আসিতেছে যে অর্দ্ধেন্দু ও আমার শিক্ষাপ্রণালী পৃথক। উক্ত সমালোচকের মতে আমার শিক্ষার সুর অস্বাভাবিক। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সুরবর্জ্জিত—স্বাভাবিক। সমালোচক মহাশয় যদি বুঝিতেন যে স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাব প্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন;—সমস্ত কথাই ছন্দে, সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয় এবং ছন্দ ও সুর কলাবিদ্যাবলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয় আর নট ভাব প্রকাশক সুরেই অভিনয় করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ের আলোচনায় বৃথা কাগজ কালী ব্যয় করিতেন না এবং কণ্ঠস্বরও নষ্ট করিয়া বেড়াইতেন না। বোধ হয় সমালোচক মহাশয়ের ধারণা—গদ্যে যাহা রচিত হয় তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে—গদ্য স্বাভাবিক নয়। ছন্দোবন্ধে আমরা কথা কহি—সুতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাব প্রকাশ করি অতএব সুরই স্বাভাবিক। তবে সুর বেশি মাত্রা করিলে তাহা ঢং হয়, আর অর্দ্ধেন্দুর অশিক্ষিত অনুকরণকে ভাঁড়াম বলে। নাটক শিক্ষার প্রণালী দুই প্রকার হয় না। কোন এক নাটক দুইজন নট দুই ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, দুই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ দুই নট সেই নাটক একভাবে গ্রহণ করেন তবে ব্যাখ্যা একরূপই হইবে তাহাতে দুই প্রণালী হইতে পারে না। ব্যাখার ভুল হইতে পারে—কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ যিনি যেরূপে নাটকের ভাব কল্পনা করিয়াছেন তদনুসারে। কিন্তু ব্যাখ্যার বৈচিত্রকে শিক্ষার প্রণালী বলে না। আমরা যে ছন্দে কথা কহি ও সুরে ভাব প্রকাশ করি ইহা ভাবিয়া বুঝিতে হয়। যদি

কেহ তাহা না বুঝিতে পারেন তবে তাহার নিমিত্ত আমাকে কি দায়ী হইতে হইবে ? কলাবিদ্যা ভাবুকের সকলের নয়।

নটের আর একটী বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। রঙ্গালয়ের চিত্রকর যে সকল দৃশ্যপট চিত্রিত করেন নিকটে তাহা ঠিক বোঝা যায় না, অনেক সময় 'পোঁচড়া' টানা মনে হয় কিন্তু দর্শক দূর হইতে চিত্রকরের কৌশল বুঝেন ও প্রশংসা করেন। দূর হইতে দেখিবার জন্য সেগুলি চিত্রিত হইয়াছে। নট মুখে রং মাখেন কিন্তু দৃশ্য পটের ন্যায় নিকটে তাহা কদর্য্য দেখায়। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম 'ম্যাক্‌বেথ্‌' অভিনয় হয় তখন সুযোগ্য বেশকারী পিম্‌সাহেব আসিয়া রং মাখান, নিকটে তাহা অতি কদর্য্য বোধ হইত কিন্তু দূর হইতে অন্যরূপ দেখাইত—কৃষ্ণবর্ণ নটকেও গৌরবর্ণ মনে হইত—অস্বাভাবিক বোধ হইত না। বর্ণ সমাবেশের ন্যায় অভিনয় সম্বন্ধেও দূরে উক্তি ও নিকটে উক্তিতে প্রভেদ আছে। কথা দূরে শুনাইবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন আছে। সে কৌশল মহলা দিবার সময়ে কঠোর বোধ হয়। যিনি এই কৌশল জানেন না তিনি শিখাইবার সময় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার জন্য যাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন তাহাতে অভিনয় হয় না। যেমন সরু কাজ রঙ্গালয়ের দৃশ্যে চলে না সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মন্ত্রণা দৃশ্যে, মন্ত্রণা পরামর্শাদি স্বভাবতঃ চুপি চুপি করা হইলেও, নটের পরামর্শ চুপি চুপি করিলে চলিবে না। যাহাতে দূরস্থ দর্শক শুনিতে পায় এরূপ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিতে হইবে—Rehearsalএ তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবেই। প্রেমিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সখীকে মনোবেদনা জানাইতেছে—অভিনেত্রী তাহা দর্শককে শুনাইবে—দীর্ঘশ্বাস যে পড়িয়াছে তাহা অন্ততঃ নিকটস্থ দর্শক শুনিবে, আর দীর্ঘশ্বাস-জনিত মাংসপেশী সঞ্চালন ত প্রত্যেক দর্শক দেখিবেই। নট নটীর এইরূপ অভ্যাসের সময় নিকটে থাকিলে তাহাদের কার্য্য অস্বাভাবিক বোধ হইবে কিন্তু দর্শকশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া দেখিলে ওরূপ বোধ হয় না। যিনি অভিনয় শিক্ষা দিবেন শিক্ষার্থীকে তাঁহার ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষায় সময় অনেক কৌশলই নিকট হইতে অস্বাভাবিক মনে হইবে কিন্তু ঐ সকল কৌশলই রঙ্গালয়ের উপযোগী। বৈঠকখানার অভিনয় ও রঙ্গালয়ের অভিনয়ে অনেক পার্থক্য। স্বভাব—স্বভাব—স্বভাব বলিয়া যে সমালোচক চীৎকার করেন তিনি Shakspearএর স্বগত উক্তিগুলিকে (Soliloquies) কিরূপ স্বাভাবিক মনে করেন ? কেহ ত কাহাকেও শুনাইয়া মনের কথা বলে না।

আবার শুনাইয়া না বলিলেও হ্যাম্‌লেটের "To be, or not to be—that is the question" ইত্যাদির ন্যায় উচ্চ অংশ সকল Shakspearএর অভিনয় হইতে বাদ পড়িবে। রঙ্গালয়ের অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক যিনি বিচার করিতে চান তাঁহার শিক্ষিত দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত নচেৎ কাগজ কলম পাইয়াই অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

নটের আর একটী লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত তিনি অভিনয় করিতেছেন তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কোনরূপে তাহাকে বাধা প্রদান করিলে নাটকের যে কত ক্ষতি হয় তাহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে পৃথ্বিরাজের ভূমিকা হাস্যরসাত্মক ও যোশীবাইএর অংশ গুরু গম্ভীর। একবার এই নাটকের অভিনয়ে পৃথ্বিরাজের অংশে নট হাস্যরস প্রবল করিবার চেষ্টা করায় যোশীবাইএর অভিনয়ে বিশেষ বাধা ঘটিয়াছিল। এই প্রকার বাধা প্রদানে নট যে কেবল নাটক নষ্ট করেন তাহা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়েরও প্রশংসনীয় পরিচয় নয়। আবার সেই নট যাহাকে দাবাইয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করেন সে যদি তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিনেতা হয় তবে রঙ্গালয়ে তাঁহার এ দোষ অমার্জ্জনীয়। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায় তাহার প্রতি যত্নবান্ হওয়া নটের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

অভিনয়ের প্রতি নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা আবশ্যক। অর্দ্ধেন্দুর এই অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে রঙ্গালয়ে অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার তর্কবিতর্কে এমনই মগ্ন হইতেন যে আহারাদির কথা এক প্রকার ভুলিয়াই যাইতেন। সেস্থলে উপস্থিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কাহারও পলাইবার উপায় থাকিত না। অর্দ্ধেন্দু তাহাদের সকলকে আটক করিয়া অভিনয় বিষয়ক তর্কবিতর্ক শুনাইতেন। অভিনয় সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুর এই আদর্শ অনুরাগ আলোচনা করিয়া অনুরাগ শিখিতে হয়—তাঁহার অভ্যাস দেখিয়া নটের কার্য্য অভ্যাস করিতে হয়। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের প্রয়োজন এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' দেখিয়াছেন তাঁহার স্মরণ হইবে যে আহারান্তে জলপান কালে 'বিদ্যাদিগ্‌গজে'র গলার নলী এরূপভাবে সঞ্চালিত হইতেছে যেন "গজপতি" সত্যই জলপান করিতেছেন। অভিনেতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখুন এ সামান্য কার্য্যও কিরূপ অভ্যাস সাপেক্ষ। বস্তুতঃ অর্দ্ধেন্দু-শেখরের নাট্যজীবন নটের আদর্শ।

অভিনয় সম্বন্ধে এত বলিবার কথা আছে, অভিনয়প্রিয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং বিষয়টী সুধীগণের এতই আলোচনার যোগ্য যে তৎসম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এই এক প্রবন্ধে কিছুই বর্ণিত হয় নাই বলিলেও চলে। এক প্রবন্ধে এই বিশাল বিষয়ের সকল কথা বিবৃত করা অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাধ্য। কারণ রঙ্গভূমি পৃথিবীর ক্ষুদ্র অনুরূপ—সমস্ত পৃথিবী একটী রঙ্গালয় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন যে—তিনি অভিনয়ে যোগদান করিতেন এবং নটের কার্য্য যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে সকলের নিকট সম্মানের নয় তথাপি কালে অভিনয় কার্য্যের গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্ব্বসাধারণে নটের আদর করিবে। সভাপতি মহাশয়ের একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে আদরলাভের পথ পরিষ্কার বর্ত্তমান নটমণ্ডলী—আমাদিগকেই করিতে হইবে। অভিনয় কার্য্যের কেন, কোন কার্য্যেরই আদর প্রথমে হয় না। এই ইংরাজি চিকিৎসা, যাহার ইদানীং এত পূজা, আমরা বালককালে শুনিয়াছি, তাহা "মানুষ খুন্" করা নামে অভিহিত হইত। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে নটের আদর নাই তাহার কারণ সাধারণ যাত্রা পাঁচালীতে ভাঁড়াম ও কুৎসিত রুচি দেখিয়া অনেকে মনে করেন সাধারণ অভিনয়ও ঐ শ্রেণীর। কিন্তু যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে—কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুর সৃষ্টি করিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল সুসজ্জিত করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তব-ভ্রম উৎপাদন করিতেছেন—যদি আমরা দেখাইতে পারি রঙ্গালয় হইতে সর্ব্বপ্রকারে কলাবিদ্যার উন্নতি হইতেছে, যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে অভিনয় বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল—তবে নট সুধীজনসমাজে তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা—তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন। *

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

---

* [১৩১৫ সাল ১২ই আশ্বিন মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর-স্মৃতি সভায় পঠিত প্রবন্ধের কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও কিয়দংশ পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।]

কানপুর। *

(সিপাহী-বিদ্রোহ)

কানপুর ভারতবর্ষের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের একটী বৃহৎ সামরিক ষ্টেশন। ১০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূমিখণ্ড এই ক্যাণ্টনমেণ্টের অধিকারভুক্ত। এতদ্ভিন্ন ইহা একটী বাণিজ্যপ্রধান নগরী। বিবিধ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য ইহার নাম জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কেবলি কি বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য কানপুরের নাম জগদ্বিখ্যাত? যে লোমহর্ষণকারী ভয়ঙ্করী জ্বালাময়ী শোক-স্মৃতি ইহার প্রতি অঙ্গের সূচ্যগ্র পরিমিত স্থান হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতেছে, তাহা কে বিস্মৃত হইবে? যতদিন পৃথিবীতে ইতিহাস থাকিবে ততদিন এই স্থানের দীপ্ত অগ্নিময় জলন্ত কাহিনী রুধিরাক্ষরে মানব হৃদয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত থাকিবে।

পাঠক! বিস্মৃত হইয়াছেন কি? সেই দিন—সেই মহাভয়ঙ্কর চিরস্মরণীয় দুর্দ্দিন—সেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাইয়ের কালরাত্রি—মহারাত্রি! সেই সিপাহী-বিদ্রোহের দাবাগ্নিদীপ্ত মহাঝঞ্ঝা উদ্বেলিত, প্রলয়-বাত্যা-বিঘূর্ণিত দিনের বজ্রবিদগ্ধ স্মৃতি। সেই ঝটিকা-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ শোণিত নদী! সেই রোমহর্ষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের করাল কলঙ্ক কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছেন কি? যে দেহে মনুষ্য রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, যে মস্তিষ্কে সুখ, দুঃখ, সহানুভূতি প্রভৃতি করুণ ভাবের উদ্রেক হইতেছে, যে হৃদয় প্রীতির আধার, সেই মানব-জীবন হইতে কি কখনও এ স্মৃতি বিলুপ্ত হইতে পারে? কখনই নহে!

সিপাহী-বিদ্রোহের রক্তময় জলন্ত স্মৃতি কানপুরের অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সিপাহী-বিদ্রোহ কি সাধারণ ব্যাপার! এই বিদ্রোহের জীবন্ত মহাশোক কাহিনী ইতিহাসের সহস্র সহস্র পৃষ্ঠায় স্যর জন্ কে, কর্ণেল ম্যালেসন, চার্লস বল, ট্রিবিলিয়ান, ফর্ব্বস্ প্রভৃতি মহামনস্বী ঐতিহাসিকগণ বজ্রগম্ভীর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর অনেক বড় বড় সমর কাহিনী ইহার সহিত সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে। এই কাল সমরানলে

---

* হিন্দুস্থান-পর্য্যটন।

ভারতের অনেক মহানগরী অগ্নিময় হইয়াছিল। অসংখ্য সিপাহী, অসংখ্য ইংরাজ সৈনিক, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, ও নরনারী এই প্রচণ্ড অনলে জীবনাহুতি প্রদান করেন। এই ভারতব্যাপী কালাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে ব্রিটিশবাহিনী যে দুর্দ্ধর্ষ মহাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল তাহা ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় সুবর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মধুর প্রকৃতি, উদারপ্রাণ, দয়ার আধার, মহামতি লর্ড ক্যানিং, রণদুর্ম্মদ প্রধানসেনাপতি মহারথ স্যার কলিন ক্যাম্বেল, চিরনির্ভীক স্যার জেমস্ আউটরাম, দুর্দ্ধর্ষ স্যার হেনরী হ্যাভলক, অরিন্দম স্যার চার্লস উইলসন, মহাবল মার্শাল নীল, সাহসী ব্যাঙ্কস্ প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ যে অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীর কণ্টকিত হইয়া থাকে। সে বীরত্ব কাহিনীর বর্ণনা এই ভ্রমণবৃত্তান্তে অসম্ভব। পাঠক, পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলী হইতে পাঠ করিয়া লইবেন।

কানপুর মহা হত্যাকাণ্ডের রঙ্গভূমি। কোনও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, "সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কানপুরে যেমন হত্যাকাণ্ড হয়, এমন হত্যা অদ্যাপি পৃথিবীর কোন স্থানে হয় নাই।" * এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পাঠ করিলে পাষণ্ডেরও চিত্ত বিগলিত হয়, কোন ক্রমেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না। বুক ফাটিয়া যায়। আমি অতি সংক্ষেপে এই হত্যা-উৎসবের কাহিনী নিম্নে বিবৃত করিলাম।

কানপুর হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত বিঠুর নামক স্থানে শেষ পেশওয়া বাজীরাওএর দত্তক পুত্র নানা ধুন্দুপন্থ অর্থাৎ নানাসাহেব বাস করিতেন। ইনিই ঐ অঞ্চলের বিদ্রোহী সিপাহীদলের অধিনায়ক হইয়া কানপুরের ইংরাজ সেনাপতি স্যার হিউ হুইলরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ইতিমধ্যে সেনাপতি হুইলর অনেক ইংরাজ সৈন্য, বালকবালিকা ও স্ত্রীপুরুষ, প্রভৃতি সকলকে সহরের বাহির হইতে আনিয়া দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত করিয়া রাখেন।

সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া প্রথমে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার লুণ্ঠন, জেল ভাঙ্গিয়া বন্দীদিগকে মুক্তিপ্রদান, ও সরকারী আফিস সমূহ অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দেয়। হুইলর দুর্গের চতুর্দ্দিকে ৫ ফিট উচ্চ মৃৎপ্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত করেন। নানাসাহেব উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিয়া তিন সপ্তাহ কাল

* যাঁহারা হত্যাকাণ্ডের বিশদ বৃত্তান্ত জানিতে চাহেন, তাঁহারা Trevelyan's Cawnpore নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন।

কামানের অগ্নিবৃষ্টি করিয়া ইংরাজ প্রতিরোধকারিগণকে অধীর করিয়া তুলিলেন। এই দীর্ঘকাল অমিত বিক্রমে সিপাহীদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ইংরাজ বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। এদিকে দুর্গাভ্যন্তরে রসদও ফুরাইয়া আসিল। সুতরাং তাবৎ সৈন্য ও নরনারীগণ খাদ্যাভাবে মৃতকল্প হইয়া পড়িল; আর তাহাদের প্রবল পরাক্রম নানাসাহেবের গতিরোধ করিবার তাদৃশ সামর্থ্য রহিল না। এদিকে নানাসাহেব দুর্গমধ্যে সংবাদ পাঠাইলেন যে, যদি ইংরাজেরা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে নৌকাযোগে নির্ব্বিঘ্নে এলাহাবাদে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাঁহার কথামত ইংরাজেরা আত্মসমর্পণ করিলেন। এদিকে সতীচৌড়ার ঘাটে তরণী আরোহণ পূর্ব্বক এলাহাবাদে যাইবার জন্য ইংরাজেরা যেমন গঙ্গাবক্ষে ভাসমান হইয়াছেন অমনি নানাসাহেবের আদেশে নৌকারোহীগণের উপর অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। নিঃসহায় আরোহীগণ শত্রুর গুলিতে গঙ্গাবক্ষে প্রাণ হারাইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক তরণী গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। অনেক ইংরাজ নরনারী নৌকা হইতে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া তীরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু সিপাহীদিগের দুরন্ত গুলি তাঁহাদের মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগকে জলগর্ভে সমাহিত করিল। ইংরাজ শোণিতে গঙ্গাজল কিয়ৎকালের নিমিত্ত লালে লাল হইয়া রক্তস্রোতে বহিতে লাগিল। নানাসাহেব প্রায় ২০০ শত জীবিত ইংরাজ নরনারীকে বন্দী করিয়া সবেদাকুটী নামক একটী বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কেবল একখানি নৌকা চারিজন ইংরাজ সেনানীর সহিত নানার হস্ত হইতে কোন প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়া ফতেপুরে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন আর একখানি নৌকাও বাঁচে নাই।

এ দিকে ইংরাজ সেনানীর পরাজয় সংবাদে জেনেরল হ্যাভলক এলাহাবাদ হইতে কানপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়া নগর হইতে ৮ মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া সিপাহীগণের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ১৫ই জুলাই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওদিকে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত রুদ্রমূর্ত্তি নানাধুন্দুপন্থ সেই রাত্রেই পূর্ব্বোক্ত বন্দী ইংরাজ নরনারীর, শিশু বালক বালিকা প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ক্ষিপ্তপ্রায়, উন্মত্ত ও কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত সিপাহীগণ সেই নিরস্ত্র নরনারী ও বালক বালিকাদিগকে অতি নিষ্ঠুর পৈশাচিক ভাবে হত্যা করিতে

লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুকে তাহার পিতামাতার সম্মুখে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া নিম্নে তরবারী পাতিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল! হস্তপদ রজ্জু দ্বারা নিবদ্ধ করিয়া স্বামীকে গৃহ কোণে ঠেলিয়া বক্ষে বংশদণ্ড দিয়া ডলা হইতে লাগিল ও তৎসম্মুখে তাহার পত্নীর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল। অনেক স্ত্রীলোকের নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি ছেদন করিয়া জীবিতাবস্থায় কূপে নিক্ষেপ করিয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় বধ করা হইল। এতদ্ব্যতীত গুলির আঘাতেও অনেককে বধ করা হইল। সেই অসংখ্য শবরাশি নিকটস্থ একটি প্রকাণ্ড কূপমধ্যে ফেলিয়া দিয়া নানাসাহেব স্বদলবলে বিঠুর অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এই হৃদয়-বিদারক শোণিত-শোষক হত্যাকাণ্ডের করাল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কানপুর আজিও শোকে চিরম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। অসংখ্য মানব-কঙ্কাল প্রোথিত মহাশ্মশান নিঃশব্দ হুতাশে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। কালক্ষুধা-লেলিহান হত্যারাক্ষসী বিশ্বরক্তলোলুপ বুভুক্ষার মহানিবৃত্তি করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সেই স্থানে মহাসুপ্তি—চিরসুপ্তি—মহাশান্তি—চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। সেই বিশ্ববিদারী মহাহাহাকারধ্বনি সুদূর অতীতের মহা-অন্ধকারে নীরবে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

বিদ্রোহ দমিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিহতদিগের শোক-স্মৃতি সজীব রাখিবার নিমিত্ত মনোহর উদ্যান রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কূপের উপর একটি বেদীকা নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরে ইতালী হইতে আনীত অতি সুন্দর একটী স্বর্গীয়া দূতীর রমণীয় মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাই কানপুরের বিশেষ দ্রষ্টব্যের অন্তর্ভুক্ত। উদ্যানে কি নীরবতাই বিরাজিত! অসংখ্য উইলো বৃক্ষ ভূতলাবনত মস্তকে শোক জ্ঞাপন করিতেছে। বিবিধ জ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত পুষ্পের সৌরভে উদ্যান পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ইংরাজ সৈনিকের সমাধি উদ্যানমধ্যে সংস্থিত। নানাবিধ সুরম্য পুষ্পবৃক্ষলতা সমাধি পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উদ্যানমধ্যে কোনপ্রকার আমোদপ্রমোদ চিরনিষিদ্ধ। উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ, হাস্য, পরিহাস, রহস্যকৌতুক, শীশ দেওয়া, সঙ্গীত, বাদ্য, দ্রুতপদবিক্ষেপ, অশ্ব ও শকট চালন, কুক্কুর লইয়া ভ্রমণ করিবার নিয়ম নাই। আর এই সমাধি-শ্মশানে আসিয়া মহানিদ্রাসমাচ্ছন্ন নিহতদিগের চিরশান্তি ভঙ্গ করিয়া কোন্ পাষণ্ডেরই বা আমোদআহ্লাদে প্রবৃত্তি হইবে? ভ্রমণকারী মাত্রেই নীরবে, অধোবদনে ও সাশ্রু নয়নে ধীরে এই উদ্যান ভ্রমণ করেন। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড ভারতে আসিয়া যখন

কানপুরে আগমন করেন, তখন তিনি নিঃশব্দপদসঞ্চারে (Dead march) এই উদ্যান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কানপুরে দুইটি রেলওয়ে ষ্টেশন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর সুবৃহৎ পুরাতন ষ্টেশন ও আউদ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গঙ্গার তীরে আর একটী ষ্টেশন। রেলওয়ে সেতু দেখিবার যোগ্য। এই নগরে উল্লেখ-যোগ্য প্রাচীন হর্ম্ম্যাবলী নাই। নগরস্থ সৌধশ্রেণী, বারান্দার কাষ্ঠনির্ম্মিত থাম ও রেলিং দেখিলে আধুনিক সহর বলিয়া অনুমিত হয়। কানপুরের ইংরাজের বাঙ্গালা গুলি দেখিতে বেশ দৃষ্টিরম্য। সিপাহী-বিদ্রোহের স্মারক ধর্ম্মমন্দির (Memorial Church) দেখিতে মন্দ নহে।

কানপুরের গঞ্জ। এখানে বিরাট হাট বসে। বিবিধ পণ্যপূর্ণ অসংখ্য গো-শকট আসিয়া জমাট বাঁধে। তখন পথ চলাচল এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। তুলা, তিসি, ঘৃত, চাউল, দাউল, গম, ছোলা, লবণ, নীল প্রভৃতি স্তূপাকারে ঢালা হইয়া থাকে। কারবারি, ব্যাপারি, খরিদদার ও মহাজনদিগের জনতায় স্থানটী মেলার ন্যায় কোলাহলময় হইয়া উঠে।

মল রোড (Mall Road) এখানকার প্রসিদ্ধ রাস্তা—অতি প্রশস্ত ও উভয়পার্শ্বে তরুশ্রেণী পরিশোভিত। কানপুরে জলের কল ও ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হইয়াছে। কিন্তু রাজপথের ধূলি তেমনিই আছে। শীতগ্রীষ্মের প্রকোপে অধিবাসীবর্গ প্রপীড়িত।

হরিদ্বার হইতে আরম্ভ হইয়া গঙ্গার খাল (Ganges Canal) কানপুরে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ক্রোড়াধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই অপূর্ব্ব পূর্ত্তকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আরও একটী শাখা পঞ্জাবে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

এখানে সাহেব ব্যবসায়ীরা অনেক কলকারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। চর্ম্ম নির্ম্মিত দ্রব্যাদির জন্য কানপুর বিখ্যাত। এখানে চমৎকার জুতা, পোর্ট-ম্যাণ্ট, ব্যাগ, অশ্বের সাজসরঞ্জাম, গেটার, বোতলের আবরণ, প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আরও এখানে নানা প্রকার শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী বস্ত্রাদি ও তাম্বু প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পথিক ও ভ্রমণকারীদিগের সুবিধা ও আরামের নিমিত্ত দুইটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুমাত্রেই আসিয়া থাকিতে পারেন। কোনও ভাড়া দিতে হয় না, আহার্য্য দ্রব্যাদিও অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।

আমি ষ্টেশনের নিকট একটী পান্থশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম। থাকিবার কোন অসুবিধাই হয় নাই। অনেক দিন নিরামিষ আহারের পর অনেকের অনিচ্ছা সত্বেও আমি মাংস ভোজন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখানকার হালুয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহার আস্বাদ লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

কানপুরের ক্ষত্রিয়ানীরা দেখিতে সুন্দরী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইঁহারা রূপে গুণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রত্যূষেই পান্থনিবাসে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি এত বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলাম না, তাহার পর বলিলাম, "তুমি এ সকল কিরূপে জানিলে?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এই লোকটার গত জীবনের দিকে একটু অনুসন্ধান লইয়াছিলাম। প্রথমে মনে একটা প্রশ্নোদয় হইল, লোকটা এরূপ ভাবে এখানে আছে কেন? পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, বাঁকুড়ায় একজন লোকের একটা স্কুল ছিল, সে আর তাহার স্ত্রী অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া এইখানে এক স্কুল খুলিয়াছিল; ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া আরও জানিলাম, নানা কারণে সেই মহাত্মা একদিন স্ত্রী লইয়া বাঁকুড়া হইতে পলায়ন করেন; সে কোথায় পলাইল, তাহা সন্ধান করিয়া করিয়া অবশেষে তাহাকে এই নির্জ্জন মাঠে পাইলাম।"

"কি ভয়ানক লোক—যদি স্ত্রীলোকটা সত্যসত্যই তাহার স্ত্রী হয়! কিন্তু নবদুর্গার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি?"

"তুমি তাহার সহিত কথা কহিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছ, তাহাতেই এ বিষয়টাও কতকটা পরিষ্কার হইয়াছে। প্রেম—ডাক্তার, প্রেম—প্রেম বড় কঠোর সামগ্রী। নবদুর্গা জানে—মুঞ্জরী সদানন্দের ভগিনী?"

"তাহা হইলে সে যখন শুনিবে যে, মুক্তরী তাহার ভগিনী নয় তখন রাগে নবদুর্গা সব কথা বলিয়া দিতে পারে।"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। সেই চালই চালিতে হইবে। ডাক্তার মণিভূষণকে ছাড়িয়া তুমি অনেকক্ষণ রহিয়াছ, নয় কি? তোমার গড়ে সর্ব্বদা থাকাই উচিত।"

এই কথা শুনিয়া আমি তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "আমি এখনই যাইতেছি, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অবশ্যই আমাকে তোমার কিছু গোপন করিবার নাই।"

"নিশ্চয়ই নয়।"

"তবে এ লোকটার উদ্দেশ্য কি?"

গোবিন্দরাম অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "খুন—ডাক্তার, খুন—বৈজ্ঞানিক ভাবে বজ্জাতির চূড়ান্ত উপায়ে খুন। সে যেমন মণিভূষণকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছে, আমিও তেমনই ভাবে তাহাকে নিজের জালে আটকাইতে চেষ্টা করিতেছি; বোধ হয়, দুই তিন দিনেই আমি তাহার লীলাখেলার অবসান করিতে পারিব, তবে এই কয় দিন মণিভূষণকে খুব সাবধানে রাখ—খুব সাবধান—ডাক্তার, খুব সাবধান। আমার মনে হয় এতক্ষণ তাহাকে ছাড়িয়া থাকা তোমার উচিত হয় নাই—(চকিত হইয়া) এ কি—এ কি—কি ব্যাপার!"

সহসা এক ভয়াবহ আর্ত্তনাদে সেই সমগ্র প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইল। কি সে কাতরকণ্ঠ—ভীতিব্যঞ্জক—মর্ম্মভেদী! এরূপ আর্ত্তরব আমি আর কখনও শুনি নাই; তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে, সেই ভয়াবহ শব্দ আরও ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইল, আমি চমকিয়া বলিয়া উঠিলাম, "একি? একি?"

এই শব্দ শুনিয়া গোবিন্দরামও লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "চুপ্—চুপ্—"

প্রথমে আর্ত্তনাদ দূরে বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা স্পষ্ট আমাদের নিকটে বোধ হইল, কে যেন প্রাণভয়ে আকুল আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

গোবিন্দরাম কম্পিত স্বরে বলিলেন, "কোথায়—কোথায় ডাক্তার?"

আমি ঠিক সম্মুখদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "ঐ—ঐ দিকে!"

তিনি বলিলেন, "না—এই দিকে।"

তখন সেই আর্ত্তনাদ আমাদের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেই আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভয়াবহ গর্জ্জনও আমরা শুনিতে পাইলাম—গোবিন্দরাম বলিয়া উঠিলেন, "কুকুর—কুকুর—কি ভয়ানক! হয় ত এত কষ্টেও বেচারাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। ডাক্তার—ডাক্তার! এস—এস—শীঘ্র এস।"

আমরা দুই জনে মাঠের উপর দিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম, তখন আমাদের নিকটেই কোন স্থান হইতে সেই লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। তাহার পর একটা শব্দে বোধ হইল, কে যেন কোথায় পড়িয়া গেল।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার, লোকটা আমাদের হারাইয়াছে, আমরা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "না না—ও কথা বলিও না। কি ভয়ানক!"

"আমি এ কয়দিন নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবার জন্যই আজ এই দুর্ঘটনা ঘটিল, আর তুমিও তাহাকে ছাড়িয়া আসিবার জন্য কি ঘটিল, দেখ। ডাক্তার—সর্ব্বনাশ, তীরে আসিয়া তরী ডুবিল!"

আমরা সেই অন্ধকারে—যেখানে শব্দ হইতে শুনিয়াছিলাম, সেইদিকে ছুটিলাম। চারিদিকেই খাদ ও গর্ত্ত, আমরা কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কিছু দেখিতে পাইতেছ?"

আমি বলিলাম, "কিছু না।"

"শোন, এ আবার কি!"

কে যেন গেঙাইতেছে, অপরিস্ফুট শব্দ, সেইদিকে একটা বড় গর্ত্ত, আমরা উভয়ে গিয়া ব্যগ্র হইয়া সেই গর্ত্তের ভিতর চাহিয়া দেখিলাম, অন্ধকারে সেই গর্ত্তের মধ্যে একজন লোক পড়িয়া আছে। লোকটাম মস্তক বুকের ভিতর গুঁজড়াইয়া গিয়াছে, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোন কারণে সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল, তাহার পর এই প্রকাণ্ড গর্ত্তের ভিতর পড়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে!

গোবিন্দরাম পকেট হইতে দিয়াশলাই জ্বালিলেন, সেই আলোতে আমরা সেই লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিলাম, তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, এবং সেই ক্ষতস্থান হইতে অজস্র শোণিতধারা বহিতেছে, তবে তাহার পর আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গেল, আমরা দেখিলাম, সেই মৃতদেহ রাজা মণিভূষণের।

আমরা দিয়াশলাইয়ের আলোকে একমুহূর্তের জন্য মণিভূষণকে দেখিলাম, কিন্তু মণিভূষণ সর্ব্বদাই যে জামা কাপড় পরিতেন, তাহা আমাদের ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

গোবিন্দরাম ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম, "কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! আমি হয় ত তাঁহাকে না ছাড়িয়া আসিলে এ সর্ব্বনাশ হইত না।"

গোবিন্দরাম বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "ডাক্তার, তোমার চেয়ে আমার দোষ অনেক বেশী। ভাল করিয়া লোকটার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে গিয়া আমি একজনের প্রাণ নষ্ট করিলাম। দুই দিন আগে লোকটাকে গ্রেপ্তার করিলে সে আর আজ এ সর্ব্বনাশ করিতে পারিত না। তবে—তবে—আমি মণিভূষণকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম যে, রাত্রে মাঠে কিছুতেই না বাহির হয়, কেনই বা একা বাহিরে আসিয়াছিল?"

আমি বলিলাম, "কি ভয়ানক আর্ত্তনাদ! নিতান্তই একটা কিছু ভয়াবহ না দেখিলে কেহ এমন আর্ত্তনাদ করে না। কুকুরটা কোথায় গেল? আমরা স্পষ্ট তাহার ডাক শুনিয়াছি—কুকুরটা কোথায়? নিশ্চয়ই এইখানে কোথায় আছে। সদানন্দই বা কোথায়? সে-ও নিশ্চয় এখানে কোথায়ও লুকাইয়া আছে। এখন এস দেখা যাক্, সে যেন আর না পলাইতে পারে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আর পলাইতে পারিবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। রাজা অহিভূষণ ও মণিভূষণ দুই জনেই খুন হইল। অহিভূষণ কুকুর ভূত ভাবিয়া ভয়েই মরিয়া ছিলেন। আর এই বেচারা সেই কুকুরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া মারা গেল। এখন এই সদানন্দটার সঙ্গে কুকুরটার কি সম্পর্ক, তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা আইনানুসারে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারা যাইবে না। আর আমরা কুকুরটা দেখি নাই, কেবল তাহার ডাক শুনিয়াছি মাত্র, কুকুরটা যথার্থ আছে কি না, তাহাও আমরা ঠিক বলিতে পারি না। সুতরাং ইহাতে এই মাত্র প্রমাণ হইবে যে, মণিভূষণ গর্ত্তে পড়িয়া মারা গিয়াছেন। সদানন্দ যতই দুর্ব্বৃত্ত হউক, আমি তাহাকে আমার জালে টানিয়া তুলিবই তুলিব।

তখন আমরা দুই জনে কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া সেই নির্জ্জন মাঠে, এই ভয়াবহ মৃতদেহের নিকটে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষণপরে আকাশে চাঁদ উঠিল, আমরা দুই জনে সেই উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া সেই বিস্তৃত উপলবন্ধুর তরঙ্গায়িত তৃণলেশহীন প্রান্তরের চারিদিকে চাহিলাম—সর্ব্বত্র শূন্যতা—সর্ব্বত্র নির্জ্জনতা—সর্ব্বত্র জ্যোৎস্নালোক ধূ ধূ করিতেছে। যতদূর দেখা যায়,—কোন দিকে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল দূরে—অতি দূরে, একটী ক্ষুদ্র আলোক মাত্র দেখা যাইতেছিল। আমি বুঝিলাম, সেই আলোটা সদানন্দের বাড়ী হইতে দেখা যাইতেছে।

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, আমি বলিলাম, "এই পাষণ্ডকে কেন এখনই ধরিতেছ না।"

গোবিন্দরাম চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "ইহার বিরুদ্ধে সন্দেহ ভিন্ন আমরা এখনও কোন প্রমাণ পাই নাই। লোকটা খুব চালাক ও বুদ্ধিমান্, আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সে দণ্ড পাইবে না; আমরা তাহার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ করিতে পারিব, তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। যদি আমরা সামান্য ভুল করি, তাহা হইলে এই দুর্ব্বৃত্ত আমাদের হাত হইতে পলাইবে।"

"তাহা হইলে আমাদের এখন কি করা উচিত?"

"কাল যথেষ্ট কাজ আছে, আজ উপস্থিত আমাদের এই নূতন বন্ধুর দেহ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করা উচিত।"

তখন আমরা দুই জনে সেই গর্ত্তের মধ্যে অতি সাবধানে ও কষ্টে নামিলাম, তলদেশ প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ, এই স্থানে পড়িলে কাহারও রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

আমরা নিম্নে আসিয়া দেহটাকে সেই অবস্থায় দেখিলাম, যাঁহার সহিত আজ সকালেও কথা কহিয়াছি, তাঁহার এরূপ ভয়াবহ মৃত্যুতে আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল।

আমি বলিলাম, "আমাদের লোক ডাকা উচিত, আমরা দুই জনে ইহাকে কিরূপে গড়ে লইয়া যাইব—একি, তুমি কি ক্ষেপিলে?"

আশ্চর্য্য! এই দুঃসময়ে সহসা গোবিন্দরামকে পাগলের মত হাস্যনৃত্যপরায়ণ দেখিলাম। এই কি সেই মহা গম্ভীর গোবিন্দরাম! ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে অবাঙ্মুখে চাহিয়া রহিলাম।

গোবিন্দরাম বলিয়া উঠিলেন, "দাড়ী—দাড়ী—লোকটার দাড়ী আছে।"

আমিও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "দাড়ী—দাড়ী?"

"না—না—এ রাজা মণিভূষণ নয়, এ যে দেখিতেছি আমাদের হারু ডাকাত।"

আমি সত্বর দেহটা উল্টাইয়া ফেলিলাম, তখন জ্যোৎস্নার আভায় তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম,—হাঁ, এ মণিভূষণ নহে, এক দিন এ মুখ দেখিয়াছিলাম, এ সেই হারু ডাকাত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহার পরিধানে মণিভূষণের জামা কাপড় কোথা হইতে আসিল?

পর মুহূর্ত্তেই আমার স্মরণ হইল যে, মণিভূষণ তাঁহার কাপড় জামা জুতা অনুপকে রাখিতে দিয়াছিলেন, সে নিশ্চয়ই সেগুলি তাহার শ্যালককে কোন সুযোগে পৌছাইয়া দিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, ইহাতে তাহার পলাইবার সুবিধা হইবে, কিন্তু সেইগুলিই হতভাগ্য হারুর পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইল, যাহা হউক, এই দুর্দ্দান্ত লোক বাঁচিয়া থাকিলেও কোন না কোন দিন ফাঁসী কাষ্ঠে লম্বিত হইত, কাজেই তাহার মৃত্যুতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই, মণিভূষণের যে মৃত্যু হয় নাই, ইহাতেই আমার সমগ্র হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ব্যাপার কি হইয়াছে, আমি গোবিন্দরামকে বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কেবল এই কাপড় আর জামা হতভাগার কাল হইয়াছে। যাহাতে কুকুরটা ঘ্রাণের সাহায্যে মণিভূষণকে আক্রমণ করিতে পারে, সেজন্য তাঁহার কাপড় জামা জুতা কেহ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল, এবং তাহাই কলিকাতায় তাঁহার একখানা জুতা হারাইয়াছিল—তবে একটা কথা এই, হারু ডাকাতের মত লোক কেমনে জানিল যে, তাহাকে কুকুরে তাড়া করিয়াছে!"

"নিশ্চয়ই সে কুকুরটার ডাক শুনিয়াছিল।"

"কেবল ডাক শুনিয়াই যে তাহার মত লোক ভয়ে আর্ত্তনাদ করিবে, তাহা বোধ হয় না। তাহার চীৎকারে বোধ হয়, সে অনেক দূর হইতে কুকুরটার ভয়ে চেঁচাইতে চেঁচাইতে পলাইয়া আসিতেছিল; কিন্তু কথা হইতেছে, অন্ধকারে এ তিপান্তর মাঠে সে কুকুরটাকে দেখিল কিরূপে?"

"আমার মনে হয়——"

গোবিন্দরাম বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার উপস্থিত কিছুই মনে হয় না।"

আমি বলিলাম, "কেন কুকুরটা আজ রাত্রেই মাঠে বাহির হইল। নিশ্চয়ই রোজ সে এই মাঠে আসে না। তাহাতেই বোধ হয়, সদানন্দ কুকুরটাকে কোনখানে লুকাইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সময় মত ছাড়িয়া দেয়। সে নিশ্চয়ই জানিত যে, আজ কোন কারণে মণিভূষণ মাঠে বাহির হইবেন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ইহার উত্তর শীঘ্রই পাইব, কিন্তু আমি যাহা জানিতে চাই, তাহা হয় ত চিরকাল রহস্যই রহিয়া যাইবে। এখন কথা হইতেছে, এই লোকটার দেহ লইয়া কি করা উচিত। কুকুর শেয়ালের আহারের জন্য অবশ্যই ইহাকে এখানে রাখিয়া যাওয়া উচিত নহে।"

"তোমার সেই গহ্বরের ভিতর ইহাকে রাখিয়া যাই, বোধ হয় আমরা দুই জনে ইহাকে সে পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিব। তাহার পর গিয়া পুলিশে খবর পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

"সেই ভাল কথা। আমরা দুই জনে ইহাকে সে পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিব; তবে ইহাকে এ গর্ত্ত হইতে তুলিতে হইলে দড়ী বাঁধিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে; কিন্তু এখন এখানে দড়ী দুর্লভ, দাও ডাক্তার, তোমার উড়ানীখানা দাও।"

তখন গোবিন্দরাম আমার উত্তরীয়খানি লইয়া পাকাইয়া দড়ীর মত করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে দূরে সম্মুখের দিকে চাহিয়া গোবিন্দরাম মহা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন; "একি—কি দুঃসাহস! লোকটা স্বয়ং এইদিকে আসিতেছে, খুব সাবধান, যেন কোন রকমে জানিতে না পারে যে, আমরা তাহাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিয়াছি।"

আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়া অতি গম্ভীর পাদবিক্ষেপে সদানন্দ—আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেইদিকে আসিতেছে। এরূপ দুঃসাহসিক লোক আমি আর কখনও দেখি নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

আর্ত্ত।

অন্ধ যথা, খর জ্ঞানে,
অনুভবে—অনুমানে
গন্তব্য আপন ;
নাহি সে অন্তর-দৃষ্টি,
বুঝি না তোমার সৃষ্টি—
জীবন মরণ !

অধর-কম্পন যথা
হেরি, বুঝে লয় কথা
বধির যে জন ;
কেন সুখ-দুখ-সাধ
তোমার ইঙ্গিত, নাথ,
নাহি বুঝে মন !

আঘ্রাণি সহজ-জ্ঞানে
পশু ভাল-মন্দ জানে ;
বুদ্ধি ল'য়ে নর—
প্রতি চিন্তা—প্রতি কর্ম্মে
কি পরীক্ষা ধর্ম্মাধর্ম্মে
সহে নিরন্তর !

শত আশা তারা নিয়া
মূক পুত্র আকুলিয়া
কাঁদে উত্তরায় !
তুমি পিতা, স্নেহে দুখে
আদরে না নিলে বুকে—
কি তার উপায় !

দেছ কি চঞ্চল মর্ম্ম,
কি ক্ষুধার্ত্ত অস্থি চর্ম্ম—
সহস্র তাড়না !
এত নিগ্রহের মাঝে
ভুলিতেছি তব কাজে—
কর হে মার্জ্জনা।

ফিরে লও তব দান,—
এই দেহ মনঃ প্রাণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত অতি।
ফিরে লও ভুল, ভ্রম,
পাপ, তাপ, বৃথাশ্রম—
দাও অব্যাহতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

শব্দ-বিভ্রাট।

(১)

বাল্যকালের বন্ধুত্বের বন্ধনটা আরও দৃঢ় করিবার জন্য সেন সাহেব আপনার দুইটি স্নেহের কন্যা রুণু ও ঝুনুকে বসু সাহেবের নলিন ও পুলিন নামক পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই দুই পরিবারের যত বন্ধুবান্ধব,

আত্মীয় স্বজন ছিল, সকলেই এরূপ বিবাহের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চাশা পোষণ করিল এবং উক্ত ভদ্রলোক বা সাহেবদ্বয়ের বুদ্ধির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিল। কুল, শীল, মান, মর্য্যাদা সকল বিষয়েই দুইটি পরিবার কলিকাতার বিলাত ফেরত বাঙ্গালী সাহেব সমাজে সমভাবে সম্মানিত হইত এবং আপনাদের শিক্ষা, বিনয়, সৌন্দর্য্য ও অমায়িকতায় মিস্ রুণু ওরফে হেমলতা সেন ও মিস্ ঝুনু ওরফে কনকলতা সেন ঐ সমাজে সকলের প্রিয়া ছিলেন। মিস্ রুণু সেন উচ্চশিক্ষিতা এবং কলাবিদ্যায় সমবয়স্কা (অর্থাৎ পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসর অবধি বয়ঃক্রমের) অনেক মিসবাবার হৃদয়ে ঈর্ষাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন। মিস্ ঝুনু সেন তাদৃশ উচ্চশিক্ষিতা না হইলেও কবিতা রচনা সম্বন্ধে বিলাত প্রত্যাগত অর্থবান সমাজে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী ছিলেন বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। মিঃ নলিন বসু দুইবার কঠোর মাথামুণ্ডহীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেও বিলাতে তিন বৎসর বাস করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া অত্যন্ত কৃতবিদ্য ও বিদ্বান হইয়া আসিয়াছিলেন এবং মিঃ পুলিন বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পাশ করিয়া বিলাত হইতে আবার বি, এ পাশ করিয়া প্রফেসার হইয়া আসিয়াছিলেন। বাল্যসখা ডাক্তার সেন সাহেব ও মিঃ বসু সাহেব, গুপ্ত সাহেব, রায় সাহেব প্রভৃতি কতকগুলি সাহেববৃন্দের সহিত চুরুট টানিতে টানিতে বসিয়া আপনাদের পুত্র ও কন্যাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে বসিলেন। পুলিন প্রকৃত বিদ্বান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সুতরাং তাহার সহিত ঝুনুর বিবাহের স্থির হইল, কারণ ঝুনু মোটে এণ্ট্রান্স পাশ করিতে পারে নাই। আর রুণু বি, এ অবধি পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার সহিত নলিনের বিবাহ হইবে তাঁহারা এইরূপ স্থির করিলেন। মোটের উপর প্রত্যেক দম্পতিটির মধ্যে বিদ্যার মাত্রাটা সমান রাখাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং যখন সমস্ত কথা স্থির হইয়া গেল, তখন গুপ্ত সাহেব—অবশ্য ভাবী দম্পতিদিগের স্বাস্থ্য একটু অধিক মাত্রায় পান করিয়া—বলিলেন—Hurrah ! আজ আমাদের decisionটা বড় ঠিক্ হ'য়েছে, কারণ মহাকবি টেনিসন বলিয়াছেন—

"Seeing either sex alone
Is half itself, and in true marriage lies
Nor equal, nor unequal ; each fulfils
Defect in each, and always thought in thought,

Purpose in purpose, will in will, they grow,
The single pure and perfect animal,
The two-cell'd heart beating, with one full stroke
Life."

(২)

প্রকৃত সুখকর সময়াপেক্ষা সুখকর সময়ের প্রতীক্ষা রমণীয়। শারদীয়া পূজার তিন দিন অপেক্ষা সেই তিন দিনের জন্য প্রস্তুত হইবার সময়টা সেই তিন দি'নর প্রতীক্ষাটা বালক বালিকাদিগের পক্ষে বড় উত্তেজক। বিবাহতো একদণ্ডে সমাধা হইয়া যায় কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বের অবস্থাটা বড় মধুর। সুতরাং যে সমাজে ভাবী দম্পতী একত্র মিলিত হইতে পায়, আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সহচর সহচরীকে অধ্যয়ন করে, পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ে আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিবার যত্ন করে, সে সমাজে ঐ কোর্টসিপের অবস্থাটা কিরূপ সুখকর ও উত্তেজক তাহা এমন কি কুসংস্কারগ্রস্ত পাঠক পাঠিকাও বুঝিতে পারেন।

ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। গৃহ হইতে বাহির হইবার উপায় নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রেমিক প্রেমিকার মনতো আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। সুতরাং যুবক পুলিন ছট্‌ফট্ করিয়া শেষে টেলিফোনের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। সেন সাহেবের বাটির টেলিফোনের সহিত আপনার টেলিফোন যোগ করিয়া দিয়া ঘণ্টা বাজাইল। ঘণ্টার প্রতিশব্দ আসিল। চোঙ্‌টা কানে দিয়া পুলিন বলিল—কে ?

তাহার কর্ণে শব্দ আসিল—রুণু।

অধীর পুলিনচন্দ্র বিরক্ত হইয়া চোঙ্‌টা নামাইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। ওদিকে বাস্তবিকই তাহার ভাবী স্ত্রী ঝুমু টেলিফোন গৃহে আসিয়াছিল। সে মৃদু-স্বরে তাহার নিজেরই নাম বলিয়াছিল। কিন্তু পুলিন ভুল বুঝিয়াছিল। অভিমানিনী ঝুমু তাহা বুঝিতে পারিল না। সুতরাং তাহার নিজের নামে যখন বিরক্ত হইয়া পুলিন উত্তর দিল না তখন সে বড় মর্ম্মপীড়িতা হইল। আবার পরক্ষণে আপনাকে তিরস্কার করিয়া সে মনে করিল বোধ হয় টেলিফোনে অপর কেহ আসিয়াছে। সুতরাং সে আবার বাজাইল। বিরক্ত পুলিন উঠিয়া বলিল—কি ?

"আপনি কে ?"

"পুলিন বসু।"

অভিমানে যুবতীর হৃদয় ভরিয়া গেল। সে ভাবিল তবে তো তাহার

সন্দেহ অমূলক নহে। বাস্তবিক সে পাশকরা নহে বলিয়া পুলিন তাহাকে উপেক্ষা করে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার অপর সন্দেহটা কি সত্য? সে কথা ভাবিতেও যুবতীর গণ্ডদ্বয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। সে ভাবিল পরীক্ষা করিতে দোষ কি? সুতরাং পুলিন যখন আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?" তখন সে বলিল—"ঝুনু।"

প্রেমিক পুলিন কিন্তু এবার কণ্ঠ স্বরটা এক প্রকার বুঝিল, সুতরাং সে শুনিল—ঝুনু।

আনন্দিত মনে যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"আর কেহ ঘরে আছে?"

"না।"

পুলিন হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—আঃ! প্রিয়তমে তোমার নিভৃতে—

যুবতী আর শুনিতে পারিল না। তাহার হাত কাঁপিতেছিল, সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইতেছিল। ছিঃ! ছিঃ! কি অপমান, কি ঘৃণা! পৃথিবীটা কি জঘন্য স্থান!

আবার পরক্ষণেই ঝুনুর সন্দেহ হইল। সে ভাবিল না, তাহা কি হইতে পারে। শুনিতে ভুল করিয়াছি। সুতরাং সে বলিল—"কি বলিলে?"

তাহার এত বড় আবেগময়ী বক্তৃতাটা নিষ্ফল হইল দেখিয়া মিঃ পুলিন বসু মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া একেবারে টেলিফোনের বাক্সের নিকট মুখ লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিল—"প্রি-য়-ত-মে-ডার-লিং ঝুনু ক-দ-র্য্য—" যুবতী আর শুনিতে পারিল না। সে টেলিফোনের চোঙ ছাড়িয়া দিয়া গৃহের কোণে বসিয়া চোখে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুলিন বিদ্বান, পুলিন বুদ্ধিমান্, পুলিন সুন্দর, যুবতী তাহাই জানিত। সে যে এত নীচ, এত ইতর নিষ্ঠুর পাষণ্ড তাহা সে জানিত না। ভগিনীর উদ্দেশে প্রিয়তমে ডারলিং প্রভৃতি বলিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া সে আবার তাহাকে গালি দিয়া বলিল ঝুনু কদর্য্য। উঃ! কি ভয়ঙ্কর!

তাহার প্রেমময়ী মিস্ কনকলতা সেন যে টেলিফোনের নল হইতে কর্ণ অপসারিত করিয়াছে তাহা জানিতে না পারিয়া পুলিন বলিতে লাগিল—"প্রিয়তমে ডারলিং ঝুনু কদর্য্য; বৃষ্টির জ্বালায় তোমার মন্দিরে গিয়ে একবার তোমার মুখখানা দেখিয়া আসিতে পারিলাম না, এটা কি কম ক্ষোভের কথা, ক্ষমা কর। কাল নিশ্চয় যাবো।"

পুলিন স্থির হইল। এবারেও কোন উত্তর আসিল না। যুবক ভাবিল

বোধ হয় লজ্জায় প্রণয়িনী উত্তর দিতে পারিতেছে না। ভাষাটা বড়ই উন্মাদক হইয়াছে। অবশ্য নিকটে থাকিলে সে এরূপ নাটকীয় ভাষায় কখনই কথা কহিতে পারিত না। তবে টেলিফোন বা পত্রের কথা স্বতন্ত্র। ইতিমধ্যে অভিমানিনী নিমেষে মনে মনে পণ করিল যে, এই নারকীয় ব্যবহারটা কতদূর অবধি পৌঁছাইতে পারে তাহা একবার দেখিতেই হইবে। সুতরাং সে ধীরে ধীরে উঠিয়া টেলিফোনে গিয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

উত্তর আসিল—"এত কথার উত্তর সামান্য একটা হ্যাঁ। তুমি বড় ছলনাময়ী। তোমার বাবা কি বাটী এসেছেন ? প্রিয়তমে, রুণু কি—

এবার যুবতী স্পষ্ট শুনিল "প্রিয়তমে রুণু" সে নলটা ছাড়িয়া একেবারে নিজের শয়ন গৃহে গিয়া শয়ন করিল।

নলিন বলিতে লাগিল—রুণু কি জানে না যে দাদা আজ কলিকাতায় নাই ?

পুলিন স্থির হইল। কোনও শব্দ নাই। পুলিন বলিল—"ঝুনু, প্রিয়তমে—" আবার যুবক সেই পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধতা উপভোগ করিল। তখন সে বাজাইল।

ঠিক সেই সময়—সেই স্থলে উড়িয়া খানসামা শ্রীধর আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে সময়ে টেলিফোনকারীর নাম লইয়া প্রভুকে সংবাদ দিত। সুতরাং সে বাজাইল। পুলিন বলিল—প্রিয়তমে—

শ্রীধর—হুঁ।

প্রেমান্ধ পুলিনের কর্ণে স্বরটা কেমন কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হইল। সুতরাং সে আবেগ ভরে বলিল—প্রিয়তমে।

শ্রীধর ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল—পিয় বাবু। কৌঠিপরা ?

পুলিনের চমক ভাঙ্গিল। সে বুঝিল একটা বেয়ারা টেলিফোনে আসিয়াছে, প্রিয়তমে সরিয়া গিয়াছেন। ঝুনুর অভিমানের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া যুবক ক্ষুণ্ণ হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

(৩)

ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। তখনও মানসিক সংগ্রাম চলিতেছিল। কনকলতা সারাদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া এক প্রকার স্থির করিল যে, কথাটার একটা স্পষ্ট মীমাংসা হইয়া যাওয়া ভাল। সে দেখিতে চাহিল যে পুলিন তাহার অযথা ব্যবহারের জন্য কিরূপ মিথ্যা কথা কহিয়া দোষমুক্ত হইতে চাহে। কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে বলিতেছিল যে, ওরূপ কপটাচারীর মুখ দর্শন

করিও না। ঠিক সেই সময় গাড়িবারান্দায় গাড়ী আসিল। যুবতীর বক্ষস্থল সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। অনিচ্ছাসত্বেও কম্পিত কলেবরে গবাক্ষের নিকট গিয়া কনক দেখিল তাহার মাতার গাড়ী। তাহার হৃদ্‌কম্পটা থামিল। সে শেষ সিদ্ধান্ত করিল যে তাহার মাতার সহিত বায়ু সেবন করিতে বাহির হইবে, পুলিনের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

গাড়ীর নিকট তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া মিসেস সেন বলিলেন—কি ঝুমু, মাথা ধরাটা সেরেছে ?

কন্যা অত্যন্ত আব্দারের সুরে বলিল—না, মা, আমি আপনার সঙ্গে হাওয়া খেতে যাব। আজ শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে।

জননী অতি সস্নেহে কন্যার স্কন্ধের উপর হস্ত রক্ষা করিয়া বলিল—সে কি মা, কাল পুলিন আসেন নি, তুমি বাড়ী থাকো। সে এলে সুকুমারকে নিয়ে তার সঙ্গে হাওয়া খেতে যেও।

মিস্ কনকলতা সেন সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গাড়ীতে বসিলেন। অবশ্য তাহার জননীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ভাবী জামাতার সহিত কন্যার একটু কলহ হইয়াছে। নিজের প্রথম যৌবনের স্মৃতিটা তাঁহার মানস চক্ষের সম্মুখে তাঁহার অতীত জীবনের একটা মধুর চিত্র আনয়ন করিয়া সেন ঘরণীকে একটু হাসাইল। তিনি কিছু না বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

যুবতীর চক্ষের উপর দিয়া কত চিত্র চলিয়া গেল, কত বিলাস, কত সৌন্দর্য্য, কত জাঁকজমক ইদন উদ্যান সন্নিকটস্থ ভাগীরথী তীরে যুবতীর চতুর্দ্দিকে তুরঙ্গম সাহায্যে, মোটর গাড়ীতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বরং কনকলতার হৃদয়ে বিষাদময় ভাবটা বৃদ্ধি পাইল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযোগের উপায় বড় বড় অর্ণবপোত গুলা গঙ্গাবক্ষে দাঁড়াইয়া ভারতীয় সুন্দরীকে দেখিতে লাগিল কিন্তু রূপবতী কনকলতা আজ সে দিকে দৃকপাত করিল না। ইদন-উদ্যানের সঙ্গীতসুধা চিরকালই ঝুমুর পক্ষে আনন্দদায়ক, আজ কিন্তু সে সঙ্গীত যুবতীর চিত্তাকর্ষণ করিল না। সে সমস্ত পথ নিস্তব্ধে মাতার পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

বাটী ফিরিয়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়াই কনকলতা ছোট ভ্রাতা সুকুমারকে ডাকিল।

সুকুমার বলিল—কি বল্‌ছ ছোট দিদিমনি ?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঝুমু বলিল—হ্যাঁরে কেহ এসেছিলেন ?

সুকুমার বলিল—হ্যাঁ, মিঃ পুলিন বসু এসেছিলেন। বড় দিদিমনি কত গান গাহিলেন, পুলিন বাবু বলিলেন, দিদিমনির মত গান কেহ করিতে পারে না।

কনকলতা হস্তে একখানা পুস্তক তুলিয়া লইয়াছিল। তাহার হস্ত স্পন্দিত হইতেছিল। সে অন্যমনে বলিল—কে এসেছিল?

ভ্রাতা দিদিমনির হাত ধরিয়া উচ্চ কণ্ঠে স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিল—পুলিন বসু পুলিন বসু।

কনকের বুঝিতে বাকি রহিল না। শয্যায় পড়িয়া সে আর্ত্তের মত কাঁদিতে লাগিল।

(৪)

টুং টুং টুং টুং। সুকুমার ছুটিয়া টেলিফোনে গেল। সে বলিল—কে?

উত্তর আসিল—বলব্ না। তুমি কে?

"আমি সুকুমার।"

"তোমার বড় দিদিকে ডেকে দাও।"

সুকুমার যাহোক একটা কিছু বুঝিয়া বড় দিদিমনিকে ডাকিতে গেল। হেমলতা টেলিফোনে আসিলে নলিন বলিল—কে?

"আমি মানুষ।"

"আমি দেবতা।"

হেমলতা বুঝিয়াছিল যে টেলিফোনের অপর পার্শ্বে তাহার ভাবী স্বামী। সে বলিল—"উপ নয়।"

আবার শব্দ আসিল—বল না কে?

হেমলতা বলিল—কা'কে ডেকেছিলে?

"হেমলতাকে, রুণুকে।"

"হাজির। তুমি কে?"

"পুলিন।" হেমলতা ভুল করিয়া শুনিল—"নলিন।" সে বলিল—"তবু ভাল। আমি ভয় করিয়াছিলাম কোন্ এক পাগলের হাতে পড়লাম।"

নলিনের গণ্ডস্থল লাল হইল। এ কি! তবেতো তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্রি নাই বলিয়া তাহার ভাবী সহধর্ম্মিণী তাহার ভ্রাতাকে অধিক সম্মান করে। ওঃ নারী চরিত্র কি ভীষণ!

দুই একটা এ কথা সে কথা কহিয়া রুণু যখন দেখিল নলিনের কথাগুলি যেন কেমন একটু বিসদৃশ বোধ হইতেছে তখন সে কথা উল্টাইবার জন্য জিজ্ঞাসা

করিল—"ভাই কোথা?" তাহার নিজের সম্বন্ধে ঐরূপ প্রশ্ন হইল বুঝিয়া মনের ভাব লুক্কায়িত করিতে না পারিয়া একটু রূঢ় স্বরে উত্তেজিতভাবে নলিন বলিল—"ভয় নাই, বাড়ীতে নেই।"

হেমলতা উত্তরটা বুঝিতে না পারিয়া, বলিল—"ভয় আবার কিসের? আমি কারেও ভয় করি না।"

বিরক্ত হইয়া টেলিফোনের নল ছাড়িয়া নলিন আপনার গৃহে গিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইংরাজিতে শপথ করিতে করিতে একটু বিলাতী সুধা পান করিয়া মনের জ্বালা নিভাইবার চেষ্টা করিলেন।

(৫)

বিবাহের আর মাত্র তিন সপ্তাহ অবশিষ্ট ছিল। আপনার কন্যাদের সহিত ভাবী জামাতাদিগের প্রণয় দিন দিন বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পাইতে দেখিয়া মিসেস সেন বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া প্রথমতঃ মিঃ সেন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু যখন এক সপ্তাহের মধ্যে নলিন বা পুলিনকে এক দিনের জন্যও নিজ বাটীতে দেখিতে পাইলেন না তখন তিনি স্বয়ং একটু চিন্তিত হইলেন। তাঁহার স্নেহের কন্যাদ্বয়ের শরদেন্দুনিভানন দিন দিন বিষাদমগ্ন দেখিয়া তিনি কেমন একটু অসুস্থ হইলেন। সুতরাং তিনি রবিবার দ্বিপ্রহরে সপরিবারে মিঃ বসুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

বসু সাহেব ও তদীয় ভার্য্যা পুত্রদ্বয়ের ভাব লক্ষ্য করেন নাই এমন নহে। সুতরাং সেন পরিবারের কথা শুনিয়া বসু পরিবারও আপনাদের উদ্বিগ্নতার পরিচয় দিলেন।

সেন গৃহিণী বলিলেন—আর একটা বিশেষ ভাব আমি লক্ষ্য করিয়াছি। দুইটী মেয়েরই অবস্থা সমান কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির একেবারে অভাব। দু'জনে কথা নাই বলিলে হয়। আর রুণুর উপর ঝুনুর বিদ্বেষটা যেন একটু বেশী।

মিসেস বসু বলিলেন—হ্যাঁ আমরাও পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ একটা বিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করেছি। তবে এদের মধ্যে বড়টির একটু ছোটটির উপর রাগ বেশী।

বিষয়টা বড় গুরুতর। অথচ পিতা মাতার দ্বারা এরূপ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। নানারূপ সুযুক্তি, কুযুক্তি, অযুক্তিকর কথার আন্দোলন করিয়া শেষে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যুবক রায় সাহেবের দ্বারা তাঁহারা পুত্র কন্যার মনোভাব জানিবেন। বিজ্ঞান রায় নলিন ও পুলিন উভয়ের

বন্ধু এবং তাহার পত্নী ক্ষণপ্রভা রায় রুণু ও ঝুনুর বাল্য সহচরী ছিলেন। সুতরাং এ গুরুভার ঐ যুবক দম্পতীর হস্তে ন্যস্ত হইল।

(৬)

নলিন বলিল—আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

বিজ্ঞান রায় বলিল—বল কি ?

কথাটায় সে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সহসা বন্ধুর ধারণার বিরুদ্ধেও সে মত প্রকাশ করিতে পারিল না অথচ নলিনের ধারণাটা যে নির্ভুল নয় তাহা সে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইল না।

নলিন বলিল—ভাই কি বল্‌ব, আমার প্রথমাবধিই কেমন একটু সন্দেহ হ'য়েছিল, কিন্তু যখন নিজের কানে শুন্‌লাম তখন আর কি করিয়া অবিশ্বাস করি।

স্বকর্ণে শুনাটা কিরূপ তাহা জানিবার জন্য মিঃ বিজ্ঞানচন্দ্র বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। সুতরাং তাহার নিকট নলিনচন্দ্রকে টেলিফোন সংক্রান্ত সকল কথা বলিতে হইল।

রাত্রে আহারান্তে সজ্জিত কক্ষে কৌচের উপর বসিয়া রায় দম্পতী কথোপকথন করিতেছিলেন।

ক্ষণপ্রভা বলিল—সে যে কথা বলিল তাহা মুখে আনিবার সাধ্য নাই। নয় ঝুনু পাগল হ'য়েছে আর না হয়তো একটা কিছু ভুল হ'য়েছে।

বিজ্ঞান বলিল—আমি ঠিক ঐরূপ একটা পাগলামীর কথা নলিনের মুখে শুন্‌লাম।

তাহারা পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ তদন্তের ফল বিবৃত করিল। উহাদের উদ্দেশে কতকটা হাসিয়া বিজ্ঞান বলিল—দেখ, এ থেকে একটা বিবাহ ঠিক হ'য়েছে। যদি ওদের কথা সত্য হয় তাহ'লে রুণু ও পুলিনের মধ্যে একটা প্রেম হ'য়েছে। ওদের দু'জনকে বিয়ে দিয়ে দাও আর নলিন ও ঝুনু ইচ্ছা করে তো পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে সুখী হ'ক। তাহ'লে মোটের মাথায় বিবাহের বন্দোবস্তটা ঠিক থাকবে, কেবল পাত্র পাত্রীর একটু বদল হ'বে মাত্র।

(৭)

ভাবী দম্পতিদ্বয়ের অভিমানের প্রকৃত কারণটা বুঝিতে পারিয়া বন্ধুদিগের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য রায় দম্পতি একটা বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদিন বিজ্ঞান টেলিফোন সাহায্যে নলিনকে এবং ক্ষণপ্রভা

ঝুনুকে সান্ধ্য ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিল। নলিন আসিলে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিজ্ঞান বলিল—তোমার ভায়ার একবার রকমটা দেখিলে ?

নলিন ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কেন ?

বিজ্ঞান—এই দেখনা ভাই তুমি নিজের ইচ্ছায় বেড়াতে এলে আর তারে নিমন্ত্রণ করে, অপেক্ষা ক'রে রহেছি, দেখা নাই।

নলিন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—কবে নিমন্ত্রণ করেছিলে ?

"কেন ? কাল বিকেলে। তবে টেলিফোনে ব'লেছিলাম। সে বলিল—"All right, thank you."

ঐ কথাগুলি নলিন স্বয়ং বলিয়াছিল—সুতরাং সে বুঝিল যে টেলিফোনের শব্দে নামের একটা গোল হইয়াছে। সে লজ্জায় কিছু না বলিতে পারিয়া উঠিল, তাহার মনে মনে একটা সন্দেহ হইল যে টেলিফোনের শব্দের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা বৈধ নহে। সে গৃহে গিয়া পুলিনকে পাঠাইয়া দিল। অথচ লজ্জায় গৃহে গিয়া ভোজনও করিতে পারিল না। জঠরানল ও অভিমানানল একত্র মিলিত হইয়া তাহার দেহমন ঝলসিতে লাগিল।

বন্ধুত্বের মাত্রাটা যতই অধিক হউক পুলিন সম্বন্ধে মিঃ বি রায় যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা তাহার নিকট একেবারে প্রকাশ করিতে পারা যায় না তাহা বিজ্ঞানচন্দ্র যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অতি ধীর ভাবে অল্প অল্প করিয়া এ কথার অবতারণা করিতেছিলেন।

বিজ্ঞান বলিল—দেখ আমার বিশ্বাস স্বামী ও স্ত্রীর অবস্থা একই প্রকারের হওয়া উচিত অর্থাৎ শিক্ষিতা স্ত্রীর শিক্ষিত স্বামী এবং অর্দ্ধ শিক্ষিতা স্ত্রীর অর্দ্ধ শিক্ষিত স্বামী।

পুলিন বলিল—বিজ্ঞান মাপ কর, দুনিয়ায় আর কি কথা নেই।

বিজ্ঞান বলিল—কেন কথাটা কি কিছু মন্দ। তোমারও বোধ হয় ঐ মত।

পুলিন বলিল—আমার মতটা শুন্‌বে। আমার অভিমত বুদ্ধিমান্ লোকের একেবারে বিবাহ করা অন্যায়। স্ত্রীলোক যতই শিক্ষিতা হ'ক তারা ভাবপ্রবণ হবেই হবে। তোমার সম্বন্ধে নানা প্রকার কল্পনা ক'রে তোমাকে জ্বালাতন করবেই। অবশ্য ক্ষমা করো। ক্ষণপ্রভা খুব অমায়িক স্ত্রী।

বিজ্ঞান হাসিয়া বলিল—Thank you ; কিন্তু আমি কি বলছিলাম জান। এই মনে কর সেন বালিকা (Sen girls) দিগের মধ্যে রুণুটি কি ঝুনুটির অপেক্ষা বেশী 'চিত্তাকর্ষক' নয় ?

পুলিন বলিল—তাই ওদের কথা ছাড়। ও বোধ হয় দুইটাই সমান কারণ দাদারও তো অবস্থা আমারই মত। তবে যদি প্রসঙ্গের জন্য বলিতে হয় তো নিজেদের মধ্যে (between ourselves) আমার মতে রুণুটি ঘ্যানঘেনে (bore) আর নিজের বিদ্যা সম্বন্ধে একটু তার উচ্চ ধারণা আছে।

"একটা কথা বল্‌ব, রাগ কর্‌বে না ?"

"কি ?"

"অঙ্গীকার করো।"

কদিন বিষাদের পর আজ এই বন্ধু সহবাসটা প্রফেসর পুলিন বসুর বেশ ভাল লাগিতেছিল। সুতরাং সে প্রতিশ্রুত হইল। বিজ্ঞান অতি মোলায়েম ভাবে অর্দ্ধেক কথায় অর্দ্ধেক ইঙ্গিতে সেই ভয়ঙ্কর কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

এরূপ অযথা কথা শুনিয়া পুলিনের মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। সে বলিল—উঃ, কি absurd (অসম্ভব)। ছিঃ ছিঃ সেই কারণে যদি মিস্ সেন অভিমান করিয়া থাকেন তাহ'লে আমি কথনই এ বিবাহে সম্মত হব না। তিনি আমাকে এত নীচ ভাবেন ?

ঠিক ঐ সময় শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা রায় কুমারী হেমলতা সেনকে লইয়া ঐরূপ একটা গবেষণায় প্রবৃত্ত ছিলেন। ঝুনুও উক্ত প্রকারে বুভুক্ষুঅবস্থায় গৃহে গিয়া ভগ্নীকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সে স্ত্রীলোকের গুপ্ত মন্ত্রণা গৃহে কাহারও প্রবেশাধিকার না থাকিলেও সেই রাত্রে বি রায় সাহেব শুনিয়াছিলেন যে তাহাকে এরূপ সন্দেহ করার জন্য কুমারী রুণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে যেরূপেই হউক তিনি নলিনকে বিবাহ করিবেন এবং নলিনের এরূপ চরিত্রের জন্য অনুতাপ করাইবেন।

* * *

এই দুই দম্পতীর বিবাহ বাসরে সমবেত শতাধিক নরনারীর মধ্যে বিজ্ঞান রায় ও তদীয় পত্নী ব্যতীত টেলিফোন বিভ্রাটের কথা কেহ জানিত না। বরবধূ দিগকে অভিনন্দন করিবার সময় বিজ্ঞান ও ক্ষণপ্রভা তাহাদের কর্ণকুহরে যাহা বলিয়াছিল তাহাতে তাহাদের মুখের ভাবান্তর হইয়াছিল। ইহারা সে সময় বন্ধুদের দুইটি উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রথম,—যদি প্রেম করিতে হয় মুখে মুখে করিও, টেলিফোনের ভিতর দিয়া অভ্রান্ত প্রণয় হইতে পারে না। দ্বিতীয় উপদেশ—বুভুক্ষু অবস্থা ভ্রমসংশোধনের প্রকৃষ্ট অবসর।

কবিতা-কুঞ্জ।

জীবন।

মরণের অন্ধকারে চির বিস্মৃতির
প্রলয়-তিমির গর্ভে, সুচির নিদ্রায়,
নিদ্রালসে নিপতিত, সে দুটী আঁখির
পল্লব, নীরবে ছিন্ন হ'ল সমবায়।
কি যে হ'ল তারপর! সে মহাপ্রলয়ে
তারে ল'য়ে গেল, কোথা কোন্ অন্ধকার
গর্ভবাসে। কত কাল ঘুরা'য়ে ফিরা'য়ে
নূতন করিয়া তার, গড়িল আকার।
কি গঠিল? সে কি দেহ? সে কিরে নূতন?
বৈচিত্র্যে নূতন; বৃত্তি তার পুরাতন॥

পিণ্ডীভূত, অবিস্তৃত, সেথা জ্ঞানরাশি,
তমো যবনিকা দিয়ে, জগৎ তাহার
ঢাকিয়া রেখেছে; শাখাপত্রে অবিকাশি
জ্ঞানপিণ্ড, জড় দেহ করিছে বিস্তার।
পাণি-পদ-পায়ু-পস্থ নাসা-কর্ণ-শির
হইতেছে সুবিভক্ত; যথা কুম্ভকার-
চক্রে-দণ্ডে-নিয়ন্ত্রিত-ঘূর্ণিত-মাটীর-
সমষ্টি, বিকাশ করে ঘটের আকার।
ঘুচিতেছে অসাড়তা, জ্ঞান-সমষ্টির।
পবন-হিল্লোলে, যথা সরসীর নীর॥

ঘোর অন্ধকারে কভু যেন মনে হয়
আলোকের রেখা; যথা বদ্ধ-গবাক্ষের
ছিদ্রপথে, দ্রুত আসে যায়, তমোময়-
গৃহে, ক্ষণপ্রভা সম, তীব্র আলোকের
সূক্ষ্ম রেখা। নিদ্রা ঘোরে থাকি অচেতন
বহুকাল পরে বুঝি ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।
কিন্তু সাড়া নাই; পরিপূর্ণ সচেতন
এখনও সে হয় নাই। সে কি বুঝিতেছে
কোথা হস্ত পদ? ক্ষুধা কিম্বা পিপাসার
প্রতিঘাত কোথা? সাধ্য নাহি বুঝিবার।
সে কি বুঝিতেছে? নিদ্রা কিম্বা জাগরণ?
কোথা স্থিতি তার? কোন্ ব্যক্তি? অভিব্যক্তি
কার? সে কি কিছু? কিম্বা কিছু নিরূপণ
করিবার, বুঝিবার, নাহি তার শক্তি।
অথবা আনন্দ? কিম্বা শুধু তাহা নয়;
নূতন আলোকে, হ'য়েছে কি পুলকিত?
আলোকের আবরণে শুধু মোহময়
মন তার, অন্ধকারে হয় উদ্বোধিত।
কিরূপে সে অন্ধকার হ'ল তিরোহিত।
একদা দেখিল দেহ ধূলাবলুণ্ঠিত॥

ফুটিতেছে অহঙ্কার; স্মৃতি আসে ফিরে।
ক্রমে ক্রমে আমিত্বের বাড়িছে প্রসার।
ইন্দ্রিয় শাখায়, ব'হি যায় ধীরে ধীরে
ধারাবাহি জ্ঞান, ক্রমে হ'তেছে বিস্তার।
দেখিছে কি দৃষ্টপূর্ব্ব? বেদনা কি জাগে
প্রাণে তার? কোন্ সুরে পাতিয়াছে কাণ?
হাসে বুঝি অনুরাগে? কাঁদে কি বিরাগে?
রসনায় স্বাদ নাই; নাসিকায় ঘ্রাণ।
পরশে পুলক, ত্রাসে হয় চমকিত।
জ্ঞানের আকারে, হইতেছে আকারিত॥

শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান-পিণ্ড-ময়
কোথায় উৎপত্তি তার, কোথা অবসান,
কারণ অজ্ঞাত ছিল; এবে সমুদয়
বিকশিত হইতেছে। আত্ম-অভিমান
পূর্ণরূপে আপনারে, করি আকর্ষণ
আত্মপর ভেদ করি, করিছে প্রয়াণ
মদগর্ব্বে সুখ দুঃখ করি নিরূপণ
বিজয়ী বীরের মত, উড়া'য়ে নিশান,
অভিযান ক'রেছে কি সংসার উদ্দেশে?
কম্পিত করিতে ধরা, মহারথী বেশে॥

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

সন্দেহ।

পাখীর পাখায় আর তরু লতিকায়—
অনন্ত নীলিম পথে শ্যামল ছায়ায়
শিশুর উদ্যমে আর নারীর সেবায়
বন্ধুর প্রীতির মাঝে ব্যথিত ব্যথায়
বধির আঁখিতে আর অন্ধের শ্রবণে—
নিরাশার স্থির বক্ষে প্রেমিক নয়নে
কত প্রেম কত দয়া কত নিদর্শন—
উছলিছে নিশিদিন সুধা প্রস্রবণ।
তবুও তোমার কথা তোমার ইঙ্গিত—
খুঁজিয়া দুর্ব্বল নর সদা লালায়িত—
অনল জ্বালায়ে নিত্য হিয়ার মাঝারে—
তোমার পায় না দেখা তোমারি ভিতরে—
একি দেব! কেন তব এই অভিশাপ—
স্বার্থ-অন্ধ মানবের মজ্জাগত পাপ!

শ্রীউমাচরণ ধর।

সাহিত্য-সমাচার।

ভারতী—শ্রাবণ, ১৩১৬। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সাধনের সত্য" অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। "ফরাসী বিপ্লবের একটি চিত্র" ক্ষুদ্র গল্প। লিখন ভঙ্গী সুন্দর। "নারী মঙ্গল" শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়ের একটি কবিতা। কবি (?) কবিতার মিলের জন্য বহু পরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছেন। 'গরিমা' ও 'জড়িমা', 'ধরণী' ও 'কণ্টক-মরণী', 'বিথারি' ও 'দ্বি-ধারি' প্রভৃতি অনেক কথাই ব্যবহার করিয়াছেন। "পায়ের মুখর নূপুরের মৃদু ক্রন্দন" অবধি আছে, নাই কেবল অর্থ। একস্থলে লিখিতেছেন—

"হৃদয়ে পুষ্প উঠিয়াছে হের মুঞ্জরি,
নিভৃত মর্ম্ম আসিয়াছে ছুটি বাহিরে।
শত চুম্বন অধরের মূলে গুঞ্জরি'
শিহরি উঠিছে মর্ম্মের গাথা গাহিয়ে।"

কবি নারীর 'হৃদয়পুষ্প' দেখাইতেছেন (!) ও বলিতেছেন 'শত চুম্বন অধরের মূলে গুঞ্জরি' 'অধরের মূলে' যে 'শত চুম্বন' 'গুঞ্জরিত' হয়, ইহা তিনি কোন্ রমণীর নিকট দেখিলেন? কবি হইলে কি এমনই চক্ষু চর্ম্ম-বিহীন হইতে হয়। যাহার হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ই জ্ঞান নাই তাহারও কবিতা 'ভারতী'র মধ্যে। কবি সুবিধামত তের, চৌদ্দ ও পনর অক্ষর অবধি ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই—কিন্তু, তবু কবিতা লিখিতে হইবে। দেশে এত আইন জারি হইতেছে—বালকদের কবি হইবার বিরুদ্ধে কি একটা আইন জারি হইবে না? "ডায়েরি প্রসঙ্গ" মন্দ হয় নাই। "পাকচক্র" সম্পাদিকার রচনা। তাঁহার কাটহাসি হাসাইবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ অমৃতলালের সুবিখ্যাত প্রহসনের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন—তাঁহারাও যে একদিন "লক্ষ্মীমণি চাঁদ-বদনী প্রসন্ন হও—আমার তাপিত প্রাণে

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

দেশীয় সালসা

সুরবল্লী কষায়।

শাস্ত্রোক্ত শোণিত শোধক এবং শোণিত উৎপাদক নির্দোষ অথচ বীর্য্যবান ভেষজাবলির রাসায়ণিক সংযোগে এই মহা কল্যাণকর সালসার উৎপত্তি। এই অমিত তেজস্বী অমৃতকর সালসা যথানিয়মে সেবিত হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই দুরারোগ্য উপদংশ বা পারদ দূষিত রক্ত বিশোধিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রমেহ, [illegible] বিকৃতি ও বাত এবং তজ্জনিত যাবতীয় উপদ্রব অচিরে উপশমিত হয়—আরও ইহার গুণ এই যে বাধা সালসার সমস্ত শক্তিই ইহাতে আছে অথচ উহার কঠিন নিয়ম—কিছুই পালন করিতে হয় [illegible] সুবিধার জন্য সকল ঋতুতেই—আবাল বৃদ্ধ বনিতা ধাতুনির্ব্বিশেষে [illegible] সেবন করিয়া আশাতিরিক্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। সুস্থ শরীরে [illegible] বল বীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রকৃত [illegible] নির্ব্বাচনের বিশেষ সাহায্য হইবে মনে করিয়া রোগমুক্তির সংবাদ [illegible] পত্র রাশির মধ্য হইতে কয়েক খানি মাত্র দিয়ে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ইংরেজ ডাক্তার, শ্রীযুক্ত আর [illegible] L. R. C. P. & S. (এডিনবরা) এল, এফ, পি, এণ্ড, এস (গ্লাসগো) এবং ফিজিসন সার্জ্জন ও একুসার (এডিন) মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দেবেন্দ্র নাথ সেন ও উপেন্দ্র [illegible] কৃত সুরবল্লী কষায় আমার রোগীদিগকে ব্যবহার করাইয়াছি। দেহ হইতে উপদংশ ও পারদ এবং অন্যান্য বিষ বিদূরিত করিতে ইহার উপকারিতা অব্যর্থ। কণ্ডু (চুলকণা) [illegible] চর্ম্মরোগে সুরবল্লী কষায় দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিয়াছি।

শোণিত ও চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে পারদর্শী [Specialist] কলিকাতার প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে, ম্যাগিন M. D., L. M. C., L. S. B., M. E. মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুরবল্লী কষায়ের রক্ত-শোধকতা গুণ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সত্য। তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ [illegible] কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা [illegible] কলিকাতা।

কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩১[illegible]। [৮ম সং[illegible]।

September 1909.

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের দেখিয়াই সদানন্দ দ্রুতপদে আমাদের নিকটে আসিলেন, বলিলেন, "কে ডাক্তার বাবু, আপনি এত রাত্রে এই মাঠে—এ কি—এ কে? কি হইয়াছে? রাজা মণিভূষণ নাকি?"

তিনি সত্বর মৃতদেহের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার মুখ হইতে এক অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইল, তৎপরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এ কে—এ কে?"

আমি বলিলাম, "এ হারু ডাকাত।"

মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখ পাংশু বর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর তিনি আত্ম-সংযম করিয়া বলিলেন, "কি ভয়ানক! কিরূপে এমন অবস্থা হইল?"

আমি বলিলাম, "উপর হইতে পড়িয়া গিয়া ইহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি আমার এই বন্ধুর সঙ্গে মাঠে বেড়াইতেছিলাম, এই সময়ে তাহার চীৎকার শুনিয়া এইখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম।"

"আমিও কাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিলাম, তাহাই দেখিতে আসিলাম। বিশেষতঃ রাজা মণিভূষণের জন্য চিন্তিত হইয়াছিলাম।"

আমি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, "কেন?"

"আমার বাড়ীতে তাঁহার আসিবার কথা ছিল, না আসায় ভাবিত হইয়া দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম। মাঠে এ সময়ে কে চীৎকার করে, তাহাই দেখিতে আসিলাম, ইহার চীৎকার ছাড়া আপনারা আর কোন চীৎকার শুনিতে পাইয়াছেন কি?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কই না, আপনি কিছু শুনিয়াছেন?"

সদানন্দ সহজে বলিলেন, "আমিও কিছু শুনি নাই।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তবে ও কথা জিজ্ঞাসা করিবার মানে কি?"

সদানন্দ বলিলেন, "এখানকার সকল লোক এক কুকুর ভূতের কথা বলে, বলে নাকি রাত্রে তাহার ডাক মাঠে শোনা যায়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যদি আপনারা সেরূপ কোন শব্দ শুনিতে পাইয়া থাকেন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কই না—আমরা কিছু শুনিতে পাই নাই।"

সদানন্দ বলিলেন, "এ বেচারা এরূপে মরিল কি রকমে? এ সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ভয়ে, ভাবনায়, অনাহারে, কষ্টে পাগল হইয়া মাঠে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পর এই গাড়ায় পড়িয়া মারা গিয়াছে।"

সদানন্দ বলিলেন, "তাহাই সম্ভব—গোবিন্দরাম বাবু যখন বলিতেছেন, তখন তাহাই নিশ্চয়।"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার লোক চিনিবার ক্ষমতা খুব আছে দেখিতেছি।"

সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন আমরা সকলেই জানি, আপনি শীঘ্রই এখানে আসিবেন। আসিয়াই একটা লোমহর্ষণ মৃত্যু দেখিলেন।"

গো। নিশ্চয়ই—প্রথমে এখানে আসিয়াই একটা মৃত্যু দেখিতে হইল। কাল সকালেই এখান হইতে ফিরিয়া যাইতেছি, সুতরাং এই হতভাগ্যের মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোন কথায়ই জানিবার সুবিধা হইবে না।

স। কালই ফিরিয়া যাইতেছেন?

গো। হাঁ—এই রকম ত ইচ্ছা আছে।

স। আমরা সকলে যে রহস্যভেদ করিতে পারিতেছি না, আশা করি, আপনি এখানে আসিয়া তাহার কিছু গূঢ় মর্ম্ম জানিতে পারিয়াছেন।

গোবিন্দরাম বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন, "সব সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে।"

সদানন্দ আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই মৃতদেহটা আমার বাড়ী লইয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু আমার ভগিনী দেখিলেই ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবে, বোধ হয় উপস্থিত ইহাকে ঢাকিয়া রাখিয়া গেলে আর শেয়াল-কুকুরে খাইবে না।"

অগত্যা আমরা এই হতভাগ্যের দেহ ঢাকিয়া, একটা গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া গড়ের দিকে চলিলাম। সদানন্দ তাঁহার বাড়ী গিয়া পান তামাক খাইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহার হাত এড়াইয়া আসিলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমরা এখন সম্পূর্ণ হাতাহাতি

লড়াইয়ে নিযুক্ত হইয়াছি। লোকটার কি সাহস, কি ক্ষমতা। ভুলক্রমে আর একজন খুন হইয়াছে, দেখিয়াও কেমন আত্মসংযম করিল। তোমার ডাক্তার আগেও বলিয়াছিলাম, এখনও বলি, লোকটা মহা ক্ষমতাপন্ন।"

"তা হউক,কিন্তু লোকটা তোমাকে দেখিয়া ফেলিল! না দেখাই ভাল ছিল।"

"আমারও তাহাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন আর উপায় নাই।"

"তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ দেখিয়া, এখন সে কি করিবে, মনে কর?"

"দুই হওয়া সম্ভব, এক খুব সাবধান হইয়া যাইবে, দ্বিতীয় যাহা করিবে স্থির করিয়াছে, তাহাতে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিবে না। অনেক বুদ্ধিমান্ বদমাইস্ যাহা করে, সে-ও তাহাই করিতে পারে। কি কিছু সন্দেহ করে নাই, তাহার গভীর গূঢ় মতলব কেহ বুঝিতে পারে নাই ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে কাজ করিতে থাকিবে।"

"এখনই ইহাকে গ্রেপ্তার করিতেছ না কেন?"

"কতবার বলিব বল। ইহার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়, প্রমাণ না পাইলে কে ইহার কি করিতে পারিবে। যতক্ষণ আমরা ইহার এই কুকুরকে টানিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না, ততক্ষণ ইহার কিছু করার সম্ভাবনাই আমাদের নাই।"

"কিছু প্রমাণ আছে?"

"কিছু মাত্র না; কেবল অনুভব, অনুমান, সন্দেহ। এই কথা লইয়া আদালতে গেলে, লোকে হাসিবে মাত্র।"

"রাজা অহিভূষণের মৃত্যু ত আছে।"

"তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল এইমাত্র, দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না, তাহার হৃদ্রোগে মৃত্যু হইয়াছিল, তবে আমরা জানি, ভয়েই, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আর সেই ভয়, তিনি কেন পাইয়াছিলেন, তাহাও আমরা জানি, কিন্তু ভৌতিক কুকুরের কথা কেহ কি বিশ্বাস করিবে? আমরা যাহা জানি বা জানিতে পারিয়াছি, তাহা আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা আমরা এই লোকের কি করিতে পারি?"

"এই মাত্র যাহা জানিলাম?"

"তাহাতেই বা কি প্রমাণ হইতেছে, কুকুরের ভয়ে লোকটা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া গর্ত্তে পড়িয়া যে মারা গিয়াছে,তাহার প্রমাণ কি? উপস্থিত এই লোকের বিরুদ্ধে আমরা কোনই প্রমাণ পাই নাই, সুতরাং আরও দুই-চারিদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে।"

"তবে কি করিতে চাও?"

"নবদুর্গার দ্বারা অনেক সাহায্য হইবে, এ আশা আমার আছে। যাক—এই পর্য্যন্ত আজ থাক, পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।"

যতক্ষণ তিনি গড়ের দ্বার পর্য্যন্ত না আসিলেন, ততক্ষণ আর এক কথাও কহিলেন না, চিন্তিত ভাবে নীরবে চলিলেন। গড়ের দ্বারে আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গড়ে আসিতেছ ত?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, অজ্ঞাতবাসে লাভ নাই—চল। এই কুকুরের কথা মণিভূষণকে বলিও না, সে পাগল হইয়া গাড়ায় পড়িয়া মরিয়াছে, তাহাই এখন সকলে জানুক। কাল রাত্রেতে সদানন্দের বাড়ী মণিভূষণের নিমন্ত্রণ আছে, তাহার জীবনের কাল ঘোর সমস্যা,—"

"আমারও নিমন্ত্রণ আছে।"

"তাহা হইলে কোন ছুতা করিয়া তোমায় তাহার বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে হইবে। এখন চল, মণিভূষণের সঙ্গে দেখা করা যাক।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দরামকে দেখিয়া মণিভূষণ বিশেষ আনন্দিত হইলেন, তাঁহাকে অতি সমাদরে আহ্বান করিয়া লইলেন, তবে তাঁহার সঙ্গে কোন মাল-পত্র নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

হারু ডাকাতের মৃত্যুর কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "একটা পাপ বিদায় হইল।"

কিন্তু তাহার মৃত্যুর কথা শুনিয়া সুমঙ্গলা অজস্র চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল।

আহারাদির পর আমরা তিন জনে বসিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলাম, মণিভূষণ বলিলেন, "ডাক্তার, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহাই একলা বাড়ীর বাহির হই নাই, না হইলে আজ সন্ধ্যার সময় সদানন্দ বাবু তাঁহার বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখানে একলা বসিয়া প্রাণান্ত হইতেছিলাম।"

গোবিন্দরাম সে কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "আর আমারও প্রাণান্ত

হইয়াছে, ভাবিয়া তখন অপর এক নির্জ্জন স্থানে আমরা দুই জনে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলাম।”

মণিভূষণ বিস্মিতভাবে গোবিন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,“সে কি ?”

গোবিন্দ। এই হতভাগার গায় আপনার জামা কাপড় ছিল। আপনার চাকর নিশ্চয় তাহাকে এই কাপড় জামা দিয়াছিল, তাহাকে লইয়া পুলিস টানাটানি করিতে পারে।

মণি। কিরূপে জানিবে আমার কাপড়—কোন দাগ নাই।

গো। তাহা হইলে ভাল, কারণ আপনারা সকলেই এ ব্যাপারে আইন বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন।

তৎপরে হাসিয়া বলিলেন, “ডিটেক্‌টিভ হিসাবে আপনাদের সকলকেই আমার এখনই গ্রেপ্তার করা উচিত।”

মণিভূষণ হাসিয়া বলিলেন, “তাহা অবশ্যই আপনি পারেন, তাহার পর আমাদের পারিবারিক রহস্য সম্বন্ধে কতদূর কি করিলেন। এখানে আসিয়া আমি বা ডাক্তার যে নূতন কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা বলিয়া বোধ হইল না।”

গো। বোধ হয়, শীঘ্রই রহস্য ভেদ করিতে পারিব। ব্যাপারটা অতি কঠিন, কতক বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু অনেক বিষয়েই এখনও অন্ধকারে রহিয়াছি।

ম। বোধ করি, ডাক্তারের কাছে শুনিয়াছেন যে, আমরা একদিন এই কুকুরের ডাক শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, এ ব্যাপারে সমস্তই মিথ্যা নহে, ঐ কুকুরটাকে ধরিয়া শিকলি লাগাইতে পারিলে আপনি যথার্থই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ডিটেক্‌টিভ হইবেন।

গো। কোন ভয় নাই, আপনার সাহায্য পাইলে আমি উহাকে শীঘ্রই শিকলিতে বাঁধিতে পারিব।

ম। আমি সর্ব্বদাই আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

গো। বেশ ভাল, তবে উপস্থিত এখন কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না।

ম। আপনি যেমন বলিবেন, তাহাই করিব।

গো। তাহা হইলে শীঘ্রই এ রহস্যের একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে—তবে আমার—

সহসা তিনি একদৃষ্টে গৃহ-প্রাচীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সহসা যেন তাঁহার দেহ পাষাণে পরিণত হইল, আমরা উভয়েই বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলাম, "ব্যাপার কি ?"

প্রাচীরে কয়েকখানা পুরাতন বড় ছবি ঝুলিতেছিল, তিনি তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছবি আমি বড় ভালবাসি, ডাক্তার তাহা জানে—ছবিগুলি বেশ।"

মণিভূষণ বলিলেন, "ছবি-টবি দেখিবার সুবিধা হয় নাই, এ সব আমার জন কয়েক পূর্ব্ব-পুরুষের ছবি, বহুকাল হইতে এইরূপে ঝুলিতেছে।"

গো। ইহারা কে—ইহাদের কাহার কি নাম জানেন ?

কে কোন্‌টী তাহা অনুপ আমাকে বলিয়াছে।

গোবিন্দরাম একখানি ছবি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এখানি কাহার ছবি ?"

"ও—ইহার বিষয় আপনার জানিবার অধিকার আছে, ইনি সেই গল্পের কুকুরের কর্ত্তা ; ইহাকে আমাদের ভুলিবার সম্ভাবনা নাই।"

আমি বিস্মিতভাবে ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য। দেখিলে ইহাকে খুব ভাল মানুষ বলিয়া বোধ হয়, তবে চক্ষের ভাব বড় ভাল নয়। আমার বিশ্বাস ছিল যে, ইনি খুব বলবান ও দুর্দ্দান্ত !"

গোবিন্দরাম আর কিছু বলিলেন না, তবে আমি দেখিলাম, তিনি অন্যান্য কথা বলিবার মধ্যে মধ্যে এই ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে মণিভূষণ শয়ন করিতে গেলেন, তখন আমি বুঝিলাম যে, গোবিন্দরাম এই ছবিখানি কেন এই ভাবে দেখিতেছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে

আগরার পথে।

ইটাওয়া ও সিকোয়াবাদ।

আগরার পথে স্নিগ্ধ হেমন্তের মধুর সূর্য্যকিরণ হেমরশ্মি প্লাবনে সুনীল দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত করিতেছে। কানপুর হইতে মহাদ্রুতগামী বাষ্পীয় শকট পবনবিক্রমে বিদ্যুৎবেগে আগরা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের হৈমন্তিক শস্যসম্ভার পরিপূর্ণ, প্রভাত মারুতহিল্লোলে তরঙ্গায়িত, হরিতোজ্জ্বল প্রান্তরের মধ্য দিয়া দিগ্‌দেশ কম্পিত করিয়া ছুটিতেছে। রেলপথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে অবস্থিত বৃক্ষাবলী বিহঙ্গকাকলীমুখরিত শোভন নিকুঞ্জ কাননের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। কত কত নগর পল্লীগ্রাম দেখিতে দেখিতে নেত্রপথে প্রকটিত হইল, আবার দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি কম্পার্টমেণ্টের একটী গবাক্ষের নিকট বসিয়া ধূমসুখদ চুরুট সেবন করিতে করিতে পশ্চিম প্রদেশের নিসর্গকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছিলাম। কানপুর হইতে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছিলাম, ক্ষুধায় কাতর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং পুলকিত চিত্তে স্বভাবের শোভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সুদূর শৈশব প্রবাসের শত স্মৃতি বিজড়িত আগ্রা নগরী প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে দেখিতে যাইতেছি—আমার চিত্ত যে কি উল্লাসে নৃত্য করিতেছে তাহা বর্ণনার অতীত।

বলিতে কি, যে স্থানে লোদী বংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছেন; যে স্থান সম্রাটকেশরী বাবরশাহ ভারতবর্ষের ও সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজধানীর জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, যে স্থানে মহাপ্রতাপশালী বাদশাহগণ অখণ্ড প্রতাপে সাম্রাজ্য শাসন করিতেন—যে স্থান শিল্প সৌন্দর্য্যের তীর্থভূমি—ভোগবিলাসের কেলীকুঞ্জ, প্রমোদের নাট্যনিকেতন, স্বাধীনতার চিরগৌরবময় লীলাক্ষেত্র, বীরবীর্য্যের রণস্থল—ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ হর্ম্ম্যাবলী যে স্থানের অপূর্ব্ব অঙ্গ-শ্রী সম্পাদন করিতেছে—যাহার নিম্নদেশ দিয়া চিরমাধুর্য্যময়ী নীলসলিলা যমুনা প্রবাহিত—যাহার উপকূলে তাজমহল বিরাজিত—যে মহানগরী এক সময়ে ভারতের এমন কি আশিয়া মহাদেশের মুকুটমণি ছিল,—সেই আগরায় আমার এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনের মধুর প্রভাত কত না মনের সুখে যাপন

করিয়াছি ; কত সুমধুর ফলের মিষ্টতায় রসনা পরিতৃপ্ত করিয়াছি, বৈশাখের নিদারুণ গ্রীষ্মে খস্‌খসাবৃত গৃহে বসিয়া ত্রিদিবের অমৃতসম হিমস্নিগ্ধ শীতল সরবত পানে জীবন জুড়াইয়াছি, পৌষের প্রখর শীতে জর্জ্জরিত হইয়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদিগের দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ রসাল খাদ্য ও মাংসাহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি—সেই স্থান পুনর্দর্শনের সুখ-স্মৃতি আমার হৃদয়ে কি এক তড়িত শক্তি সঞ্চার করিয়া আমার আপাদ মস্তক যেন কি অপূর্ব্বভাবে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি আমার নাই।

পথের দু'ধারের দৃশ্যাবলী বড়ই প্রীতিপ্রদ বোধ হইতে লাগিল। উদাস মধুর মধ্যাহ্ন প্রকৃতি যেন অর্দ্ধস্বপ্নবিজড়িত, অর্দ্ধতন্দ্রাসমাচ্ছন্ন ভাবে সুপ্তি সাগরে নিমগ্না হইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে অবসাদে ঢুলু ঢুলু করিতেছেন। তাঁহার সেই অপার্থিব সুখবিহ্বল অবসাদ চরাচর বক্ষে ঢালিয়া দিয়া নীরবে ধ্যানমগ্না হইয়াছেন। বিহঙ্গ কণ্ঠ নীরব। সৌন্দর্য্যময় জগৎ একখানি প্রাণহরা ছায়াচিত্রের মত নীলিমায় ভাসিতেছে। কেবল আমাদের বিরাট ভুজঙ্গ তুল্য লৌহরথ বজ্রগম্ভীর নিনাদে বিশ্বের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কেবল মধুর প্রকৃতি ছবি সুধার নির্ঝর ধারায় প্রাণ স্নিগ্ধ ও সিক্ত করিতেছে।

মৃদুল সমীরপ্রবাহে আন্দোলিত শস্য শীর্ষ সমুজ্জ্বল প্রান্তর আলো ও ছায়ার সংমিশ্রণে মনোরম গালিচার ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। শ্রমসহিষ্ণু কৃষক-মণ্ডলী রবিশস্যের ক্ষেত্রসমূহে হলচালনে নিযুক্ত। রাখাল বালকেরা সুদীর্ঘ বংশ-যষ্টি হস্তে গো, মহিষ, ছাগ ও মেষ চরাইতেছে। কেহ বট অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় নিদ্রাসুখে মগ্ন ; কেহ বসিয়া আছে, কেহ বা ধূমপানে আত্মহারা হইতেছে। হস্তে রৌপ্যবলয় শোভিত কোন কোন বালক যষ্টি হস্তে মহিষপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া পশুকুলকে তাড়না করিতেছে। গ্রামবাসীদিগের পর্ণকুটীরশ্রেণী মধ্যে মধ্যে চিত্রবৎ শোভা পাইতেছে। দরিদ্র হিন্দুস্থানী কুলবধূরা ইন্দারার সমীপে বসিয়া তৈজসপত্রাদি মার্জ্জনা করিতেছে, কেহ বস্ত্র-বিধৌত করিতেছে, কেহ বা স্নান করিয়া আর্দ্রবসনে কক্ষে পূর্ণকুম্ভ লইয়া গৃহে গমন করিতেছে। গৃহপ্রাঙ্গনে তুলসী মঞ্চের নিকট বসিয়া কোনও রমণী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, কেহ রৌদ্রে চুল শুকাইতেছে, কেহ ক্রোড়স্থ চঞ্চল শিশুকে স্তন্যপানে ভুলাইতেছে, আবার কোথাও বা কতকগুলি রমণী একত্রিত হইয়া জাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্বরে গান ধরিয়াছে।

কোথাও নিবিড় জটাজূটবিলম্বিত বটবৃক্ষমূলে মৃত্তিকা নির্ম্মিত গোল চবুতারার উপর কয়েকটি অর্দ্ধভগ্ন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটির হস্তপদ ভগ্ন, কোনটী নাসিকা কর্ণবিহীন, কোনটী মস্তকশূন্য, কোনটী বা বহুকাল ধরিয়া শীতাতপ ঝঞ্ঝাবৃষ্টি সহ্য করিয়া ছিদ্রময় হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষতলে সর্ব্বাঙ্গে সিন্দূরলেপিত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। কোনও বৃক্ষের তলে মৃত্তিকা নির্ম্মিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্ব সজ্জীকৃত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আম্রবন—শ্যামল বঙ্গের নববসন্তের চূতমুকুলের দিক্‌ভরা সৌরভে মাতোয়ারা অলিকুলের মৃদুল গুঞ্জন আর শ্রুত হইতেছে না; কেবল মধ্যাহ্নবায়ুবিঘূর্ণিত, নৈশশিশিরমথিত শুষ্কপত্রগুলি মর্ম্মর শব্দে ঝরিয়া পড়িতেছে।

বহু ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বাষ্পীয় রথ ইটাওয়াতে আসিয়া পৌঁছিল। ইটাওয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে ষ্টেশন। কুলিগণ ট্রেণ পৌঁছিবা মাত্র 'ইটাওয়া' 'ইটাওয়া' করিয়া এক প্রকার স্বরসংযোগে হাঁকিতে লাগিল। হিন্দুযাত্রীদিগের হস্ত মুখ প্রক্ষালনার্থ রেল কোম্পানী প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে পানিপাঁড়ে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা এক হস্তে জলপূর্ণ লৌহ নির্ম্মিত ডোল ও অপর হস্তে একটি ছোট পিত্তলের বা কাংস নির্ম্মিত ঘটী লইয়া আরোহীদিগকে জল দিয়া থাকে। দাঁতনও সঙ্গে রাখে। একটী পয়সা দিলে ইহারা বিশেষ তোয়াজ করিয়া জল ও দাঁতন প্রভৃতি দিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পানি-পাঁড়েরা এমনি অলস যে ইহারা অতি অল্প সময়েই উৎকৃষ্ট (?) পানীয় জল আনয়ন করে; ষ্টেশনের নিকট খাল, বিল, ডোবা, পুষ্করিণী ও কূপ যাহা থাকে তাহা হইতে জল তুলিয়া আনিয়া আরোহিগণকে প্রদান করে। ইহাতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। রাত্রে প্রায়ই ইহাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না, তবে গ্রীষ্মকালে রেল কোম্পানীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কখন কখন দেখা দিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের জন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ ভিস্তি নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা মশকে করিয়া জল যোগাইয়া থাকে। ইহাদের হস্তে একটী টিনের গেলাস থাকে, জল চাহিলেই গেলাসটী মশকের মুখে ধরিয়া ভর্ত্তি করিয়া জলার্থীকে জল প্রদান করিয়া থাকে।

ইটাওয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়া সাহেবেরা কেল্‌নার কোম্পানীর হোটেলে (Refreshment Room) ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রবেশ করিলেন। হিন্দু ও মুসলমান যাত্রীদিগের জীবনসাধন খাদ্যফেরিওয়ালাগণ সেই চিরপরিচিত

'পুরাতনে নিতুই নূতন' সুরে 'পুরি মিঠাই' 'কাবাব রোটী' 'পান চুরুট দিয়াশলাই' অধুনা তৎপরিবর্ত্তে 'পান চুরুট সিগ্রেট' বলিয়া হাঁকিতে লাগিল। আরও দেখিলাম ষ্টেশনের প্লাটফরমে পিত্তলের নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট বাসন অর্থাৎ ঘটি, গেলাস, কমণ্ডলু, সর্পসংযুক্ত বাতিদান, রেকাব, বাটি, থাল প্রভৃতি দ্রব্য ফেরিওয়ালাতে বিক্রয় করিতেছে। বাজার দর অপেক্ষা দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য হাঁকিয়া সাহেবদিগকে বিক্রয় করে। আমি দুইটি সর্পমুণ্ডযুক্ত বাতিদানের মূল্য জিজ্ঞাসা করায় ৪৲ টাকা বলিয়াছিল, কিন্তু পরে আমি উহা অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে আগ্রায় ক্রয় করিয়াছিলাম।

ইটাওয়া একটি প্রাচীন সহর। প্রায় আটশত বর্ষ পূর্ব্বের সোমর্ষি নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও যমুনাতীরে দণ্ডায়মান। এক সময় এই সহর সৌধসম্পদে ভূষিত ছিল। গজনীর মামুদ অনেক অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তথাপি ইহার অবয়বে এখনও বহুল সৌন্দর্য্য পরিদৃষ্ট হয়। এখানকার সৌধসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট সুন্দর তরু-রাজীর মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত। সুদৃশ্য জুম্মা মসজীদের উপর হইতে একখানি মনোহারী চিত্রের ন্যায় বোধ হয়। যেন একটী শোভন উদ্যান মধ্যে সহর রচিত হইয়াছে।

যমুনাতীরে অনেক মনোহর ঘাট ও মন্দিরমালা পুলিনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এখানে মহাদেবজীর মন্দির প্রায় দেড়শত বৎসর হইল কোন ধনাঢ্য বণিক কর্ত্তৃক বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইটাওয়ার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যপ্রদ। বঙ্গদেশ হইতে অনেক বাঙ্গালী স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত এখানে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন।

রেল ছাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; ষ্টেশন মাষ্টার সবুজ পতাকা সঞ্চালিত করিয়া ট্রেণ ছাড়িতে আদেশ প্রদান করিয়া কর্ম্মকক্ষ মধ্যে অপসৃত হইলেন। আবার পথে বিবিধ নয়নবিমোহন গ্রাম্যদৃশ্যের অবতারণা হইতে লাগিল। মহাপ্রলয়কারী বিকট রাক্ষসের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দুরন্ত বেগবান লৌহ অশ্বকে (Engine) ভীষণ গর্জ্জনে আগত দেখিয়া মহাভয়ে ভীত ছাগ মেষ তড়িতের ন্যায় তীব্র গতিতে উল্লম্ফন দিয়া শস্যক্ষেত্র মধ্যে লুকাইয়া পড়িতেছে। কোথাও তৃষ্ণার্ত্ত পথিক ইন্দারা হইতে জল পান করিতেছে। দরিদ্র শ্রমজীবিরা বৃক্ষকাণ্ডে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া বিনাইতেছে। শস্যক্ষেত্রসমূহে বিবিধ প্রণালীতে জলসেচন হইতেছে। কোথাও লাঠার

সাহায্যে, কোথাও রজ্জুসংলগ্ন মসকের সাহায্যে, আর কোথাও বা দুইটি বলদ বা মহিষের দ্বারা চালিত ক্ষেত্রমধ্য-খনিত কূপ (Artisan Well) হইতে কপিকলের সাহায্যে সলিল উত্তোলিত হইয়া নববিকশিত শস্যাঙ্কুর বারিসিক্ত হইতেছে। ক্রমে ট্রেণ সিকোয়াবাদে পৌছিল।

সিকোয়াবাদ আগ্রার পথে একটি জংসন ষ্টেশন। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ফরক্কাবাদে গিয়া শেষ হইয়াছে। সিকোয়াবাদ একটি ছোট পশ্চিমে সহর। এখানে বটেশ্বরনাথ নামে মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে 'বটেশ্বরের মেলা' বলিয়া এক বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। এখানে অত্যন্ত মুখরোচক আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সিকোয়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া ট্রেণ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অনন্ত শোভাময়ী প্রকৃতি দেবী তাঁহার সৌন্দর্য্যপটে এক নূতন দৃশ্য অঙ্কিত করিলেন। প্রান্তরের নয়নরঞ্জন হরিত বনশোভা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মবৃক্ষ সমাকীর্ণ উঁচু নীচু অসমতল ভূমিখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল। মরুভূমে উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডের (Oasis) ন্যায় মাঝে মাঝে বাবলা গাছের ঝোপ-ঝাপ। কচিৎ দু'একটি ময়ূর ও বুলবুল পক্ষী দৃষ্ট হইতে লাগিল। অদূরে ঘনকৃষ্ণবনরাজী নীল গগনপ্রান্তে মিশিয়া রহিয়াছে।

বেলা প্রায় তিনটার সময় গাড়ী টুণ্ডলা জংসনে আসিয়া পৌছিল। এখান হইতে একটী ব্রাঞ্চ লাইন আগ্রায় গিয়াছে। এখান হইতে আগ্রা ফোর্ট ১৪ মাইল মাত্র। আমি ট্রঙ্ক, বিছানা, টিফিনের বাক্স, লণ্ঠন, গড়গড়া, জলের সোরাই, ছড়ি, ছাতা প্রভৃতি আস্‌বাব লইয়া টুণ্ডলায় অবতরণ করিলাম।

টুণ্ডলা একটি বৃহৎ ষ্টেশন। এখানেও ফেরিওলারা উচ্চস্বরে খাদ্যদ্রব্যের ফেরি করিতেছে। দুধ, রাবড়ি, লেবু, পেয়ারা প্রভৃতির বিক্রেতারা তাহাদের পণ্য লইয়া প্লাটফরমে পায়চারি করিতেছে। আমি আমার দ্রব্যাদি লইয়া আগ্রার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

টুণ্ডলা হইতে যখন ট্রেণ ছাড়িল তখন আমার হৃদয়ে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সুকঠিন। আগরা ক্যাণ্টনমেণ্টে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তাজমহলের তুষারশুভ্র বিরাট গম্বুজ কিরণোদ্ভাসিত ধবলাগিরির ন্যায় বিমান চুম্বন করিতেছে। যে বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি তাজহর্ম্ম্য দেখিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে পর্য্যটকগণ আগ্রায় আগমন করেন, তাহার প্রথম দূরদৃশ্যেই আত্মহারা হইয়া গেলাম।

ক্রমে বাষ্পীয়রথ যখন যমুনা-সেতুর উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন যমুনা দর্শনে স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের অপূর্ব্ব সঙ্গীত 'যমুনা-লহরী' আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল ;—

"নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও !
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে, রাজিছে তটযুগ ভূষি ও !
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি, অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও !
যুগ যুগ বাহি, প্রবাহ তোমারি, দেখিল কত শত ঘটনা ও !
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী, কহিছ সবে কি পুরাতন ও !
স্মরণে আসি, মরমে পরশে কথা, ভূত সে ভারত গাথা ও!"

যমুনা-সেতুর উপর হইতে দেখিলাম অস্তাচলচূড়াবলম্বী সৌরকরে 'হেমাম্বুদ-কিরীটিনী' উষার ন্যায় নীলতরঙ্গময়ী যমুনাপুলিনে অলকাসদৃশ শোভনা নগরী যেন গগনপটে হরিতবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ সহযাত্রী স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ হালদার মহাশয় নগরী দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া গেলেন। চক্ষের নিমেষে লৌহরথ ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি প্লাটফরমে অবতীর্ণ হইয়া বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। কি মনোহারী দৃশ্য! মর্ত্তলোক ছাড়িয়া কোন্ সৌন্দর্য্যরাজ্যে উপনীত হইলাম। সম্মুখেই রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত অপূর্ব্ব-শ্রী-সমন্বিত চিত্রপ্রতিম নভোচুম্বী আগরা-দুর্গ! অপরদিকে অনিন্দ্য-সুন্দর জুম্মা মস্‌জিদ! আমি উল্লাস-উদ্বেলিত চিত্তে নগরী প্রবেশ করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বঙ্গ-সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়।

সাহিত্যের পুষ্টি দেশের উন্নতির সহিত একান্ত ভাবে জড়িত। একের উন্নতি অপরের উন্নতির অপেক্ষা করে এবং পরস্পরের উন্নতি সমভাবে একং সমকালেই হইয়া থাকে। কেন না, সমাজই সাহিত্য গড়িয়া থাকে, আর সাহিত্যই সমাজের গতি নির্ণয় করে। ঈজিপ্ট সাহিত্যে, গ্রীক সাহিত্যে, রোম সাহিত্যে আমরা সমাজেরই প্রকৃষ্ট প্রভাব অবলোকন করিয়া থাকি,

কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সময়ে, গ্রীকদিগের স্বাধীনতালাভের সময় সাহিত্যেরই পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়. তখন সাহিত্যই সমাজকে এক নূতন উন্মাদনায় উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছিল, নূতন আশায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, নূতন ভাব প্রবাহে সমগ্র দেশকে ভাসাইয়া দিয়াছিল, তখন মানবসমাজ সাহিত্যের অদম্য শক্তি দেখিয়া ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে তরবারি অপেক্ষা লেখনীরই অধিকতর জয় ঘোষণা করিয়াছিল। আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যও সম্পূর্ণরূপে এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্তি-প্রীতি-বিমিশ্রিত-অপূর্ব্ব চৈতন্যযুগ বাঙ্গালী আজ ও রোমাঞ্চ কলেবরে স্মরণ করিয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে তাহার মনে ইহাও উদয় হয় যে, এই সাহিত্যই চৈতন্যের কার্য্যকে কিরূপ সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল আর চৈতন্যের স্বর্গীয় ভাবরাশিই বা এই সাহিত্যকে কিরূপ পুষ্ট, কিরূপ উন্নত, কিরূপ মহীয়ান্ করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাতির গুণাগুণ সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এবং যে জাতি যত মহত্ত্বের উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে, সেই জাতিই তত প্রকৃত, মুগ্ধকর এবং উন্নত সাহিত্য প্রসব করিয়াছে। সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে যেমন দেশের লোককে উন্নত হইতে হইবেই হইবে, তেমনি দেশের মধ্যে কোন সুভাব ছড়াইয়া দেশকে উন্নত করিতে হইলে সাহিত্যের সাহায্য না লইলে চলিবে না। সাহিত্য তখন দেশের হৃদয়স্থিত আকাঙ্ক্ষার সজীব প্রতিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং দেশবাসী তখন তাহাকে অতি আপনার জন বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইতে বাধ্য হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। সাহিত্যের প্রভাব এতই বিস্তীর্ণ ও এতই ব্যাপক! সাহিত্য বাস্তবিকই মানব-সমাজের জীবনীশক্তির একটী প্রথম ও প্রধান উপাদান।

প্রত্যেক মানবসমাজের যেমন একটী একটী বিশিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং প্রত্যেক মানবসমাজ যেমন সেই উদ্দেশ্যের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তদ্রূপ প্রত্যেক জাতীয় সাহিত্যেরও একটী করিয়া বিশিষ্ট আদর্শ, বিশিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং জাতীয় সাহিত্য তাহারই প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া জাতির মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস পায়। যে সাহিত্যের বা সাহিত্যগ্রন্থের এরূপ কোন একটী উদ্দেশ্য থাকে না, সে সাহিত্য বা সাহিত্য গ্রন্থ কখনই সাহিত্য নামের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। তাহা অবসরযাপনের উৎকৃষ্ট উপায় হইতে পারে, তাহা লঘুচিত্তের আদরের সামগ্রী হইতে পারে, তাহা

তরলহৃদয়ের আবেগপূর্ণ প্রশংসা লাভও করিতে পারে,—কিন্তু সাহিত্য নামের সার্থকতা লাভ করিবার ক্ষমতা তাহার আদৌ নাই। যেখানে উদ্দেশ্য নাই অথচ কর্ম্ম আছে, রসের পুষ্টি নাই অথচ রসের অবতারণা আছে, চরিত্রের একটা স্বাভাবিক পরিণতি নাই অথচ সুন্দর চরিত্র চিত্রণ আছে, সেখানে গল্পের প্লটের উপকরণ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা বা নাটকের উপযোগী প্লট সেখানে সম্পূর্ণ দুর্ল্লভ! আমাদের রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসাবলী এই শ্রেণীর পুস্তক। তাহাতে সুন্দর চরিত্র চিত্রণ আছে, মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে, বর্ণনার অলৌকিক পারিপাট্য আছে;—নাই কেবল তাহাতে কর্ম্মের একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র, রসের একটী বিশেষ পুষ্টি, ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতের একটী তরঙ্গ, আখ্যায়িকার একটা স্বাভাবিক পরিণতি। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়িলে মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি রহিয়া যায়, কবির চেষ্টার ব্যর্থতা দেখিয়া দুঃখ হয় এবং মনে হয় কবি যাহা দিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহা দিতে পারিলেন না এবং আমরাও গ্রন্থপাঠের প্রারম্ভে যাহা পাইবার আশা করিয়াছিলাম তাহাও যেন বিফল হইয়া গেল। সুতরাং তখন আমাদিগকে হতাশ-দগ্ধ-হৃদয়ে গ্রন্থের পাঠ শেষ করিতে হয়। এরূপ গ্রন্থ পাঠের ফল এরূপই শোচনীয়!

সাহিত্যের উদ্দেশ্য যখন নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়, তখন সাহিত্য সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তব বস্তুতে পরিণত করিবার জন্য ধীর পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিবার অবসর পায়। প্রত্যেক সাহিত্যগ্রন্থও সাহিত্যের ন্যায় একটী উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অগ্রসর হইতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে সেই উদ্দেশ্যকে সফলতার পবিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া নিজের অভীষ্ট ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও লঘুত্বের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে সাহিত্যের বা সাহিত্যগ্রন্থের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিতে হয়।

আমার বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য। রাসকিনের (Ruskin) মতে, যে গ্রীক সাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় সাহিত্য, সেই গ্রীক সাহিত্যই শুধু জ্ঞান ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যতক্ষণ না সেই জ্ঞান ও শক্তির উপর প্রেমের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, যতক্ষণ না সেই জ্ঞানের কঠোরতা ও শক্তির কাঠিন্য প্রেমের দ্বারা মধুর ও কোমল হয়, যতক্ষণ না মানবজ্ঞানের দ্বারা দৃষ্ট ও শক্তির দ্বারা পুষ্ট হইয়া জড় জগতের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানচালিত, শক্তি

বিমণ্ডিত সাহিত্য উৎকর্ষের অতি উচ্চ গ্রামে উঠিতে পারে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে মরজগতেই ঘুরিয়া বেড়ায়, অনন্তের আস্বাদ লাভ করিবার অবসর পায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রেমের পূর্ণ প্রভাব আছে বলিয়াই সংস্কৃত সাহিত্য অনন্তকে, এই মরজগতের অতীতকে আলিঙ্গন করিবার,আস্বাদ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে রামের লোকোত্তর চরিত্র,সীতার অলৌকিক প্রেমময় প্রাণ, যুধিষ্ঠিরের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বানুরাগ, শিবি'র নিকৃষ্টপ্রাণীর প্রতি অসীম কারুণ্য, শকুন্তলার জড় প্রকৃতির সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধন এবং মহাশ্বেতার স্বর্গীয় আত্ম-বিহ্বল তপস্যা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু প্রেমের দৈন্য বশতঃ আমরা গ্রীক সাহিত্যে এরূপ অতুল প্রেম, অপার আত্মত্যাগ, গভীর কারুণ্য ও অপরিমেয় সহানুভূতির আশা করিতে পারি না। গ্রীক সাহিত্য রামের মত বলশালী হারকিউলিস দিতে পারে বটে, কিন্তু রামের মত বিহ্বল উদার হৃদয় নরশ্রেষ্ঠের সৃষ্টি করিতে পারে কি? গ্রীক সাহিত্য বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় কর্ম্মী থার্ম্মোসের সৃষ্টি করিতে পারে বটে, কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার সরল প্রাণের প্রতিবিম্ব আঁকিতে পারে কি? গ্রীক সাহিত্য সীতার ন্যায় রূপসী হেলেনা আঁকিতে পারে বটে, কিন্তু সীতার অকূল অতল প্রেম-সাগরের কল্পনা করিবার শক্তি তাহার আছে কি? এখানে গ্রীক সাহিত্য পরাভূত, এখানে সংস্কৃত সাহিত্যেরই বিজয়শঙ্খ ঘোষিত হইয়া থাকে। গ্রীক সাহিত্য পার্থিব বস্তু সমূহের সুন্দর প্রতিচিত্র দিতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় অপার্থিব বস্তুর কল্পনা করিতে পারে না। গ্রীক সাহিত্য সাংসারিক প্রেমের প্রকৃষ্ট ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু যে প্রেম মানবকে স্বর্গের সিংহাসনে বসাইয়া দেয়, সেই প্রেমকে আস্বাদ করিবার অবসর পায় না। গ্রীক সাহিত্য আদর্শের দোষে দেবতাকে মানবের অপেক্ষা হীন করিয়া আঁকিয়াছে *; সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় মানবকে দেবতার অপেক্ষা মহত্তর করিয়া আঁকিতে পারে নাই। তবে কি গ্রীক সাহিত্যে উচ্চ অঙ্গের প্রেম নাই, তাহা কি কেবলমাত্র পাশব ভাবেরই লীলাবিকাশ দেখাইয়াছে, তাহাতে কি কেবল কুটিলতা বা স্বার্থবাদেরই বিজয়গীতির আলাপ আছে? না—তাহা নহে, কোনও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যই কুটিলতার উপর, বা স্বার্থবাদের উপর দাঁড়াইতে পারে না। উদারতাই সাহিত্যের প্রাণ, প্রেমই

---

* **Hesiod and Homer have attached to the gods**
All that which brings censure to men ;
Stealing, adultery, and mutual deceit."

সাহিত্যের জীবিকা। সুতরাং গ্রীকসাহিত্যেও উদারতা আছে, তবে তাহা স্বর্গীয় পবিত্র নহে। গ্রীক সাহিত্যেও উচ্চ অঙ্গের প্রেম আছে, কিন্তু তাহা আদর্শ স্থানীয় নহে। ইহাই গ্রীক সাহিত্যের দোষ, ইহাই গ্রীক সাহিত্যের অপূর্ণতা! এই অপূর্ণতা পূর্ণ হইয়াছিল সংস্কৃত সাহিত্যে, এই দোষ নিরাকৃত হইয়াছিল সংস্কৃত সাহিত্যিকগণের কাল্পনিক গ্রন্থ সমূহে। সংস্কৃত সাহিত্য প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরে অনন্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভরীকৃত বলিয়াই সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রীক ট্রাজেডির স্থান নাই, আশাহত হতভাগ্যের করুণ বিলাপ নাই, বিরহ বিধুরা বালার আত্মহত্যার কথা নাই, সেখানে আছে শুধু আশার মন-মজানো মধুর ধ্বনি, সান্ত্বনার করুণাময়ী বাণী, হতাশ প্রেমিকের কঠোর ধৈর্য্য, কর্ম্মীশ্রেষ্ঠের অক্লান্ত কার্য্য, ভগবানের বিচারের উপর অনন্ত বিশ্বাস, জগতের সম্মুখে মানবের লীলাবিহীন আত্ম-প্রকাশ। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রারম্ভে দুঃখ থাকিলেও পরিণামে আনন্দ আছে, প্রারম্ভে অমঙ্গল থাকিলেও পরিণামে কল্যাণের শুভ্র বিগ্রহ আছে, প্রারম্ভে পাপ থাকিলেও পরিণামে পুণ্যের উজ্জ্বল প্রতিমারই পূজা আছে। সেই জন্য সংস্কৃত সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যের পূজ্য, বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ স্থানীয়। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য কি এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে, না আঁধারের ভিতর বিহ্বল পথিকের মত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে? তাহাই আমাদের বিচার্য্য।

আমাদের প্রথম খাঁটী বঙ্গীয় গদ্যগ্রন্থ, প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল।" যে সময়ে প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে বঙ্গে, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্গ সমাজে, তুমুল সংগ্রাম! সে সংগ্রাম অস্ত্রে অস্ত্রে নহে, সে সংগ্রাম রাজায় রাজায় নহে, সে সংগ্রাম উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের অভ্যুত্থানে নহে;—সে সংগ্রাম হইয়াছিল সভ্যতার কবল হইতে অপর সভ্যতার আত্মরক্ষণে, সে সংগ্রাম হইয়াছিল দেশভক্তির সহিত ইংরাজভক্তির ঘোরতর বিরোধে, সে সংগ্রাম হইয়াছিল জাতীয় সাহিত্যের সহিত বিজাতীয় সাহিত্যের ভীষণ সংঘর্ষণে! প্যারীচাঁদ কিন্তু এই সংগ্রামের কোন সংবাদই রাখেন নাই, তিনি নিভৃত কক্ষে বসিয়া শান্তিময় পল্লীচিত্র আঁকিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর অন্তরের কথা, বাঙ্গালী-হৃদয়ের মর্ম্মের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদের গ্রন্থ দেশের অন্তরের কথা কহিল বটে, কিন্তু ইহাতে দেশের ভবিষ্যতে যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রতীক্ষা করিতেছে

তাহার স্থান কোথায় ? নিদর্শন কোথায় ? প্যারীচাঁদের সেই চিত্রে শান্তির সুবাস ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যত্বের উচ্চ বিকাশ কোথায় ? তাহাতে ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথা রহিল বটে, কিন্তু তাহাতে দেশব্যাপী আন্দোলনের পরিচয় কোথায় ? তাহাতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের, আশ্বাস অনাশ্বাসের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাহাতে নানা রসের সমাবেশ কোথায়, নানা ভাবের উদ্দীপনা কোথায়, নানা কর্ম্মের প্ররোচনা কোথায় ? সেই জন্য প্যারীচাঁদের গ্রন্থ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে স্থান পাইল না, ভ্রষ্ট শিক্ষিত সমাজকে ন্যায় পথে আনয়ন করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল, সংগ্রামের ভীষণ কোলাহলে তাহার শান্তির কোমল সুর ডুবিয়া গেল, মিলিয়া গেল, একেবারে বিলীন হইয়া গেল !

প্রতিভার অবতার মধুসূদন ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে সাহিত্যগ্রন্থে সংগ্রামের অবতারণা একান্ত আবশ্যক। তিনি জানিয়াছিলেন যে, সঙ্কীর্ণ পল্লীর ইতিহাসে উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম সংগ্রামের স্থান নাই, সংগ্রাম কালে যে সাধুবৃত্তি সমূহের উদ্রেক হইয়া থাকে তাহার নিদর্শন নাই, জনসমষ্টির সহিত একটী নরহৃদয়ের সংযোগ চিহ্নের রেখা নাই, বিশ্বের প্রতি মানবের যে কি দারুণ কঠোর কর্ত্তব্য বিদ্যমান, সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ নাই। সেই জন্য তিনি সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া 'মেঘনাদবধ' রচনা করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদিগের অনুকরণে বঙ্গ-সাহিত্যে শক্তিপূজার প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। জানি না কেন রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় নির্ব্বাচনের উপর নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন মধুসূদনের এই বিষয়-নির্ব্বাচন মহাকাব্যের উপযোগী নহে। 'মেঘনাদবধে' কি মহত্ত্বের উজ্জ্বল বিকাশ নাই ? 'মেঘনাদবধে' কি আত্মত্যাগের পবিত্র দৃষ্টান্ত নাই ? লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী স্ত্রীমুখ অদর্শন, ইন্দ্রজিতের প্রাণ বিসর্জ্জন, তথাপি বিশ্বাসহন্তা পিতৃব্যের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করণে নিতান্ত অপ্রবৃত্তি, দশাননের বিরাট স্বাধীন চরিত্র, সীতার করুণ প্রেমময় আলেখ্য, সৌমিত্রি-জীবন রামের ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতি কি উচ্চ অঙ্গের সুভাবরাশি নহে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'ই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম মহাকাব্য। তবে 'মেঘনাদবধে' কি দোষ ছিল না ? ছিল—সে দোষ কাব্যের নহে, সে দোষ কবির, সে দোষ তদানীন্তন বঙ্গসমাজের ; সে দোষ—ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির অভাব, সে দোষ—দেশের ইতিহাসের প্রতি তাচ্ছল্য !

মধুসূদনের অনুকরণে মধুসূদনের অনুবর্ত্তিগণ সাহিত্যে শক্তিপূজার প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে,আনন্দমঠে, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতিতে এই সংগ্রামের অবতারণা করিতে লাগিলেন এবং নানা রূপে বঙ্গবাসীর কর্ণে সংগ্রামের তীব্র কঠোর স্বরকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলেন। বঙ্কিমের যুদ্ধ বর্ণনা স্থানে স্থানে নিতান্ত হাস্যকর হইলেও বাঙ্গালী আগ্রহ সহকারে তাহা পড়িতে লাগিল এবং এক অননুভূত রসের আস্বাদ পাইয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে বাধ্য হইল। কিন্তু এই যুদ্ধ বর্ণনা প্রকৃষ্টতা লাভ করিয়াছিল হেমচন্দ্রের 'বৃত্র সংহারে'। হেমচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনা মৃতপ্রায় তুরঙ্গমকেও সবল অশ্বের ন্যায় হ্রেষারব করিতে প্রবুদ্ধ করে, ভীরু কাপুরুষকেও প্রকৃত বীরের ন্যায় বাহ্বাস্ফোটন করিতে শিখায়, বালকের তরল হৃদয়েও আশার উন্মাদরাগিণী বাজাইয়া তুলে। বাস্তবিকই হেমচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে অতুলা, অনুপমেয়! কিন্তু হেমচন্দ্রেরই সহিত বঙ্গসাহিত্যে এই শক্তিপূজার তিরোভাব ঘটিল। নবীনের কাব্যে তীব্র মাদকতা ছিল বটে, কিন্তু সংগ্রামের সেই ভৈরব কল্লোল কোথায়? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মধুর আবেশ ছিল বটে, কিন্তু জলধির সেই প্রলয় গর্জ্জন কোথায়? মধু হেমের সহিতই তাঁহাদের শিঙ্গার বজ্রনির্ঘোষ ও তুরীর মর্ম্মভেদী নিনাদ বঙ্গের আকাশ প্রান্তে ডুবিয়া গেল, সেইখানে বাজিয়া উঠিল নবীনের শ্যামের সরল বাঁশের বাঁশীর প্রেমময় মধুর সঙ্গীত, আর রবির সানাইএর হৃদয়-ভোলানো করুণ আলাপ! কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন হইতে বঙ্গসাহিত্যে আবার শক্তিপূজার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং গিরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী নাট্যকার ইহার প্রধান উপাসক পদে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন!

যখন বঙ্গসাহিত্যে শক্তিপূজার আধিপত্য ক্রমশই বিলীন হইয়া আসিতেছিল, যখন বাঙ্গালীর কোমলহৃদয় শান্তির বিমলচ্ছটার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন রণকোলাহলের তীব্রতা বাঙ্গালীর কর্ণে উদ্দীপনার পরিবর্ত্তে জড়ত্বই বহিয়া আনিতেছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে জ্ঞানের উন্মেষ দেখাইয়াছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যে গ্রীকসাহিত্যের অনুকরণে জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি নানাপ্রকারে বঙ্গসাহিত্যে এই জ্ঞানের আলোচনা হইয়া আসিতেছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না এই প্রকৃত জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রসার

অপ্রতিরোধনীয় বা অনিবার্য্য। গিরিশচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন এই মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারাই অবশেষে গ্রীক সাহিত্যের অবনতি হইয়াছিল, ধ্বংস ঘটিয়াছিল। সেই জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যকে আশু বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহাতে ভক্তিরসের সমাবেশ করিয়াছিলেন এবং গ্রীক সাহিত্যের যাহা চরম তাহারই ঊর্দ্ধে বঙ্গসাহিত্যের উল্লসিত মূর্ত্তির স্থাপনা করিয়াছিলেন। গিরিশের প্রতিভা যে ভক্তির প্রবাহ ছুটাইয়াছিল, সেই প্রবাহ নবীন রবির হৃদয়েও ভক্তির বন্যার সৃষ্টি করে এবং সেই বন্যায় আজ স্নান করিয়া বাঙ্গালী সফলকাম পূতজীবন হইতেছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বঙ্গসাহিত্য এইবার এমন কোন্ আদর্শ গ্রহণ করিবে যে আদর্শ তাহাকে ভূমার অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করাইবে, তাহাকে অনন্তের সহিত বহুদিন পরিচিত বন্ধুর মত মিলিতে শিখাইবে এবং বিশ্বজগতের সহিত সামান্য প্রাণীরও যে একটা সংযোগ আছে সেই সংযোগ চিহ্নকে প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে? মানবজ্ঞান সান্ত, তাহা কখনই মানবকে অনন্তের আস্বাদ প্রদান করিতে পারে না। ভক্তিও শুধু মানবকে কখন ভূমার অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করাইতে পারে না. সেখানে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান, শক্তি ও ভক্তি সম্মিলিত হইলেও মানব ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তিকে সম্ভোগ করিতে পারে না, সেখানে প্রেমের প্রয়োজন। অর্জ্জুনের মত জ্ঞানী কে, অর্জ্জুনের মত শক্তি কাহার, অর্জ্জুনের মত কৃষ্ণভক্তি কোন্ হৃদয়ে? কিন্তু তথাপি অর্জ্জুন সেই বিরাট মূর্ত্তির বিরাটত্ব সহ্য করিতে পারিলেন না, কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "হে দেব, হে শ্রীনিবাস! তোমার ও মূর্ত্তি সংহর, সংহর! আমি ভীত হইতেছি, বিহ্বল হইতেছি।" সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় বিরাটত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেমকেই আদর্শ করিতে হইবে—যে প্রেম ব্যষ্টি লইয়া নহে, সমষ্টি লইয়া, যে প্রেম শুধু আপনি লইয়া নহে সমগ্র জগত লইয়া, যে রামের ভ্রাতৃপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছিল তখন, যখন তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন লক্ষ্মণকে! যে জামদগ্নির মাতৃপ্রেম প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল তখন, যখন তিনি নিধন করিয়াছিলেন রেণুকাকে! যে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র-বাৎসল্য বিকশিত হইয়াছিল তখন, যখন তিনি মৃতপুত্রের সৎকার-মূল্যের জন্য কলহ করিয়াছিলেন পত্নীর সহিত। যে যুধিষ্ঠিরের আত্মপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছিল তখন, যখন তিনি আপনাকে বঞ্চিত করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে দিয়াছিলেন সারমেয়কে। আমরা এই প্রেমেরই কল্পনা, এই সংস্কৃত সাহিত্যেরই আদর্শ দেখিতে চাই—বঙ্গসাহিত্যে!

যদিও সেক্‌স্‌পীয়ার বলিয়াছেন, প্রেম অন্ধ (Love is blind), কিন্তু তথাপি যে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচিত, সে কখনই ইহা সমর্থন করিতে পারিবে না, তাহাকে স্বীকার করিতে হইবেই যে প্রেম মানবকে চক্ষুষ্মান করে, প্রেম অন্ধকার হৃদয়-গহ্বরে বর্ত্তিকার উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করে, প্রেম প্রকৃত কল্যাণকে, প্রকৃত মঙ্গলকে বরণ করিয়া লয়—আত্মতৃপ্তির জন্য পিপাসিত রহে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রেমে জ্ঞানের পূর্ব্ববিকাশ আছে। প্রেমের মত শক্তি কাহার? যে রাবণ দুর্জ্জয় ইন্দ্রেরও ভয়হেতু, যাহার ভীষণ মূর্ত্তি অতি বড় সাহসী পুরুষেরও হৃদয়ে এক অননুভূত বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দেয়, যাহার অত্যাচারে ত্রিভুবন সন্ত্রস্ত ও পীড়িত হইয়া দিক্‌মণ্ডল হাহাকারের মর্ম্মভেদী বিলাপে নিনাদিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই রাবণও সীতার নিকট অতি তুচ্ছ হীনের ন্যায় পরাজিত, বিধ্বস্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে একান্ত অসমর্থ! রেনেসান্স সাহিত্য, খৃষ্টান সাহিত্য যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সৌন্দর্য্য, সেই গর্ব্ব, সেই সান্ত্বনা, সেই বিচারশক্তিই কি প্রেমরাজ্যের একান্ত অনুরক্ত প্রজা নহে? প্রেমের মত সুন্দর কি? প্রেমের মত এমন নির্ব্বিরোধী, এমন মধুর গর্ব্ব কে দেখাইতে পারে? প্রেম যেমন করুণ সান্ত্বনা দিয়া হৃদয়ের ক্ষতকে সুস্থ করিতে পারে, এমন ক্ষমতা আর কাহার আছে? প্রেমের মধ্যে যে বিচারশক্তি, যে নিপুণ বিবেচনা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার নিদর্শন আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যে সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরই আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহার সঙ্গে আমরা তাহা পাইতেছি—যাহা সাহিত্যের অমূল্য ধন, যাহা মানবসমাজের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত নিধি, যাহা সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র অবলম্বন, সেই ঈশ্বরে অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং আজ সমস্ত বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই আদর্শে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া স্ব স্ব সাহিত্য-জীবনতরীকে বাহিত করেন। কিন্তু শুধু ইহা হইলেই চলিবে না, এই সাহিত্যের উন্নতির জন্য সাহিত্যের প্রসারের জন্য সমগ্র বঙ্গজাতিকেই কঠোরতর, মহত্তর কার্য্য করিতে হইবে—সেই কার্য্য সংযমাভ্যাস, সেই কার্য্য চরিত্র গঠন, সেই কার্য্য বসুন্ধরার ন্যায় ধৈর্য্যলাভ। বাঙ্গালী রমণী চরিত্রে উক্ত তিন গুণেরই সমাবেশ আছে, সেই জন্য আমরা সরস্বতীর মত গৃহিণী, বিদের মত, জোবীর মত সহৃদয়া পত্নী, প্রফুল্লর মত পুত্রবধূ, উমাসুন্দরীর ন্যায় শাশুড়ী পাইয়াছি। কিন্তু সমগ্র সাহিত্য-সংসারে ইহাদের তুল্য সংসারী পুরুষ প্রতিচিত্র কোথায়? রমণী

চরিত্রের এই উৎকর্ষ কবির ইচ্ছাকৃত নহে, ইহাই স্বাভাবিক; এ দোষ কবির নহে, এ দোষ আমাদেরই। পুরুষ আমরা এত হীন, এত নীচ যে কবি শত চেষ্টা করিয়াও রমণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিম্বা রমণীর সমতুল্য পুরুষ-চরিত্র আঁকিতে পারিলেন না। যদি আমরা বঙ্গসংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই এই অর্দ্ধশিক্ষিতা—অশিক্ষিতা দেবীরাই যাতনার সতত অনুপেষণে অনুবিষ্ট হইয়াও হাস্যরসে এই সুখহীন, স্বাদহীন, বৈচিত্র্যবিহীন সংসারকে অমরার ন্যায় আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছেন—আর আমরা—হতভাগা আমরা, শিক্ষাগর্ব্বিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত আমরা বুকভরা দ্বেষ, প্রাণভরা গর্ব্ব, হৃদয়ভরা আলস্য লইয়া নিকৃষ্ট মনুষ্যের অস্পৃশ্য আনন্দের জন্য তৃষিত রহিয়াছি—ভুলিয়া গিয়াছি ইউনিভারসিটি পাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে, আমাদের লক্ষ্য—আমাদের সংসার, আমাদের গ্রাম, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ। আমাদের এই কর্ত্তব্যবিতৃষ্ণা আমাদের সাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—এখানে বঙ্কিমের অসীম প্রতিভা, গিরিশের কল্পনাশক্তি, বঙ্গগৌরব মধু, হেম, নবীন, রবির আন্তরিক চেষ্টা বিফল—বিফল হইয়া গিয়াছে। যখন ইঁহাদের দ্বারাই সফলতা প্রাপ্ত হইতে পারা গেল না, তখন আর কে ইহাকে ফলবান করিতে পারিবে? ইহাকে ফলবান করিবার শক্তি একের নাই—তিনি যতদূরই প্রতিভাশালী হউন না কেন। এখানে কবির শক্তি হ্রাস পায়—প্রতিভাগ্নি জুড়াইয়া যায়, অমানুষী সৃষ্টিবৈচিত্র্য বিহ্বল হয়। এই আদর্শ কেবলমাত্র সমগ্র বাঙ্গালীজাতির প্রাণপণ অধ্য-বসায়ের দ্বারাই সফল হইতে পারে—সেইজন্য আজ সাহিত্যের উন্নতির জন্য বাঙ্গালার প্রকৃত সন্তান ভূদেবের কথায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—

"দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা একণে দরিদ্র জাতি। আমাদের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। গান, বাজনা, আমোদ প্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী প্রবলপ্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে, আমাদিগের মধ্যে গান, তামাসা, নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোনমতেই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান, তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে,

সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাইকার্গস্ হইতে হইবে, কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকার্গস্ জন্মিবে না।”

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

নূরজাহান বেগম।

ভারতবর্ষের মোগলসাম্রাজ্যের ইতিহাস-পাঠকের কল্পনা-পটে সুলতান জাহাঙ্গীরের জীবন-প্রদীপ সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের চিত্র যেরূপ প্রকৃত বলিয়া প্রতিভাত হয়, ঐ সময়কার কোনও স্ত্রীচরিত্র তাহার হৃদয়ে সেরূপ উজ্জল-ভাবে প্রকটিত হইতে পারে না। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের প্রণয় অধ্যায়ে আসিয়া পাঠক সহসা উপলব্ধি করে যে শুষ্ক ইতিহাসের নীরস কাণ্ডটা পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চাশা-প্রণোদিত মোগল সম্রাটদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার ও যশোপার্জ্জন প্রয়াসের কাহিনীর পর, মহামতি আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য যন্ত্রীকৃত করিবার বিশদ বিবরণ পাঠান্তে জাহাঙ্গীর সম্রাটের মধুর প্রণয়ের বিবরণ পাঠ করিতে ইতিহাস-পাঠক স্বভাবতঃই একটু নূতনত্ব উপভোগ করেন। একটা সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তার সহিত তাহার যে বিষম পার্থক্য আছে জাহাঙ্গীরের আবেগময় কাহিনী পাঠ করিবার সময় পাঠক তাহা বিস্মৃত হয়। তাঁহার হৃদয়ের প্রেমবিদগ্ধ অসহিষ্ণুতার বিবরণ পাঠকের নিকট বড়ই চিত্তাকর্ষক। নিজ প্রণয়মন্দিরে মহান সাম্রাজ্য ভোগাকাঙ্ক্ষা বলি দিয়া সুলতান আপনার হৃদয়ের সম্রাজ্ঞীকে হিন্দুস্থানের প্রকৃত শাসনকর্ত্রী করিয়াছিলেন এ কথা পাঠ করিয়া ভাবুক পাঠক ইতিহাসের এ অধ্যায়টিকে হৃদয়-পটে যেমন বাস্তব বলিয়া দেখিতে পায় তেমন অপর রাজকার্য্যগুলাকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পারে না। সেই জন্যই জাহাঙ্গীর নূরজাহানের আখ্যায়িকা এত মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী।

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সেনা সুরক্ষিত মোগল রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রকৃতপক্ষে কি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, বাদসাহের হৃদয়ে বাস্তবিক কি

প্রকার ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল, পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভাব ও ঘটনার এতগুলা বিপ্লবের পর এতদিন পরে ঠিক তাহার সত্য বর্ণনা পাওয়া সুকঠিন। ইতিহাস অপরাপর সাধারণ ঘটনার মত সে ঘটনাগুলারও বর্ণনা দিয়াছে—কেবল মোটামুটি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলা প্রকটিত করিয়া দিয়াছে মাত্র। আজকালিকার উর্ব্বর মস্তিষ্ক লেখক সেগুলাকে লইয়া এই মধুর আখ্যায়িটাকে পত্রপুষ্পে সুশোভিত করিবার জন্য যথাশক্তি আপনার কল্পনার উপর নির্ভর করেন। ফলে ইতিহাস কলঙ্কিত হয়, সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, সুলতান ও বেগমকে হীনচরিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যে সকল লেখক ইতিহাসের গল্প লইয়া এইরূপভাবে বিকৃত করেন তাঁহারা প্রকৃত সত্যানুরাগী সাহিত্যসেবীদিগের নিকট কিরূপ দোষী তাহা বলা বাহুল্য।

নূরজাহান সম্বন্ধে পারস্যভাষা লিখিত দেশীয় ইতিহাসেও মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। শের আফগানের হত্যা প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিভিন্ন লেখকের হস্তে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এ প্রবন্ধে ইকবাল নামা ই জাহাঙ্গীরি নামক ইতিহাস হইতে তাঁহার আখ্যায়িকা সংকলন করিব। লেখক নবাব মোতামদ বলেন যে তাঁহার প্রভু সম্রাট জাহাঙ্গীরের আজ্ঞানুসারে এই ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়াছিলেন। অবশ্য এ গ্রন্থ-বর্ণিত ঘটনাবলী যে প্রকৃতপক্ষে সত্য তাহা বিশ্বাস করা যায় না। আপনার প্রভুচরিত্রে যে সকল ঘটনাগুলা কলঙ্কলেপন করিবে লেখক সেগুলাকে অনাবৃত ভাবে প্রকাশ করেন নাই বলিয়াই আমাদেরও বিশ্বাস, তবে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সম্বন্ধে এটা যে Official Version সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী সুন্দরী নূরজাহানের পিতা মির্জ্জা গায়াসবেগ তিহারণ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা খোরাসানের শাসনকর্ত্তার উজীর ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর আপনার জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গায়াসবেগ দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা সমভিব্যাহারে হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে গান্ধার প্রদেশে তাঁহার অপর একটী কন্যার জন্ম হয়। এই সর্ব্বসুলক্ষণা অসামান্যা রূপবতী কন্যাই যৌবনে আকবর সুতের হৃদয়াধিকার করিয়া নূরজাহান আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন।

ভারতবর্ষে আসিয়া ফতেপুর সহরে মির্জ্জা গায়াসবেগ মহামতি আকবরের নিকট পরিচিত হইলেন। সে সময় পারস্য ও মধ্য আসিয়ার লোকের মোগল রাজসভায় বড় আদর ছিল। সম্রাট তাঁহাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করেন

এবং ক্রমে ক্রমে নিজ প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতা দ্বারা তিনি সম্রাটকে বশীভূত করিয়া রাজপ্রাসাদের দেওয়ান পদে উন্নীত হন। কার্য্যবিশারদ সুলেখক এবং প্রভুভক্ত বলিয়া শীঘ্রই তিনি খ্যাতি লাভ করিলেন। মির্জ্জা সাহেব বেশ সুন্দর কবিতাও লিখিতে পারিতেন। এই সকল কারণে তিনি বাদসাহ ও ওমরাহ মহলে দিন দিন বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। সকল ইতিবৃত্তকার এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে উৎকোচ গ্রহণ বিষয়ে তাঁহার বড়ই দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি কিন্তু এ অর্থের সদ্ব্যয় করিতেন। তাঁহার গৃহে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়া কাহাকে কখনও রিক্ত হস্তে ফিরিতে হয় নাই। আপন সাধ্যমত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি অর্থদান করিয়া সাহায্য করিতেন।

মির্জ্জা গায়াসবেগের যে কন্যাটি কান্দাহারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইরাক রাজ্য হইতে আলি কুলি বেগ নামক এক যোদ্ধা আসিয়া ভারতবর্ষে বেশ যশ অর্জ্জন করিতেছিল। মির্জ্জা গায়েস সেই ফুল্ল কুসুম সদৃশ অসামান্যা রূপবতী কন্যাকে আলি কুলির হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আকবর সুত সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া আপন পিতৃত্যক্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া আলি কুলিকে শের আফগান উপাধি মণ্ডিত করিলেন। যদি এই ইতিহাস বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত যুবক সম্রাটের তরুণ হৃদয়ে সৌন্দর্য্যশালিনী মির্জ্জা তনয়ার কমনীয়তার রশ্মি প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করে নাই। কেবল শের আফগানের গুণপনায় চমৎকৃত হইয়া বাদসাহ তাঁহাকে আরও উচ্চপদে বরিত করিলেন। তাঁহার পত্নী ইতিমৌদদ্দৌল্লা উপাধি লাভ করিলেন। এবং সম্রাটের অনুগ্রহে শের আফগান বঙ্গ দেশে এক জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধমান সহরে বাস করিবার জন্য সস্ত্রীক গমন করিলেন।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনাধিরোহণ করিবার দুই বৎসরের মধ্যেই শের আফগান সম্বন্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উপস্থাপিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ রাজপুতবীর রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে যখন যুবরাজ সেলিম যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন শের আফগান তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। সেই বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সম্রাট একেবারে শের আফগানকে পদচ্যুত না করিয়া কুতবুদ্দীন খাঁ নামক একজন ওমরাহকে শের আফগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পাঠাইলেন। তাঁহার উপর আজ্ঞা হইল যে যদি তিনি শের আফগানকে

রাজভক্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে ফিরিয়া আসিবেন, আর যদি বুঝিতে পারেন যে আফগান সম্বন্ধে অভিযোগগুলি নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে, তাহা হইলে তাহাকে অচিরে রাজধানীতে আসিবার জন্য আজ্ঞা দিবেন।

কুতবুদ্দিন শের আফগানের চালচলন বড় ভাল বলিয়া বুঝিলেন না। ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া শের আফগান রাজদ্রোহিতাচরণ করিতে সংকল্প করিতেছেন ইহাই তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি শের আফগানকে পুনঃ পুনঃ তাঁহার দরবারে আসিতে বলিলেও শের আফগান তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। অগত্যা কুতবুদ্দীন শের আফগানের চরিত্র সম্বন্ধে বাদসাহ দরবারে সংবাদ ও নিজের মতামত প্রেরণ করিলেন।

বলা বাহুল্য শের আফগানের এরূপ আচরণে তরুণ সম্রাট অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি কুতবুদ্দীনের উপর আজ্ঞা দিলেন যে, যদি শের আফগান স্বয়ং রাজসভায় আসিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে তাহাকে বন্দী করিয়া পাঠাইবে।

কুতবুদ্দীন সদলবলে শের আফগানের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। কুতবুদ্দীনের অনুচরবৃন্দ তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিতে তাহাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শের আফগানের কোনও সন্দেহ রহিল না। কুতবুদ্দীনের সৈন্যদিগের এরূপ ব্যবহার অবৈধ বলিয়া শের আফগান অভিযোগ করিলেন। কুতবুদ্দীন তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া আফগানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর শের আফগান কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একেবারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন এবং আপনার শাণিত কৃপাণ তাঁহার উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজদূতের ইহলীলা শেষ হইল। তখন তাঁহার অনুচরবর্গ শের আফগানকে আক্রমণ করিল। অসীম সাহসের সহিত কুতবুদ্দীনের সেনাবৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিলেও সে যাত্রায় শের আফগান রক্ষা পাইলেন না।

শের আফগানের মৃত্যুর পর তাঁহার রূপবতী ভার্য্যা ইতিমদ্দৌলা রাজান্তঃপুরে প্রেরিত হইল। ইকবাল নামার মতে তখনও সম্রাট তাঁহার রূপগুণে মুগ্ধ হয়েন নাই। তিনি আপনার মাতার শুশ্রূষা করিবার জন্য এই সুন্দরীকে নিযুক্ত করিলেন।

ইকবাল নামার মতে তাঁহার রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষের নৌরোজার দিন সম্রাট প্রথম এই যুবতীর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। এ সম্বন্ধে ইতিহাস লেখক

বলেন—"যেহেতু বিধির বিধান যে তিনি পৃথিবীর রাণী হইবেন এবং সে কালের প্রধানা রাজমহিষী হইবেন; তাঁহার রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে নৌরোজার উৎসবের সময় বাদসাহের বহুদূরদর্শী নয়নে তাঁহার আকৃতি পতিত হইল এবং তাঁহাকে বন্দী করিল। এবং সম্রাট তাঁহাকে আপনার জীবনসঙ্গিনী করিয়া লইলেন।"

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে প্রায় সকল ইতিহাসের এক মত। দিন দিন নূতন সম্রাজ্ঞীর ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রথমে সম্রাট তাঁহাকে "নূরমহাল" বা "অন্তঃপুরের আলোক" উপাধি প্রদান করিলেন। শেষে তিনি "নূরজাহান" বা "জগতের আলোক" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। একে একে তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণের উপর সম্মান বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহারা বড় বড় রাজপদ ও অর্থ লাভ করিতে লাগিল। নূরজাহান বেগমের মোহর ব্যতীত কোনও স্ত্রীলোককে সম্রাট ভূমি দান করিতে পারিতেন না। ক্রমে তিনি স্বয়ং জানালায় বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও ওমরাহ ও সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচলিত হইতে লাগিল এবং মুদ্রার উপর লিখিত হইল—"জাহাঙ্গীর বাদসাহের আদেশ মত মুদ্রার উপর নূরজাহান বেগমের নামাঙ্কিত হওয়ায় স্বর্ণের শোভা শত গুণ বর্দ্ধিত হইল।" প্রত্যেক ফারমানের উপর নূরজাহান বেগমের নামের মোহর সম্রাটের মোহরের পার্শ্বে পড়িত। ইকবাল নামার লেখক বলেন যে ক্রমশঃ সমস্ত ক্ষমতা একে একে সম্রাজ্ঞীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া সম্রাট নিজে কেবল মাত্র নামে বাদসাহ ছিলেন। তিনি নূরজাহানের প্রেমে বিভোর হইয়া প্রায়ই বলিতেন—"আমি কেবল দিনে এক সের সুরা ও অর্দ্ধ সের মাত্র মাংস চাহি, অপর কিছুই চাহি না।"

কিন্তু এইরূপে একে একে সম্রাটের হস্ত হইতে সকল রাজকার্য্য নিজ করায়ত্ত করিলেও নূরজাহান বেগম সাধারণ রমণী ছিলেন না। সকল সমসাময়িক ইতিহাস একবাক্যে তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা ও কার্য্যতৎপরতার সাক্ষ্য প্রদান করে। সমসাময়িক লেখক মোহম্মদ হাদী বলেন যে সকল শ্রেণীর প্রজাগণ তাঁহার সুখ্যাতি করিত। যে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইত নূরজাহান বেগম তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। তিনি দুঃখীদিগের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং অসহায়া বালিকাদিগের নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিয়া দিতেন। এইরূপে তিনি অন্ততঃ পাঁচশত বালিকাকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন।

নিজ সম্রাট-স্বামীর উপর নূরজাহান বেগমের যে ক্ষমতাটুকু ছিল, তাহা যে তিনি কেবল আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেন এ ধারণা ইতিহাস বিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বাদসাহের চরিত্র সংশোধন করিতে এবং তাঁহাকে রাজকার্য্যে সহায়তা করিতে তিনি কৃতসংকল্প ছিলেন। সম্রাট তাঁহার স্বলিখিত ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছেন যে ইং ১৬২১ খৃঃ অব্দে তিনি যখন বিষম ব্যাধিগ্রস্থ হয়েন তখন দয়িতার স্নেহ ও যত্নে তিনি রোগমুক্ত হয়েন। তাহার পূর্ব্বে সম্রাট অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন। তিনি সকল প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া রোগমুক্ত হইতে না পারিয়া হতাশ ভাবে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া সকল প্রকার ঔষধি বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু বোধ হয় পীড়ার ক্লেশ উপশমের জন্য তিনি অধিক মাত্রায় সুরাপান করিতে লাগিলেন। এই সময় নূরজাহানের ক্ষমতা তাঁহার উপর কার্য্য করিল। তিনি ঠিক পরিমিত পান ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া সম্রাটকে আবার সুস্থ করিলেন। এবং কথিত আছে যে সম্রাট নিজ মহিষার আদেশ মত কেবল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুরাপান করিতে পারিতেন। মহবত খাঁর সহিত তাঁহার কলহের সময় যে প্রকারে তিনি সম্রাটকে মহাবতের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন সে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আবশ্যক মত তিনি পুরুষোচিত বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি নিজ হস্তে ব্যাঘ্র শীকার করিয়াছিলেন এ কাহিনী তাঁহার স্বামীর লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বাদসাহ নামা নামক ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সম্রাট সাহজাহান বিমাতা নূরজাহানকে বাৎসরিক দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে দিতেন। কাফি খাঁ বলেন যে বিধবা হইবার পর পতিপরায়ণা সম্রাজ্ঞী আমোদ উৎসবে যোগদান করিতেন না এবং কেবল মাত্র দীনভাবে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আপন বৈধব্য যাপন করিতেন। ইংরাজী ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লাহোরে আপনার স্বামীর সমাধি মন্দিরের পার্শ্বে তিনি স্বয়ং আপনার সমাধি স্থল নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অতুলনীয় শারীরিক রূপরাশি তাঁহার পতির কবরের সন্নিধানে নিহিত হইয়াছিল।

কবিতা-কুঞ্জ।

প্রণয় কি স্বদেশ?

(আলাউদ্দীন রাজপুতানা আক্রমণ করিয়াছেন। একটী রাজপুত যুবক ও একজন রাজপুত যুবতী পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতেছিল।)

যুবক।

অয়ি রাণি! পৃথ্বী আজি শ্যামল-বসনা
শস্য-গন্ধ-শোভা-ভরা, তৃণ-তরঙ্গিতা—
বসন্তবাসরা মরি, কুসুম-আসনা
কল-কুঞ্জ-বন-ফুল্লা, প্রেম-পুলকিতা।
আমার হৃদয়-বন আজি মর্ম্মরিত
তোমার ও' তনু-ঘেরা অঞ্চলের বায়ে
আমার তৃষিত-মন, অতি ব্যাকুলিত
তোমার সৌরভ-ভরা নিশ্বাস-মলয়ে!

যুবতী।

ভুলে যাও, ভুলে যাও! অতীতের লেখা
মুছে ফেল হৃদি হতে। প্রেমের কল্পনা
তাজ সখা! সান্ধ্যাকাশে রবি-কর-রেখা
সম লুপ্ত হ'ক যত অতীত-জল্পনা!

যুবক।

হায় নারি! এত শীঘ্র ভুলে গেলে সব!
মনে কি পড়ে না তব, শৈশব-কাহিনী?
এখন স্বপন হায়,—কিবা আর ক'ব—
আজিকে রোধিতে চাও, সে প্রেম-কাহিনী
সেই গিরি-দরী-মূলে কত খেলা-ধূলা—
কত হাসি, কত গান, কত অভিমান
কত না মিলন হায়, কত ফুল-তোলা!
দিক-চক্রবালে রবি হ'ত অস্তমান—
ফুটিয়া উঠিত নভে, দীপ্ত তারা-পুঞ্জ!
আসিত হাসিয়া চাঁদ, মোরাও হাসিয়া
রহিতাম হাতে হাত, কুহুমিত-কুঞ্জ-
মাঝে; মাথার উপরে, কি গান গাহিয়া
উড়ে যেত পিক-দল, কে জানে কোথায়!
ব'য়ে যেত গিরি-নদী রাগিণী তুলিয়া
প্রকৃতির বীণে। সুখ-স্বপ্ন কভু হায়
ভোলা নাহি যায়।

যুবতী। থাম! শুনে মরি লাজে—
কেন তোল' বারবার, সে পুরাণো কথা,
ধেয়ে আসিয়াছে অরি, জন্মভূমি-মাঝে
এ' সময়ে বন্ধ কর, তব প্রেম-গাথা!
তার চেয়ে লও অসি, সাপটিয়া করে
ধেয়ে যাও উল্কাবৎ পাঠান নিপাতে—
হুঙ্কারি শার্দ্দূল-সম মহা-বীর্য্য-ভরে—
শত্রু-মুণ্ড কর খণ্ড করবাল-ঘাতে!

যুবক।

হোয়োনা বিমুখ সতী! এ ভুজ-বন্ধনে
বাঁধিব ও' কম তনু। তব রক্তাধর
করিব রক্তিম আজি সোহাগ-চুম্বনে!
হেথা নাই রণ প্রিয়ে, কেন বৃথা ডর!
তরুণ মর্ম্মরে এই প্রদোষ-আলোকে
নদী-কল-তানে আর বিহগ-বিরাবে—
মুখরিত বিশ্ব-কুঞ্জ পূরিত পুলকে—
প্রেম ছেড়ে রণে গিয়ে, কিবা ফল হবে!
এত শোভা, এত গান, আজি এই ভবে—
এ' শোভা-নন্দনে রাণী, বিলাও অমৃত!
প্রণয়-সঙ্গীতে শোন, আজি মত্ত সবে—
অনাহত একতানে নিখিল ছন্দিত!
এস অয়ি রূপ রাজী—

যুবতী। থাম! প্রেম চাও?
অথবা, স্বদেশ-মঙ্গল-আশে ধাইয়া
যাইবে সমরে?
যুবক। দাও, প্রেম-সুধা দাও
তাই ভাল!———
যুবতী। প্রেম চাও?
যুবক। হা' নিদয়া
এখনো বোঝনি মোরে!
যুবতী। বুঝেছি! বুঝেছি!
এই লও কর আলিঙ্গন মোর মৃত-
দেহে! প্রাণ-মন সব লুটায়ে দিয়েছি
একবার তব পদে। প্রণয় অমৃত
যদি,—লও লও—প্রেম-সুধা কর পান
আবার চরণে তব দিনু হৃদি-দান।
(বক্ষে ছুরিকাঘাত)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পুরাতন।

কে যাগিছ সুখশান্তি প্রথম বেলায়—
নিতান্ত কিঞ্চিতে তুষ্ট তুচ্ছ সাধনায়!
কে মাতা চাহিছ পুত্রে শিশুটী তোমার
ইচ্ছায় ফিরিবে সদা পূর্ণ সুধাধার!
কে বন্ধু যাচিছ চির হৃদয় উদার—
ভাবে অভাবে তব সম বেদনার!
কে প্রেমিকা ভাবিতেছ প্রেম-দেবতার
রাগদীপ্ত পুষ্পরূপ একান্ত তোমার!
ধীরে তারা কোন পথে গিয়াছে চলিয়া—
আর না আসিবে কভু আবার ফিরিয়া
নর নারী চলিয়াছে নব নব পথে—
কত ভাবে, কত ভাবে, কত মনোরথে!
ঘাতে প্রতিঘাতে নিত্য চলেছে সংসার
স্মৃতি মাত্র পুরাতন সম্বল তোমার!

শ্রীউমাচরণ ধর।

সাহিত্য-সমাচার।

ভারতী—ভাদ্র, ১৩১৬। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের "আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়" এবারের শ্রেষ্ঠ ও মনোহারী নিবন্ধ। তাঁহার সর্ব্বপ্রতিভা জয়যুক্ত হোক! শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদিত সন্দর্ভ "স্বামী শীলানন্দ" বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের "নিবেদন" নামক কবিতার একটু পরিচয় লউন:—

"এনেছি আজ কুড়ায়ে" (আট অক্ষর)
"অমর করা ধুলায়-এ।" (নয় অক্ষর এবং মিল!)

যিনি "কুড়ায়ে" ও "ধুলায়-এ" মিল রক্ষা করিয়া অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পারেন, তিনি যে কবি সে বিষয়ে 'সন্দেহ নাস্তি!' "দিদিমার বিরক্তি", পাঠকেরও বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে। লেখিকার প্রতি সবিনয় অনুরোধ তিনি কৃপাপরবশ হইয়া পাঠককে এই "বিরক্তি" হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করুন। "ডেনমার্কে কৃষকদের উচ্চশিক্ষা" নামক প্রবন্ধটী জ্ঞানগর্ভ। "বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা" সম্পাদিকার রচনা। যাঁহারা হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের

গণ্ডীতে কখনো পা দেন নাই, হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের এইরূপ অযাচিত মাথা ব্যথা দেখিলে, "মাছের শোকে বিড়ালের কান্না"র কথাই মনে পড়িয়া যায়। "পাক-চক্র" লিখিবা, সম্পাদিকা বোধ হয় শপথ করিয়া বসিয়াছেন যে, বেচারা পাঠকগণকে এই ক্রম-বর্দ্ধমান মাসিক 'পাক' হইতে কোনক্রমেই অব্যাহতি দিবেন না। একস্থলে স্বামী পত্নীর মানভঞ্জনার্থ নানাপ্রকার 'ঘাট' মানিয়া সোহাগ করিয়া বলিতেছেন—

"——সকল দুঃখ ঘুচো,
অধীন তোমার দাসানুদাস, শ্রীচরণের ছুঁচো।"

সুপ্রসিদ্ধ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকার লেখনী হইতে এরূপ বটতলার রসিকতা প্রসূত হইতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। যদি বঙ্গ-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ উপকার করণেচ্ছায় এই লেখা প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বেদব্যাসের কলম বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করি; কিন্তু যদি লেখার অনাটনে, কাগজ ভরাইবার জন্য ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলি না হয় ভারতীর কয়খানা পৃষ্ঠা খালি রহিত তাহাতেও যে পাঠকগণ অধিকতর উপকৃত হইতেন। "ঝড়ের রাতে" কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথের একটী একান্ত অস্পষ্ট কবিতা। হায়! ভাস্বর 'রবীন্দ্র'-প্রতিভার আজ একি অধঃপতন! এরূপ অস্পষ্ট কবিতা সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী, তাহা অস্বীকার্য্য নয়। "বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারত-কথা" মন্দ নহে; শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মেঘের প্রতি" নামক কবিতাটী মন্দ হয় নাই। ভারতীর ললাটে চিত্র-জ্যোতিঃ ক্রমেই ম্লান হইয়া যাইতেছে। প্রথমেই শ্রীযুত নন্দলাল বসু অঙ্কিত তিন রঙে ছাপা 'চৈতন্যের' ছবি। আমরা এই চিত্রখানির নামকরণ করিয়াছি, "চৈতন্যের প্লীহা-পীড়া।" কারণ ছবিখানি দেখিলে, তাহাতে "ভগবৎ-প্রেমে তন্ময়তা" আবিষ্কার করা ভগবানেরও অসাধ্য, অন্য পরে কা কথা। আমাদের মনে হয়, এই চিত্র-চৈতন্যের প্লীহায় হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, আর তাহারই যাতনায় তিনি পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে ছট্‌ফট্ করিতেছেন এবং নিদারুণ কষ্টে তাঁহার "চোখ দুটির প্রান্তে যেন তাঁহার সমস্ত প্রাণটা আসিয়া ঠেকিয়াছে!" সৌন্দর্যই সত্য; চিত্রকরগণ সেই সত্যের উপাসক এবং অনুনেতা। অস্বাভাবিকতায় সৌন্দর্য্য থাকিলে তাহা অবলম্বনীয় বটে, কিন্তু অপ্রাকৃতিকতার অনুরঞ্জনে যেখানে সেই সত্য সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে কে তাহার সমর্থন করিবে? চিত্র-লিখিত চৈতন্যের বিসর্পিত অঙ্গুলীগুলি এবং তাঁহার অদ্ভুত ওষ্ঠের অন্তরালে সে সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি কোথায়, তাহা আমরা বহু গবেষণার পরও স্থির করিতে পারিলাম না। হয়ত আমাদের পাপ চক্ষুতে এ সৌন্দর্য্য অগোচর!

মানসী—শ্রাবণ, ১৩১৬। ইহা একখানি নব প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ইহার ছাপা, কাগজ, বাহ্য সৌন্দর্য্য সবই মনোরম। আমরা সাদরে মানসীকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। বর্ত্তমান সংখ্যার প্রারম্ভেই বঙ্গসাহিত্যের গুরু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি হাফ্‌টোন ছবি সংযুক্ত হওয়ায় পত্রিকাখানি পবিত্র হইয়াছে।

"বিদ্যাসাগর তর্পণ"—একটী সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক একস্থলে বলিতেছেন—"নিখুঁত আদর্শ, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সমক্ষে আদর্শ ছাত্র বিদ্যাসাগর—কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীন চেতা,

নিরন্ত কর্ম্মশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বিদ্যাসাগর আদর্শরূপে দণ্ডায়মান। দীন দুঃখীর দুঃখ মোচনে ও বিপন্নের বিপদুদ্ধারে বিদ্যাসাগর আদর্শরূপে দণ্ডায়মান। বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধবাসরে বিদ্যাসাগরের গুণাবলীর অনুধ্যান কর, তোমার ও সঙ্গে সঙ্গে তোমার জাতীয় জীবন উন্নত হইবে, ধন্য হইবে।" আমরাও লেখকের মতে মত মিলাইয়া বলি—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। 'বিরহ-মাধুরী'—কবিতাটী মন্দ হয় নাই। 'জাপানে স্ত্রী-চরিত্র'—ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এই সংখ্যায় লেখক দুইটী জাপানী রমণীর বুদ্ধিমত্তার ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। একটীর গল্পাংশ—একজন রুসিয়ান কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে জাপানে আসিয়াছিলেন। একদা তিনি একজন ধীবরকে বলেন যে তিনি মৎস্য ধরিবার জন্য তাহার সহিত সমুদ্রে যাইতে ইচ্ছুক। ধীবর তাহার কথায় সম্মত হইল। যখন রুসিয়ান উক্ত প্রস্তাব করেন তখন ধীবরের একটী কন্যা তথায় উপস্থিত ছিল। রুসিয়ানটী প্রস্থান করিলে ধীবর-কন্যা ধীবরকে বলিল যে বৈদেশিককে যেন সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে কোন সন্ধান লইতে দেওয়া না হয়। কন্যার বুদ্ধিমত্তায় ধীবর বিশেষ প্রীত হইল। পরে এই সংবাদ যখন গবর্ণমেণ্টের গোচর হইল তখন ধীবর কন্যা একজন প্রকৃত স্বদেশভক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

অন্যটীর গল্পাংশ—এক বৃদ্ধার একমাত্র যুবক সন্তানকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করা হইলে সে তাহার মাতার নিকট গিয়া বলে—"মাতঃ, আমার যুদ্ধে যাইবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে নিঃসহায় অবস্থায় আপনাকে রাখিয়া আমার যুদ্ধে যাইতে মন অগ্রসর হইতেছে না, এ অবস্থায় আমি কি করিব।" বৃদ্ধা কোনও উত্তর না দিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিলেন। পত্রে লেখা ছিল—"বৎস, তোমার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার মন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া আমি মর্ম্মব্যথা পাইয়া আত্মহত্যা করিলাম। তুমি জগতে নগণ্য এক বৃদ্ধার জন্য তোমার এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের ও তোমার দেশস্থ সকলের অর্চ্চনীয় জন্মভূমিকে তুচ্ছ করিলে! ধিক্‌ এই বংশে! আর ধিক্‌ তোমার গর্ভধারিণীকে!" ঠিক এই ভাবের অনেক কথা রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় রাশি রাশি সাপ্তাহিক ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল সুতরাং ইহাতে নূতনত্ব দেখিলাম না, তবে নবপ্রকাশিত 'মানসীর' পক্ষে ইহা নূতন হইতে পারে। পরন্ত এরূপ রমণী-চরিত্রের দৃষ্টান্ত ভারতেও বিরল নহে।—তবে ভাল কথা, পুরাতন হইলেও চিরকালই ভাল। "উল্কা"—প্রবন্ধটী মন্দ নহে; সাধারণ পাঠকের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হইবে আশা করা যায়, তবে স্থানে স্থানে অসংলগ্ন দোষ দুষ্ট। "পদ্মলোচন"—কবিতাটী আমাদের ভাল লাগিল না। "নিমন্ত্রণ-রক্ষা"—এই দ্বাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী গল্পটী পাঠ করিয়া ইহার সারাংশ বিবৃত করিতে পাঁচ সেকেণ্ডেরও অধিক সময় লাগে না। উপরন্ত ইহাতে না আছে চরিত্রবিকাশ না আছে লেখার আকর্ষণী শক্তি। ইহা একটী ব্যর্থ রচনা। "চুম্বন"—কবিতা। লেখক একস্থলে লিখিতেছেন—

"গঙ্গা-যমুনার অই চুম্বনের স্থলে
প্রয়াগের পুণ্য তীর্থ আছে প্রতিষ্ঠিত।

ক্ষিতি-অপ্-তেজ-বায়ু-ব্যোমের চুম্বনে
ব্যষ্টি মিশে হয় বিশ্বে সমষ্টি গঠন,
চুম্বনই সৃষ্টির বীজ নশ্বর ভুবনে............?
বিধাতার মহানন্দ পবিত্র চুম্বন।"

কবি 'সঙ্গম' বা 'মিশ্রণ'কে' চুম্বন বলিতে চাহেন। বলুন তাহাতে ক্ষতি কি, এযে কবি-কল্পনা! "বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃকাহিনী"—বড়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে। "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অষ্টধাতু নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির বিবরণ" এবং একখানি হাফ্‌টোন ছবি দেওয়া হইয়াছে। ঠিক এইরূপ একখানি রজত-নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির ছবি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

নব-দর্শন—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ইহা একখানি নব প্রকাশিত মাসিক পত্র; আমরা ইহাকে সাদরে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথমে "আত্ম-নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদক বলিতেছেন—"এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র ও মহৎ উভয়েরই একটা স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা আছে, তাই উভয়েরই অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিনা প্রয়োজনে, বিনা উদ্দেশ্যে কিছুরই সত্বা থাকিতে পারে না। ক্ষুদ্র হউক আর মহৎ হউক, বিধাতার রাজ্যে সকলেরই স্বতন্ত্র দাঁড়াইবার স্থান আছে, সকলেরই কর্ত্তব্য সাধনের বা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির একটি বিশেষ পথ আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবেই তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিবে এবং মহৎও তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য স্বীয় স্বভাব নির্দ্দেশিত পন্থার অবলম্বন করিবে,—ইহা প্রকৃতির নিয়ম, ইহা ভগবানের সৃষ্টি কৌশল। সাহিত্যও এ নিয়মের বহির্ভূত থাকিবে কেন?" "মণ্টিপিলার বিশ্ববিদ্যালয়"—প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। "অঙ্গহীনা"—(গল্প) লেখায় আকর্ষণী শক্তি আছে, পাঠ করিতে চক্ষে জল আইসে। "তেজারতি"—শীর্ষক প্রবন্ধে তেজারতি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কোন কথারই অবতারণা করা হয় নাই তবে এই প্রবন্ধের অন্তর্ভূত আখ্যায়িকাটুকু শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ। "জীনাত মহল"—ইনি হিন্দুস্থানের শেষ মোগল বাদসাহ বাহাদুর সাহের বেগম ছিলেন। ইনি শেষ জীবনে স্বীয় পতির সহিত রেঙ্গুন হইতে ১৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত টঙ্গু নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে পতির সেবা করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করেন। ইহা এত ক্ষুদ্র যে পাঠে আদৌ তৃপ্তিলাভ করা যায় না। ইহা একটু বিশদ হইলে এবং জীনাত মহলের কথা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইলে ভাল হইত। বর্ত্তমান সংখ্যায় কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই তবে প্রবন্ধগুলি সুনির্ব্বাচিত।

দেশপূজ্য, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্মানিত প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী" পত্রের মন্তব্য—

Chitravali— * * * Remarkable for style and exhibits a characteristic originality which is commendable. The heroes and heroines are not of the ordinary type and scenes of action are various. The paintings are truly realistic and we have no hesitation in declaring the title of the book to be appropriate. * * *

ময়মনসিংহ জিলার মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ "চারুমিহিরে" প্রকাশিত হইয়াছে—

চিত্রাবলীর কাগজ, ছাপা এবং বহিরাবরণ মনোরম। রবিবাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কয়েকজন সুলেখক বঙ্গভাষায় কয়েকখান সুন্দর গল্পের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; চিত্রাবলী তাহার মধ্যে অন্যতর। এই সমস্ত গল্পের সৌন্দর্য্যে বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা চিত্রাবলী পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। চিত্রাবলীর গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক ও লিপি কৌশল প্রশংসনীয়। সৌন্দর্য্য এবং বৈচিত্র্যহীন গল্প পাঠ করিতে পাঠকের ক্লান্তি অনুভব হয়; চিত্রাবলী পাঠে তাহা হইবার আশঙ্কা নাই। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, চিত্রাবলী পাঠে বঙ্গীয় পাঠক সুখী হইবেন।

প্রখ্যাতনামা লেখক ও সমালোচক, সুপ্রসিদ্ধ "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম" প্রণেতা, "উপাসনা" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র

সদ্‌গুণভূষিতেষু—

আশীর্ব্বাদ নিবেদন,

* * * 'চিত্রাবলী' আমি পড়িয়াছি। মোটের উপর পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পেরই আখ্যান-বস্তু ভাল, রচনায় নিপুণতা আছে। যে সকল পাঠক গল্প পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহাদের যে এই পুস্তক চিত্তাকর্ষক হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। * *

শুভাকাঙ্ক্ষী—

(স্বাক্ষর) শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

চিত্রাবলীর মূল্য ১৲ টাকা ভিঃ পিঃতে ১৶০ আনা।

অর্চ্চনা কার্য্যালয়
১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,
অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস, কলিকাতা।

শ্রীউমাচরণ ধর
কার্য্যাধ্যক্ষ, অর্চ্চনা।

কলিকাতা ৫।১২ সুকীয়া ষ্ট্রীট মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ।] কার্ত্তিক ১৩১৬। ৯ম সংখ্যা।

October 1909.

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [ডাঃ মাঃ লাগে না।

বঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তি।

সৌধাদি।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের পুরাতন কীর্ত্তির কোন চিহ্ন নাই। বলরামের রাজগৃহ রাজমহলে ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, কিন্তু সে রাজ-গৃহের তিলমাত্র নিদর্শন নাই। যে সকল ভগ্নাবশেষ তথায় এক্ষণে দৃষ্ট হয়, তাহার কতকগুলি মানসিংহ এবং কতকগুলি ফতেখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়; কিন্তু রাজা মানসিংহ নির্ম্মিত সুন্দর সৌধাবলীর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। ফতেখাঁ নির্ম্মিত জুম্মা মসজেদের কিয়দংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সুলতান সুজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কতকগুলি প্রাসাদ, সিংহদালান নামক প্রস্তরময় বৃহৎ কক্ষ এবং ফুলবাড়ী নামক উদ্যানের ভগ্নাংশ এখনও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক মুসলমান নরপতিগণ যে সকল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আকীর্ণ হইয়াছে।

তেলিয়া গড়—সাহেবগঞ্জের ৭ মাইল পশ্চিমে তেলিয়া গড় বা গড়ি নামক স্থানে একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা পুরাকালে ভাগীরথীর উপকূলে স্থাপিত ছিল। এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা কে তাহার কোন নিদর্শন নাই।

কাঁহাল গ্রামে একটি মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

বৈদ্যনাথ—দেওঘর মহকুমায় হিন্দুদের অনেক পুরাতন কীর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বৈদ্যনাথের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। বৈদ্যনাথ দ্বাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে অন্যতম মহালিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গ কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে পণ্ডিত বৈজুমাহাতা কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। এই লিঙ্গের মস্তকে একটি দাগ আছে। প্রবাদ এই যে, রাবণ মহাদেবের মস্তকে যে চপেটাঘাত

করেন ইহা সেই চপেটাঘাতের চিহ্ন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ইহা রাবণ রাজার সমসাময়িক। ইহা কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন। এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার পর ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উপরোক্ত পণ্ডিত সম্ভবতঃ সেই সময়ে ইহা স্থাপিত করেন। বৈদ্যনাথের মন্দির ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা পুরাণমল্ল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। রাজা পুরাণমল্ল গিরিধিরাজ বীর বিক্রমসিংহের নবম বংশধর। বিক্রমসিংহ ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে গিরিধিরাজবাটী প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণমল্লের পঞ্চম বংশধর ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজিহানের নিকট রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

বৈদ্যনাথের মন্দির প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে তিনটী প্রবেশ দ্বার আছে, পূর্ব্বদিকে একটী, উত্তরে এক টী ও পশ্চিমে একটী। প্রাচীরের অভ্যন্তরে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গন ভূমি ; মধ্যস্থলে মন্দির বিরাজিত। ইহা দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত রুচি ও রীতি অনুসারে নির্ম্মিত। প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরটী দেখিলে দুর্গাকারে নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাঙ্গন ভূমির চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর-সংলগ্ন অপর কতকগুলি দেবমন্দির আছে ; তাহাতে কালী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, আনন্দভৈরব, রাম, লক্ষ্মণ ও জানকী, নীলকণ্ঠ, পার্ব্বতী, বগলা, সূর্য্য, সরস্বতী, কালভৈরব, সন্ধ্যাদেবী ও গণপতি প্রভৃতি দেবদেবী বিরাজিত। শিব রাত্রির সময়ে বৈদ্যনাথে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়। মন্দিরের অনতি-দূরে শিবগঙ্গা নামক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তাহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরমণ্ডিত। ইহাও পুরাতন বলিয়া প্রতীতি হয়। মন্দির হইতে কয়েক মাইল দূরে এক তপোবন আছে। ইহার দৃশ্য বড়ই মনোরম।

মদনপাল শিবির—দেওঘর মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যনাথ জংশন নামক রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে মদনপাল শিবির নামক রাজার নির্ম্মিত কতক-গুলি স্তম্ভ ও দেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। এ গুলিও আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না।

সক্রিগলি—সক্রিগলিতে এক মুসলমান ফকিরের শ্বেতবর্ণের একটি সমাধি মন্দির আছে। উহা পর্ব্বত শিখরে সংস্থাপিত। প্রস্তরময় সমতল ভূক্ষেত্রে উহার ভিত্তি প্রোথিত। এই মন্দিরের চতুর্ভিত প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে সুন্দর কারুকার্য্য সমন্বিত একটি প্রবেশ দ্বার আছে। উপবেশনের জন্য সমাধির চতুর্দ্দিকে মঞ্চবৎ প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চাসন আছে। মন্দিরটী চতুষ্কোণ। উহার উপরিভাগ বর্ত্তুলাকার সুন্দর ছাদ দ্বারা আবৃত।

ইহা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। কালের করালগ্রাসে ইহার কোন অংশ বিপর্য্যস্ত বা লয়প্রাপ্ত না হইয়া এখনও সম্পূর্ণাবয়বে বর্ত্তমান আছে।

গয়বীনাথ—সুলতানগঞ্জের পর্ব্বতের উপরিভাগে গয়বীনাথ নামধেয় শিবের প্রস্তরময় একটী মন্দির আছে। মন্দিরের গাত্রে কিছু লেখা না থাকিলেও ইহা ৩০০ বা ৪০০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয় না। পর্ব্বতের গাত্রে অনেকগুলি পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই মন্দিরের নিকট বৌদ্ধদের অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছে, কিন্তু কালসহকারে উহা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রদেশ পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদের অধিকৃত ছিল, পরে হিন্দুগণ আসিয়া এখানে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন।

সুলতানগঞ্জে বৌদ্ধ কীর্ত্তি—সুলতানগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসন ও জাঙ্গিরা কেবল মাত্র অর্দ্ধ মাইল স্থান ব্যবধান। এই অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে পুরাতন প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ স্থলের পুরদ্বার, প্রাসাদ, সৌধ, স্তম্ভ প্রভৃতির ভিত্তি দৃষ্টে বোধ হয় যে সারনাথ, শাচী, বুদ্ধগয়া, মাণিক্যালয় প্রভৃতির ন্যায় এখানেও বৌদ্ধদের একটি বিহার ছিল। সেই বিহারের চতুষ্কোণে বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বাসের নিমিত্ত চারিটী ধর্ম্মশালা ছিল। এই বিহার যে ইষ্টকে নির্ম্মিত হইয়াছিল ঠিক তদনুরূপ ইষ্টক খৃষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টাব্দের ৬০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিত। ইহা দ্বারা বিহার কোন্ সময়ে নির্ম্মিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিহার যে উপরোক্ত সময়ের বহুকাল পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল, তাহা তথাকার দেবমূর্ত্তির গাত্রে গুপ্ত ভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে বোধগম্য হইবে যে,খৃষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্বে এই বিহার স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে নিশ্চয়ই বিহার সংস্থাপিত ছিল, কারণ এখানে বুদ্ধদেবের ৭ ফুট উচ্চ এক মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। বক্তা বক্তৃতার সময়ে যেরূপ হস্ত উত্তোলন করে, ইহার দক্ষিণ হস্ত সেইরূপ উত্তোলিত, আর বাম হস্ত দ্বারা দেহের আচ্ছাদন বস্ত্রের অগ্রভাগ তিনি ধারণ করিয়া আছেন। হস্তদ্বয়ে পদ্মফুল অঙ্কিত এবং কর্ণদ্বয় চিত্র বিশিষ্ট। ওষ্ঠাধর সূক্ষ্ম, মুখ বর্ত্তুলাকার। কপালে গোলাকার তিলক আছে। এই মূর্ত্তি তাম্র নির্ম্মিত। দেহটী দুই খণ্ডে নির্ম্মিত; মস্তক হইতে বক্ষঃস্থল এক খণ্ড এবং বক্ষঃস্থল হইতে কোমর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড। হস্তদ্বয়, পদদ্বয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র খণ্ডে নির্ম্মিত। এই তাম্রময় মূর্ত্তির ঠিক অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত

উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হয়। হেমতাবাদে এক মুসলমান ফকিরের সমাধি মন্দির ও কয়েকটী মসজিদ আছে। তন্মধ্যে একটি পূর্ণাবয়বে বর্ত্তমান। অবশিষ্ট গুলির ভগ্নাবস্থা। ভাগীরথী তীরে কটরা নামক প্রদেশে মুরসেদকুলী খাঁর কীর্ত্তি-স্তম্ভ আছে, কিন্তু উহা লয়প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাবা নামক প্রদেশে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। দিল্লীর সম্রাট প্রদত্ত জায়গীর ভূমির উপসত্বে সময়ে সময়ে উহার রীতিমত সংস্কার হওয়াতে উহা এখনও পর্য্যন্ত পূর্ণাবয়বে বর্ত্তমান। নুরুল্লাবাদে সাবার খাঁ কর্ত্তৃক কাসম খাঁর মসজিদ নির্ম্মিত হয়। ইহা অতি প্রাচীন। সাবার খাঁ ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, কিন্তু মুরশিদাবাদের জনৈক বেগমের প্রেমে আসক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কুতবসার সমাধি মন্দিরের নিকট কয়েকটী সমাধি মন্দির আছে। তদুপরি পারস্য ভাষায় লিখিত অক্ষর খোদিত আছে।

শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মণিভূষণ চলিয়া যাইবার পর গোবিন্দরাম ছবিখানি আমায় দেখাইয়া বলিলেন, "ডাক্তার, ইহাতে কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাও ?"

আমি এই কথায় ছবিখানি আবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম, কই, এমন কি বিশেষত্ব ইহাতে আছে, বরং ছবি দেখিলে লোকটী খুব ভাল মানুষই বোধ হয়। এই লোক হইতে যে এরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে, তাহা ছবি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না।

আমি বহুক্ষণ ছবিখানি বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিলাম, "কই,—এমন কিছু বিশেষত্ব তো দেখিতে পাইতেছি না।"

তিনি বলিলেন, "ইহার সহিত কাহারও আকৃতির কিছু সাদৃশ্য আছে, এমন বোধ হয় ?"

"কই, বিশেষ কিছু এমন দেখিতেছি না।"

"আরও ভাল করিয়া দেখ,—মুখের নীচের দিকটা খুব ভাল করিয়া দেখ।"

আমি তাঁহার কথামত আবার ছবিখানি বিশেষ করিয়া দেখিলাম,—সহসা আমি বিস্মিতস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "সত্যই তো—তাহাই তো।"

তখন আমি স্পষ্ট সদানন্দের মুখ সেই ছবিতে দেখিতে পাইলাম। গোবিন্দরাম বলিলেন, "এখন তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইতেছ? আমি প্রথমেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যে ডিটেক্‌টিভ হইতে চাহে, তাহার বিভিন্ন মুখের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে শিক্ষা করা প্রথম আবশ্যক।"

"কি আশ্চর্য্য! এখন দেখিতেছি, এখানা ঠিক যেন সদানন্দের ছবি।"

"হাঁ—ইহাতেই পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস হয়। ইহাতে বোধ হয়, বহু বৎসর পরে এই লোক সদানন্দ হইয়া জন্ম লইয়াছে। অন্য কিছু না হউক, এখন নিশ্চিত জানা গেল যে, সদানন্দেরও এই রাজবংশে জন্ম।"

"তাহাই জমিদারী পাইবার জন্য এই সকল ভয়ানক কাণ্ড করিতেছে।"

"নিশ্চিত,—এই ছবি দ্বারাই তাহার মতলব জানা গেল,—এত দিন পরে আমরা তাহার উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাইলাম। এখন আর সে যায় কোথায়?"

এই বলিয়া গোবিন্দরাম হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "শঠে শাঠ্যং—এই চির নিয়ম।"

* * *

আমি পরদিন প্রাতে অতি প্রত্যূষে জাগরিত হইলাম। জাগিয়া দেখিলাম, আমার আগেই গোবিন্দরাম উঠিয়াছেন। আমায় দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "আজ সমস্ত দিন অনেক কাজ আছে, জাল ঠিক ফেলা হইয়াছে, এখন কেবল ঠিক করিয়া টানিয়া তুলিতে পারিলেই হয়। আজ রাত্রি গত হইবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিব যে, আমাদের জালে কাত্‌লা পড়িয়াছে, না জাল ছিঁড়িয়া পালাইয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার মধ্যে কি মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলে?"

"হাঁ, পুলিসে হারুর বিষয় খবর দিয়াছি, সে বিষয়ে আর কোন গোল হইবে না, আর আমার ছোকরাকেও খবর দিয়া আসিয়াছি, না হইলে সে আমার জন্য ভাবিত।"

"এখন কি করিবে মনে করিতেছ?"

"প্রথমে মণিভূষণের সঙ্গে দেখা করা আবশ্যক। এই যে তিনিই আসিতেছেন।"

মণিভূষণ নিকটে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু, আপনাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন সেনাপতি যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিতেছেন।"

গোবিন্দ। কতকটা ঠিক তাহাই—ডাক্তার হুকুম চাহিতেছে।

মণি। আমিও তাহাই।

গো। তাহা হইলে আপনি আজ রাত্রে সদানন্দ বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতেছেন ?

ম। হাঁ—আপনিও নিশ্চয়ই যাইবেন, তাহারা খুব ভদ্রলোক।

গো। না—আমাকে ও ডাক্তারকে এখনই কলিকাতায় রওনা হইতে হইবে।

ম। বলেন কি ?

গো। বিশেষ কাজ আছে।

মণিভূষণের মুখ বিষণ্ণ হইল, তিনি দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "আমার আশা ছিল, আপনারা আমাকে এই গোল হইতে নিষ্কৃতি দিয়া কলিকাতায় যাইবেন। বুঝিতেই ত পারিতেছেন, এখানে একা থাকা বড় সুখের নহে।"

গো। আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং আমার উপর নির্ভর করুন, আমি যাহা বলি, তাহাই করুন। জানিবেন, আমি যাহা করিতেছি, আপনার ভালর জন্যই করিতেছি। সদানন্দ বাবুকে বলিবেন যে, আমরা দুইজনে বিশেষ কাজে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় যাইতেছি, এ কথাটা তাঁহাকে বলিতে কিছুতেই ভুলিবেন না।

ম। আপনি যদি বলেন—তো অবশ্যই বলিব।

গো। হাঁ—আমার বিশেষ অনুরোধ।

ম। তাহা হইলে আপনাদের যাইতেই হইবে ?

গো। উপায় নাই।

মণিভূষণের মুখ বিষণ্ণ হইল, তিনি বলিলেন, "কখন তাহা হইলে যাইবেন মনে করিতেছেন ?"

গো। এই যত শীঘ্র হয়,—তবে ডাক্তার যে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার সমস্ত জিনিষ-পত্র এখানে থাকিল।

তাহার পর তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, তোমারও নিমন্ত্রণ ছিল না ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ—ছিল, কিন্তু যাইতে পারিতেছি কই ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহা হইলে এক কাজ কর—এখনই তাঁহাকে একখানা পত্র লিখ।"

আমি বলিলাম, "যখন তুমি বলিতেছ, তখন এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিতেছি।"

মণিভূষণ বলিলেন, "আমারও ইচ্ছা হইতেছে, আপনাদের সঙ্গে কলিকাতায় যাই, এই ভয়ানক স্থানে একা থাকিয়া লাভ কি ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনার এখানে থাকা কর্ত্তব্য—আরও কথা হইতেছে, আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, আমি আপনাকে যাহা করিতে বলিব, আপনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা করিবেন। আমি আপনাকে এখানে থাকিতে বলিতেছি।"

মণিভূষণ হতাশভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে কাজেই থাকিব।"

গো। আরও একটা কথা—রাত্রে আপনি হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিবেন।

ম। অত রাত্রে একা মাঠ দিয়া ?

গো। হাঁ—প্রয়োজন আছে।

ম। আপনিই ইহা কতবার নিষেধ করিয়াছেন।

গো। হাঁ—কিন্তু এবারে আপনার কোন ভয় নাই—আমার বিশ্বাস আপনার সাহসের অভাব নাই, তবুও নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এ অনুরোধ করিতাম না।

ম। কাজেই তাহাই হইবে।

গো। আরও এক কথা,—দেখিবেন, কোন মতে সোজা পথ ছাড়িয়া অন্য পথে যাইবেন না।

ম। আপনি যাহা বলিতেছেন—ঠিক তাহাই করিব।

গো। এখন এই পর্য্যন্ত,—এখন আমরা রওনা হই।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি গোবিন্দরামের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলাম। আমার মনে পড়িল, গোবিন্দরাম গত রাত্রে একবার সদানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কালই কলিকাতায় ফিরিবেন, কিন্তু তিনি আমাকেও যে সঙ্গে লইবেন, তাহা আমার মনে হয় নাই। তিনি নিজেই বলিতেছেন যে,

মণিভূষণের ঘোরতর সঙ্কট কাল উপস্থিত, অথচ তাঁহাকে একা ফেলিয়া, আমাকে পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া এরূপভাবে কলিকাতায় ফিরিতেছেন কেন, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে তাঁহার স্বভাব আমি জানিতাম, তাঁহার কথায় আপত্তি করা বৃথা, কাজেই আমরা দুইজনে বিষণ্ণ মণিভূষণকে রাখিয়া তাঁহারই গাড়ীতে রেল ষ্টেশনের দিকে চলিলাম।

ষ্টেশনে আসিলে এক ছোকরা আসিয়া বলিল, "কোন্ হুকুম ?"

"হাঁ—এই গাড়ীতে পরের ষ্টেশনে গিয়া রাজা মণিভূষণকে এই টেলিগ্রাফ-খানা পাঠাইয়া দিয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিবে।"

টেলিগ্রাফে গোবিন্দরাম লিখিয়াছেন, "আমার জরুরি পকেট বই ফেলিয়া আসিয়াছি। শীঘ্র ডাকে কলিকাতায় পাঠাইবেন।"

তিনি তখন মণিভূষণের গাড়ী বিদায় করিয়া দিলেন, ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া তাঁহার নামে কোন তার আছে কি না অনুসন্ধান করিলে, তার বাবু একখানি টেলিগ্রাফ তাঁহাকে দিলেন। তিনি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে দিলেন, আমি পড়িলাম,——"তার পাইয়াছি। এই গাড়ীতে রওনা হইলাম। নাম শূন্য ওয়ারেণ্ট সঙ্গে লইয়াছি। ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টর—অক্ষয়।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "অক্ষয় বাবুর সাহায্য এক্ষণে আমাদের দরকার হইয়াছে, তাঁহার আসিবার এখনও বিলম্ব আছে,এখান হইতে দেবগ্রাম বেশীদূর নয়, চল একখানা গাড়ী করিয়া গিয়া তোমার নবদুর্গার সঙ্গে দেখা করিয়া আসা যাক্।"

তাঁহার উদ্দেশ্য এখন আমি অনেকটা বুঝিলাম। ;তিনি মণিভূষণকে দিয়া সদানন্দের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মাইবেন যে, আমরা দুইজন প্রকৃতই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছি। ছোকরা যে টেলিগ্রাফ পাঠাইবে, তাহার কথা মণিভূষণের নিকট শুনিলে সদানন্দের এ সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। তাহার পর তিনি একটা কৌশল বিস্তার করিতেছেন, তাহা এতক্ষণে আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম।

নবদুর্গার সহিত দেখা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না, সে পূর্ব্বের ন্যায় ঘোমটায় কতক মুখ ঢাকিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। গোবিন্দরাম অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "আমরা মৃত রাজা অহিভূষণের মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি। আমার এই বন্ধুটীকে তুমি মৃত রাজার বিষয় যতদূর যাহা বলিয়াছ, ইনি তাহা সমস্তই আমাকে বলিয়াছেন,আর যাহা বল নাই,তাহাও বলিয়াছেন।"

নবদুর্গা বলিল, "আমি এমন কিছু বলি নাই।"

গোবিন্দ। তুমি স্বীকার করিয়াছ যে, তুমি রাত্রি দশটার সময় গড়ের সাঁকোর নিকট তাঁহাকে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পত্র লিখিয়াছিলে, আর ঠিক সেই সময়ে সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, ইহার কারণ কি তুমি বল নাই।

নব। ইহার কারণ আমি কিছুই জানি না।

গো। কারণ বিশেষ আছে, দেখ বাছা, তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করিতে ইচ্ছা করি না, আমাদের বিশ্বাস, রাজা খুন হইয়াছেন ইহার জন্য তুমি ও তোমার বন্ধু সদানন্দ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী তিন জনেই বিপদে পড়িতে পারেন।

ন। সদানন্দ বাবুর স্ত্রী?

গো। হাঁ—ইহা এখন আর গোপন নাই। তিনি যাহাকে নিজের ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দেন—সে স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্ত্রী।

নবদুর্গা কিয়ৎক্ষণ কথা কহিল না, কেবল অর্দ্ধস্ফুটস্বরে দুই তিনবার বলিল, "মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা,—সে আমাকেই——"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "মিথ্যাকথা নহে,—সম্পূর্ণ সত্য কথা——"

এই বলিয়া সদানন্দের পূর্ব্ব ইতিহাস সমস্তই তাহাকে বলিলেন,—নবদুর্গা একটী কথাও বলিল না, নীরবে শুনিয়া গেল।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এখন এই লোকের চরিত্র বুঝিতে পারিলে? ইহার সঙ্গে জড়িত থাকিলে বিপদে পড়িবে, যাহা জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত সত্য বলিলে বিপদের আশঙ্কা নাই।"

"কি জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন।"

"রাজাকে তুমি সদানন্দের পরামর্শে পত্র লিখিয়াছিলে?"

"হাঁ—তিনি যাহা লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহাই লিখিয়াছিলাম।

"সদানন্দ তোমাকে বলিয়াছিল যে, দেখা করিলে রাজা তোমাকে সাহায্য করিবেন?"

"হাঁ—তখন আমি বড় কষ্টে পড়িয়াছিলাম।"

"পত্র লেখার পর সেই তোমাকে রাজার নিকট যাইতে নিষেধ করে?"

"হাঁ—তিনি বলিয়াছিলেন, ইহাতে দশ জন দশ কথা বলিতে পারে, বিশেষতঃ তাঁহার কিছু টাকা আসিয়াছে, এখন তিনিই আমার সাহায্য করিতে পারিবেন।"

"তাহার পর তুমি আর কিছুই জান না?"

"পর দিন শুনিলাম, রাজা মারা গিয়াছেন।"

"সদানন্দ আপনাকে বলিল যে, তুমি যেন পত্রের কথা কাহাকে না ব'ল।"

"হাঁ—তিনি বলিলেন, রাজা হঠাৎ মারা গিয়াছেন, পত্রের কথা বাহির হইলে আমি ভারি গোলে পড়িব।"

"ঠিক কথা,—তবে কিছু-না-কিছু সন্দেহ করিয়াছিলেন?"

নবদুর্গা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—গোবিন্দরাম বলিলেন, "ইহাতেই হইবে, তুমি যে তাহার হাতে এখনও বাঁচিয়া আছ, ইহাই তোমার পক্ষে পরম ভাগ্য।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

আগরা।

(ইতিহাস)

আগরা ভারতের কনক মুকুটে নির্ম্মল শিশিরনীরবিধৌত শুভ্র কুন্দ কুসুমনিভ প্রভাত গগনের রজতধবল প্রদীপ্ত শুক্র-তারকাবৎ সমুজ্জ্বল ছটায় ঝলিতেছে। মর্ত্ত্য-নন্দনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পরিদর্শন করিতে নানাদেশীয় ভ্রমণকারিগণ এই সুরম্য নগরীর পান্থনিবাসে সমাগত হইয়া থাকেন। আগরার মহম্মদীয় সরাই, মুসাফেরখানা, ধর্ম্মশালা, পান্থশালা, ইংরাজী হোটেল, ডাকবাংলা, ভাড়াটিয়া বাটী, কালীবাড়ী ও ষ্টেশনের হোটেলওয়ালাদিগের গৃহ প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় পথিক আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারেন।

আমি আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্টে আমার এক পূর্ব্বতন বন্ধুভবনে উপস্থিত হইলাম। অফিস হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই অতিথি দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক! প্রায় বিশ বৎসর পরে সাক্ষাৎ! তাঁহার হৃদয়ে যে কি ভাব উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল তিনিই জানেন। আমারও হর্ষোচ্ছ্বাস বর্ণনাতীত। আগ্রায় অবস্থান কালে তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাকে যে যত্ন করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত

হইবার নহে। বিবিধ রসনাপরিতৃপ্তকর খাদ্য ও মাংস প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আগ্রার বিখ্যাত ফটোগ্রাফারের দ্বারা আমার ফটো লইলেন। আর তাঁহার Album এ অতি যত্নে সুরক্ষিত আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম মহোদয়ের আগ্রাবাসকালীন বহুবৎসর পূর্ব্বের প্রতিরূপ দেখাইলেন। এই মধুময় স্মৃতি আজীবন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিবে।

আগ্রার দর্শনীয় দ্রব্যসমূহের বর্ণনার পূর্ব্বে নগরীর নাম, উৎপত্তির বিবরণ, স্থাপয়িতা সম্রাট্ সেকেন্দর লোদী ও সম্রাট বাবরসাহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এবং নগরীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল।

কীন সাহেব বলেন যে 'অগর' শব্দ হইতে আগ্রা হইয়াছে। অগর অর্থে লবণ প্রস্তুতের কটাহ। এখানকার ভূমি লবণাক্ত ও পূর্ব্বকালে এখানে লবণ প্রস্তুত হইত বলিয়া অনেকেই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এখানে আগরওয়ালা বেণিয়াদিগের সংখ্যাধিক্যে আগরওয়ালা শব্দের অপভ্রংশে আগরা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে যমুনাতীরে রাজধানী সংস্থাপনের জন্য সেকেন্দর লোদী দিল্লী হইতে কতকগুলি বুদ্ধিমান রাজকর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। তাঁহারা যমুনাতীরে একটি স্থান মনোনীত করিয়া সম্রাটকে জ্ঞাপন করিলে তিনি স্বদলবলে নৌকা-যোগে স্বয়ং উক্তস্থান পরিদর্শনের জন্য দিল্লী হইতে আগমন করেন। তিনি নির্ব্বাচিত স্থানের সমীপবর্ত্তী হইয়া দুইটি উচ্চ ভূমিখণ্ড রাজধানীর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। 'কোন্ স্থানটি নগরী নির্ম্মাণের সমধিক উপযোগী' এই কথা তিনি রাজতরণীপরিচালক নায়ক (Commander of the royal barge) মেহেতর মূল্লা খাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন, জাঁহাপনা আগাড়া অর্থাৎ আরও অগ্রে। সম্রাট হাস্য করিয়া বলিলেন, তবে নগরীর নামও 'আগ্রা' রাখা হউক। সম্রাট তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধবাহু হইয়া প্রার্থনা করিলেন ও তৎপরিবেষ্টিত আমীরওমরাহগণও সম্রাটের অনুসরণ করিলেন। শুভমুহূর্ত্তে আগরা-রাজধানী সংস্থাপিত হইল। আকবারশাহ বর্ত্তমান নগরী স্থাপিত করিয়া আকবরাবাদ নাম রাখেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ নাম হইতেই এই স্থান আগরা নামে অভিহিত হইয়াছে।

আগরা অতি প্রাচীন নগরী। পৌরাণিক যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগের সহিত ব্রজের বিবিধ নিকুঞ্জবনে ভ্রমণ করিতেন।

নীলোর্ম্মিবাহিনী প্রসন্নসলিলা যমুনার উপকূলে একটি কাননের নাম ছিল অগ্রবন। সেই অতীত যুগের প্রাচীন অগ্রবনই আগরা নামে বিখ্যাত ও বর্ত্তমান সহর সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। এরূপ কথিত আছে যখন কংশ মথুরার রাজা ছিলেন তখন তিনি অসংখ্য রাজাকে বন্দী করিয়া আগরায় অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার সেই ভীষণ কারাগার অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।

একজন প্রাচীন গ্রীকলেখক (Quintus Curtius) বলেন যে, অতি পূর্ব্বকালে আগরাম নামক জনৈক পারসী রাজা এ অঞ্চলে বাস করিতেন; সম্ভবতঃ তাঁহার নাম হইতে বর্ত্তমান নাম হইয়া থাকিবে।

আগরার বর্ত্তমান ইতিহাস আফগানিস্থানের প্রাচীন লোদীবংশীয় নৃপতি বিহলীলোদীর সময় হইতেই আরব্ধ হয়। খৃষ্টীয় ১৫০৫ শতাব্দীতে সেকেন্দর লোদী যমুনার পূর্ব্ব উপকূলে এই চিররম্য রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাবধি যমুনার পূর্ব্বতটে প্রাচীন প্রাসাদ ও সমাধি প্রভৃতির ক্ষীণ শেষচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেকেন্দর লোদীর পূর্ব্বে আগরা নগরীরূপে পরিগণিত হইলেও তাদৃশ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল না। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১০২২ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ আগরা অধিকার করেন। তাঁহার লুণ্ঠন, দহন প্রভৃতি অত্যাচার ফলে ইহা একখানি সামান্য গ্রামে পর্য্যবসিত হয়। মামুদের আক্রমণের পর এই স্থান আর একবার হিন্দুরাজত্বের অধিকারে আসে; কিন্তু অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। মামুদই প্রাচীন দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া নগরী হীন-শ্রী করিয়া দেন। স্তূপীকৃত স্বর্ণমুদ্রা, ধনরত্ন, অসংখ্য হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া মামুদ স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

লোদীবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্বের পূর্ব্বে ঘোরী, খিলিজী, তোগলক ও সায়েদ বংশীয় সম্রাটগণের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক আগরা সময়ে সময়ে শাসিত হইয়াছিল। সেই সময়ে মুসলমান ও হিন্দুরাজগণের ঘাত-প্রতিঘাতে আগরাবক্ষ ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় বিলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি আগরার তদানীন্তন অধিপতি বিহলী লোদীর প্রপৌত্র আজিম হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া নগরী স্বীয় করতলগত করিলেন। তাঁহার সময় হইতেই মুসলমান রাজলক্ষ্মী আগরায় আপনার রত্ন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহুকালের

জন্য অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন হইতেই আগরার ঐশ্বর্য্য সম্পদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেকেন্দর লোদীর সময় হইতে যে রাজশ্রী আগরার অঙ্গসৌষ্ঠবের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে তাহার চিহ্ন আজিও তাহার অঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

সম্রাট সেকেন্দর লোদী অতি মহানুভব, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজারঞ্জক সম্রাট ছিলেন। ভারতের ভাগ্যবিধাতা ও সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়াও তিনি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, লঘু আহারে তৃপ্ত থাকিতেন ও সম্পূর্ণ আড়ম্বর শূন্য হইয়া জীবনযাপন করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যে পূর্ব্বাপর প্রচলিত বহুবিধ কুপ্রথা রহিত হইয়া যায়। তিনি স্ত্রীলোকদিগের সমাধিদর্শন ও তীর্থভ্রমণ স্থগিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন স্ত্রীলোকই তীর্থে বা সমাধিস্থানে যাইতে পারিত না। এই প্রথা এক্ষণে অপ্রচলিত। শিল্পের উন্নতিকল্পে নানাবিধ কারখানা স্থাপিত করিয়া ওমরাহ ও সৈনিকদিগের সন্তানগণকে শিল্প ও সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রজাদিগের হিতকল্পে, সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধনে তিনি বিবিধ নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করেন। পাপাচার নিবারণে ও দুষ্কৃতি দমনে তিনি হিন্দুস্থানের মুসলমান সম্রাটগণের অগ্রগণ্য ছিলেন।

বোখারা, খোরাসান, আরব, তুরস্ক, পারস্য ও মধ্য-আসিয়া, প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বিদ্বজ্জন ও পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া সম্রাট-দরবারে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন। সম্রাটও তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার প্রদান করিতেন। নানাজাতীয় বণিকসম্প্রদায়ের আগমনে আগ্রার চক্ চিরকোলাহলময় হইয়া থাকিত। আজিও সেই সুদূর অতীতের কোলাহলচিত্র আগ্রার চকে সম্পূর্ণ-রূপে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

তৎকালে রাজদূতগণকে অভ্যর্থনা করিবার এক বিচিত্র রীতি প্রচলিত ছিল। কোনও ভূস্বামী বা করদ ভূপতি তাঁহার অধিকারে দূতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র সহর হইতে তাঁহাকে ৩।৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া দূতবরকে সম্বর্দ্ধনা করিতে হইত। যেস্থানে দূতের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইবে সেই স্থলে একটি উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিতে হইত। মঞ্চোপরি সুবর্ণের কারু-কার্য্যবিশিষ্ট একটি মখমলের গদি সন্নিবেশিত থাকিত। রাজদূত তদুপরি উপবেশন করিতেন। এদিকে যাঁহার নিকট দূত প্রেরিত হইয়াছেন তিনি

মঞ্চতলে ঊর্দ্ধকরে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে সম্রাটের আদেশপত্র লইয়া করজোড়ে ও নতশিরে ললাটে ও চক্ষে স্পর্শ করাইয়া বক্ষে ধারণ করিতেন। যদি কোন গোপনীয় পত্র হইত নীরবে পাঠ করিতেন, আর যদি কোন সাধারণ আদেশ পত্র হইত তাহা হইলে কোন মসজীদ-চত্বরে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চরবে ঘোষণা করিতেন। এই প্রথা তাতারীয় রাজনীতির অনুকৃতি ও চীনদেশে অদ্যাবধি প্রচলিত। সেকেন্দর এই কুপ্রথা চিরদিনের নিমিত্ত রহিত করিয়া রাজা ও ভূস্বামিগণের চিরপ্রিয় হইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে অর্থাৎ ইংরাজী ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই আগ্রায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। নগরের অনেক সমুচ্চ সৌধাবলী ভূমিসাৎ হইয়া যায় আর সহস্র সহস্র অধিবাসী ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জীবন্ত প্রোথিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে। ভারতে এমন বিশ্বধ্বংসী ভূমিকম্প আর কখনও হয় নাই। যেন পুণ্যের আগমনে পৃথিবী কম্পিত করিয়া পাপ পলায়ন করিয়াছিল।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সম্রাট সেকেন্দর লোদী আগ্রায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শবদেহ প্রথমে সেকেন্দ্রার সুরম্য উদ্যান মধ্যস্থিত সুরম্য পঞ্চগম্বুজবিশিষ্ট রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ সমাধিমন্দিরে সমাহিত হয়। কিছুদিন পরে তাঁহার পার্থিব অবশেষ দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল পাণিপথ যুদ্ধে তদীয় পুত্র ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বিজয়ী বাবরশাহ আগ্রা অধিকার করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। ইব্রাহিমের মৃত্যুতে লোদীরাজত্ব ভারতবক্ষ হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল।

পাণিপথের যুদ্ধের পর বাবরশাহকে রাণা সঙ্গের সহিত ফতেপুর শিকৃরিতে আর একটি যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে মহম্মদ শরিফ নামক কাবুলের একজন জ্যোতিষী যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে অশুভ গণনা করিয়াছিলেন। বাবর তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। তিনি অতিশয় পানাসক্ত ছিলেন; এই সময়ে তিনি শপথ করিয়া মদ্যপান পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্যসমন্বিত বিবিধ গঠনের পানপাত্র সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া চূর্ণিত খণ্ড গুলি দরবেশ, ফকির, দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণকে বিতরণ করিয়া দিলেন। আমীর ওমরাহেরা তদীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। হিরাট, কান্দাহার, গিজনী ও

কাবুল হইতে বহু উষ্ট্রপৃষ্ঠে আনীত বহুবিধ সুরঞ্জিত সুপেয় মদ্য লবণাক্ত ও বিস্বাদ করিয়া দিলেন। মদ্যভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মদ্যস্রোতে ভূমি সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত করা হইল। এই সময় হইতেই তিনি দীর্ঘবিলম্বিত শ্মশ্রুজালে বদনমণ্ডলের শোভা সম্পাদন করেন। আর মুসলমানদিগকে তজ্মা নামক ষ্ট্যাম্প কর হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন।

ফতেপুর শিকৃরির যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া বাবর হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট হইলেন। তাঁহাকে রণজয়ী দেখিয়া কাবুলের সেই জ্যোতিষী সম্ভাষণ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে অজস্র ভৎর্সনা করিলেন। অন্য কেহ হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু মহানুভব বাবর তাহাকে লক্ষ আশরফি উপহার দিয়া রাজ্যের সীমার বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

হিন্দুস্থানের তিনটী বিষয়ে বাবর বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন (প্রথম) ভারতবর্ষের গ্রীষ্মতাপ দুর্ব্বিসহ। (দ্বিতীয়) প্রখর বাত্যা, যাহা সম্মুখে পায় তাহাই উড়াইয়া লইয়া যায়। (তৃতীয়) ভারতের ধূলি, যাহা গৃহের অন্দরে বাহিরে সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই অপ্রীতিকর প্রাকৃতিক উৎপাতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে ও নগরবাসীদিগের সুখ-সচ্ছন্দের নিমিত্ত শক্তিশালী সম্রাট আগরানগরীকে রাজধানী রূপে বরণ করিয়া চিরাতপসন্তপ্ত ভূমিখণ্ডের উপর ছায়াময় উদ্যান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রখর গ্রীষ্মের দুরন্ত উত্তাপ ও কালানলবর্ষী প্রচণ্ড বায়ুর প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তিনি হিমশীতল স্নানাগার (Bath) নির্ম্মাণ করেন। এই স্নানাগার অপূর্ব্ব শান্তিময় ও তৃপ্তিপ্রদ। বিয়ানা রাজ্য হইতে আনীত উৎকৃষ্ট রক্ত প্রস্তরের দ্বারা স্নানগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভিতরে মর্ম্মররচিত বিশাল চৌবাচ্চা। জলপ্রণালীসমূহ সমস্তই শ্বেতপ্রস্তর গঠিত। এরূপ নৈপুণ্যে স্নানগৃহের রন্ধ্রগুলি প্রস্তুত যে, বাহিরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ গৃহের ভিতর আদৌ অনুভূত হইত না। যখন অগ্নিময় পবন বহিত তখন কৃত্রিম উপায়ে গৃহাভ্যন্তরের রুদ্ধ বায়ু এমনি স্নিগ্ধ হইত, যে সময়ে সময়ে শৈত্য একেবারে অসহ্য হইত।

বাবর শাহ আগ্রায় যে কয়টি উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রামবাগ নামক উদ্যান-বাটীকা অদ্যাবধি বর্ত্তমান। আর সকলগুলি কালে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। রামবাগে এখনও কয়েকটি অতি বৃদ্ধ বৃক্ষ স্তব্ধভাবে

অতীতের স্মৃতি লইয়া দণ্ডায়মান। তিনি চরবাগ বা গুলাফসান্ নামে নন্দন কানন তুল্য এক মনোহর উদ্যানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তুর্কিস্থানের উদ্যান-রাজীর অনুকরণে হেস্তবেহস্ত নামে আগ্রায় আর একটি বিচিত্র পুষ্পবহুল উদ্যান্ও যমুনা তীরে সুশোভিত করেন। পূর্ণচন্দ্রকিরীটিনী পৌর্ণমাসী যামিনীর রজতশুভ্র জ্যোৎস্নালোকে 'ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল' শোভিত উদ্যানে এককালে কতই না প্রমোদ উৎসব হইয়া গিয়াছে! হায়!—

"আজি সব নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে ও।"

উদ্যানসমূহে সলিলসেচনের নিমিত্ত তিনি যমুনাকূলে ভূ-গর্ভে সুন্দর পূর্ত্ত-কৌশলে গৃহ চৌবাচ্চা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সারি সারি কূপ খনন করাইয়া বলদের দ্বারা কাষ্ঠনির্ম্মিত জলচক্র (Water-wheels) পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামবাগে আজিও সেই সকলের জীর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে!

১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর কীর্ত্তিদীপ্ত সম্রাটকেশরী জহীরুদ্দীন মহম্মদ বাবর আগ্রায় পরলোক গমন করেন। পুণ্যময় সম্রাট-দেহ প্রথমে যমুনার চারু উপকূলে চরবাগ উদ্যানে সমাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে কাবুলে স্থানান্তরিত হইয়া তাঁহার স্ব-নির্দ্দিষ্ট পুণ্যভূমিতে সমাধিস্থ করা হয়। স্বচ্ছ-সলিলা খরবাহিনী স্রোতস্বিনী সমাধিভূমির পাদদেশ বিধৌত করিয়া বহিতেছে। সুরম্য সমাধি-উদ্যান-বাটিকায় কাবুলের অধিবাসিগণ অবকাশ বিনোদন করিয়া থাকেন।

বাবরের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসীরুদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন সিংহাসন লাভ করিয়া আগ্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অরাজকতা ও বিদ্রোহ নিবারণে, যুদ্ধবিগ্রহে ক্রমাগত লিপ্ত থাকায় তিনি আগ্রার সৌধসম্পদের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। বাবর যে কয়েকটি প্রাসাদ, হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাই মাত্র অবশিষ্ট ছিল। বর্ত্তমানে আগ্রায় বাবর নির্ম্মিত সৌধাবলীর চিহ্নমাত্রও নাই। গ্রহবৈগুণ্যে হুমায়ুন পাঠান শেরশাহশূরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ষোল বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন। শেরশাহ দিল্লীতে রাজধানী মনোনীত করেন। সুতরাং ষোল বৎসর যাবৎ আগরায় কোন উল্লেখযোগ্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয় নাই। রাজ্য পুনরাধিকার করিয়া হুমায়ুন ছয় মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবন অনন্ত রহস্য ও ঘটনায় পরিপূর্ণ।

বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যশালিনী আগরা নগরী হুমায়ুনের পুত্র জালালুদ্দীন মহম্মদ আকবর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাজ্য লাভ করিয়া প্রথমে ফতেপুর শিকৃরিতে পরে আগ্রায় রাজধানী স্থাপিত করেন। তাঁহার সময়ে আগরার ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। এমন কি তাৎকালিক পরিব্রাজকেরা, ইহার তুল্য মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী ভূমণ্ডলে আর নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আগরার সৌন্দর্য্যবৈভব তৎকালে এমনিই ছিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

হিন্দুবধূ।

হে বধূ, যখনি হেরি ভ্রমরের মৌন-আলাপন
প্রফুল্ল গোলাপ-শাখে মোদিত আকুল ফুলবাসে,
মনে পড়ে আকর্ণ-বিলম্বী তব ভ্রমর-লোচন,
আনন্দ-বিভোর মরি তোমার আনন-ফুলহাসে!
হে বধূ, যখনি হেরি সুকবির তপস্যার ধন,
জ্যোৎস্নার ম্লান আলো, ঢল ঢল তরঙ্গিনী-পাশে,
আটপৌরে সাড়ী-ঢাকা তোমার ও' শ্রীঅঙ্গ-মোহন,
একখানি ছবি হয়ে আমার মানস-পটে ভাসে!
হে বধূ, যখনি হেরি তপনের সোণার কিরণ,
লাবণ্যের জলধারা, বিটপীতে, বসন্ত-প্রভাতে,
মনে পড়ে অপরূপ তোমার সে রূপ-বৃন্দাবন,
চেলি ঢাকা নব অঙ্গ; মেখলিত নব-যমুনাতে!
কি বলিব? পান করি তব রূপ-ফুল-বন-মধু,
মধুরসে ভরি গেছে এ' জীবন, ওগো বর-বধূ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ রায়।

ফুলের বাগান দেখিয়াছ? ভরা সাঁঝে সেই বাগানে মুকুলিত কোরক-গুলি বিকশিত হয়। কতকগুলি ফুটিয়া উঠে। কতকগুলি ঝরিয়া যায়। ঝরিয়া যায় অনেক ফুল,—কে তাহাদের জন্য দুঃখ করে? কিন্তু এক একটি ফুল,—দেখিতে যেমন সুন্দর, গন্ধও তেমনি মনোমদ। বড় সাধ করিয়া বসিয়াছিলাম,—এ ফুলটী দেবতার পূজায় লাগিবে। হায়,—তাহার পুষ্প-জীবন সার্থক হইল না,—আদ্‌ ফোটা হইল,—ফুটি' ফুটি' করিতেছে, এমন সময়ে, বাতাস বহিল। ফুলটী ঝরিয়া পড়িয়া গেল! কেবল একটু আগে যে সৌরভ বিলাইয়াছিল,—সেটুকু প্রাণের ভিতরে আরো স্মৃতি-ঘন হইয়া রহিয়া গেল।

এ জগত ফুলের বাগান। এ' বিশ্বোদ্যানে নিত্য কত নর-পুষ্প ফুটিতেছে, কে তাহাদের সংখ্যা রাখে? কত অর্দ্ধ-বিকশিত নর-পুষ্প কালের পবনে ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের পূর্ণ-সৌরভ হইতে সর্ব্বমানব বঞ্চিত। তাহাদের হিসাব কেহ রাখে না। তাহারা বিরলে মুকুলিত হয়,—বিরলে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হয়, বিরলে একটু ঘনায়মান সৌরভ বিলায় এবং বিরলে ঝরিয়া পড়ে। হায়, তাহা প্রসাদী হইল না!

এ' ক্ষুদ্র নিবন্ধ যে নামের মুকুট পরিয়া অলঙ্কৃত, অর্চ্চনার পাঠকগণের কাছে, সে নাম অপরিচিত নয়।

ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়,—১৮৯০ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে। আর বলিতে চোখ জলে ভরিয়া আসে,—এই ভূপেন্দ্রনাথ,—এই বালক,—এই অর্দ্ধ-বিকশিত কুসুম, গত ১২ই আশ্বিন (১৯০৯; ২৮শে সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার, পূর্ণিমা-রাত্রে জীবন-বৃন্ত হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ভূপেন্দ্রনাথের জীবনী বর্ণনা করিতে আসি নাই। আর সে প্রয়োজনও নাই। সাধারণ পাঠকের সঙ্গে এখনও তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় হয় নাই। অতএব, ভূপেন্দ্রনাথের জীবনী তাঁহাদের ভাল লাগিবে না। কিন্তু পাঠকের সহিত তাঁহার গুণের পরিচয় হইয়াছে।

তিনি সাধারণ মানবের মত পৃথিবীতে আসিয়া, চলিয়া যান নাই। বঙ্গ-সাহিত্যে তিনি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই বিষয়ে এবং আনুসঙ্গিক দু' একটী কথা বলিব।

বলিয়াছি, ভূপেন্দ্রনাথ আদ্-ফোটা ফুল। ফুটি' ফুটি' করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছেন। ক্ষণিক তাঁহার আগমন,—কাজও তিনি বেশী করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার কাজের পরিমাণ ক্ষুদ্র। প্রজাপতিও ক্ষুদ্র,—কিন্তু তাহার ক্ষুদ্রতার ভিতরে ভগবানের হাতের অসীম কারুকার্য্য। তাহার' সৌন্দর্য্য ক্ষুদ্র নয়।

এই বালকের রচনা বঙ্গসাহিত্যের বিদ্বজ্জনসমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। ভূপেন্দ্রনাথের এই কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। "সুখ কোথায়,"—"ইতিহাস," "প্রতাপ ও জাতীয় জীবন," "দরিয়া চরিত্রের ক্রমবিকাশ" ও "বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়।" "সুখ কোথায়," তাঁহার প্রথম রচনা এবং "বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়" তাঁহার শেষ রচনা; প্রবন্ধগুলি 'অর্চ্চনা'য় যথাসময়ে বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহাই ভূপেন্দ্রনাথের স্বল্পজীবন-গত কার্য্যের ইতিহাস।

"ইতিহাস" প্রবন্ধটী, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত—অধুনা লুপ্ত —'বাণী' পত্রিকায়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে, অন্যতমরূপে বিবেচিত হইয়া, উল্লিখিত হইয়াছিল। একটী বালকের পক্ষে, এ গৌরব সামান্য নয়। "দরিয়া চরিত্রের ক্রমবিকাশ,"—বঙ্গীয় সাধনা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে, মাননীয় আচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস, সি মহোদয় মুগ্ধভাবে মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন; "এরূপ প্রবন্ধ বৃদ্ধের কাছেও আশা করা যায় না। এই বালকের প্রতিভা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।"

ভূপেন্দ্রনাথের বক্তৃতাশক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহার সেই প্রাঞ্জলভাষা-বৈচিত্র্য এবং চিত্তপ্রদীপন বক্তৃতা শ্রোতামাত্রেরই মনোহরণ করিত। তাই, আর একটী সভায় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়, বলিয়াছিলেন:—"এই কিশোরবয়স্ক বালকের অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া, আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।"

ভূপেন্দ্রনাথ, তাঁহার স্বল্প-জীবনে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচটী মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকেরা সেই পঞ্চপ্রবন্ধেই প্রতিভার পূর্ণ-প্রসাদ দেখিতে পাইবেন। তাঁহার বিষয়নির্ব্বাচনী শক্তিও প্রশংসাযোগ্য। তিনি কখন অগভীর বিষয় লইয়া, মাতিয়া থাকিতেন না। গভীর চিন্তা, একান্ত গবেষণা এবং পৌনঃপুনিক আলোচনায় পর, তিনি যখন যে কোন

বিষয় অবলম্বন করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই সফলতার উচ্চগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সাহিত্যে তিনি একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। হায়, এ সাধনার, এ একনিষ্ঠতার, এ প্রতিভার, পরম বিকাশ, পূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং মনোহারী সৌরভ, আমরা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলাম না।

তাহার পর ভাষা। ভাষায় তিনি ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। বাস্তবিক, সে ভাষা মন্ত্রের মত গম্ভীরা, উর্ম্মিমান্ সাগরের মত উচ্ছ্বাসময়ী, লেলিহান-জিহ্ব, অগ্নির মত জ্বালারম্যা এবং প্রবহমানা বন্যার মত হৃদয় প্লাবিনী। শারদ-জলদের তরলতা তাহাতে নাই, কিন্তু নবোদিত আলোকেশভানুর অসীম উৎসাহ তাহাতে আছে; তারকা-দীপালীর ম্লানদীপ্তি তাহাতে নাই; কিন্তু অম্বরনাথ সোমের বিশ্ব-প্লাবী অখণ্ডরজতধারা তাহাতে আছে; কামিনীর কম-করে কাঁকন-কলাপের মৃদু রিঞ্জিণী তাহাতে নাই; কিন্তু পাঞ্চজন্য শঙ্খের হৃদয়-মথন ভীম-আরাব তাহাতে আছে। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীতেও নিজস্ব ছিল। এই যে নিজস্ব—ইহাই তাঁহার Style। কোন প্রবন্ধের নিম্নে, তাঁহার নাম না থাকিলেও, বলিয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না, যে ইহা ভূপেন্দ্রনাথের রচনা। এই বিশেষত্ব, এই নূতনত্ব. এবং এই স্ব-নির্ব্বাচিত পৃথক পন্থাই, লেখককে বাঁচাইয়া রাখে, অমর করে এবং পাঠকের সহিত তাঁহার অবিচ্ছিন্ন পরিচয় করাইয়া দেয়।

এই সুকুমার বয়সেই, ভূপেন্দ্রনাথ চরিত্রের যে পবিত্র সাধুতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। তিনি সদাই অসত্যের পরিপন্থী ছিলেন। অগ্রবের অনুরঞ্জনে, তিনি কদাপি আপনার বিমল চরিত্রকে কলুষিত করেন নাই। যখনি তাঁহার কাছে গিয়াছি, তখনি তিনি সহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শিশু-সুলভ সরলতায় তিনি মহীয়ান্ ছিলেন। কখনো তাঁহাকে পর-নিন্দায় বিলসিত হইতে দেখি নাই। বিনয়, তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। এতগুলি গুণে অলঙ্কৃত হইয়াও, তিনি আর একটী যে গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন,—এ গুণ সকলের থাকে না। তাহা কি? স্বদেশহিতৈষিতা। এই শ্যামা বঙ্গভূমিকে তিনি যথার্থই মাতা বলিয়া বিবেচনা করিতেন; এবং জন্মভূমির দীর্ণ বক্ষের উপরে তাঁহার সন্তানগণকে পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে, তাহাদিগকে আপাতমধুর বিলাসের পঙ্কিল-প্রবাহে নিমজ্জিত হইতে দেখিলে, মায়ের নামে, তাহাদিগকে অমঙ্গলের অশিব পিনাকনিনাদ করিতে

দেখিলে, তাঁহার চিত্তক্ষোভের সীমা থাকিত না। দেশের এই দুর্দ্দিনে, বঙ্গসন্তানকে বিলাস-সাগরে সন্তরণ করিতে দেখিয়া, তিনি গভীর দুঃখ এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত,ভূদেবের ভাষায় প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, 'দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। * * গান, বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী-প্রবলপ্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে, আমাদিগের মধ্যে গান, তামাসা, নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন মতেই শোভা পায় না।" হায়, যে দেশ-প্রীতি তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরায়িত হইয়াছিল,—কালে তাহা প্রবীণোচিত অভিজ্ঞতা-সলিল সিঞ্চিত হইয়া, বনস্পতি-রূপে পরিণত হইলে, তাহার ছায়া কত সুশীতল হইত, তাহা এখন কেবল কল্পনার বিষয়।

অম্ল, লিভার প্রভৃতি দুষ্টরোগে ভূপেন্দ্রনাথকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। রাণাঘাটের সুবিখ্যাত কবিরাজ মাননীয় শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়, ভূপেন্দ্রনাথকে আপনার আবাসে লইয়া গিয়া,প্রাণ ঢালিয়া দিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন। ফলে ভূপেন্দ্রনাথের রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিনব্যাপী রোগের শোণিতশোষণে তিনি একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে দুর্ব্বলতা এমনি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল, যে অপরের সাহায্য ব্যতীত তিনি একখানি হাতও তুলিতে পারিতেন না। রোগের এই অরুন্তুদ যাতনা, এবং বক্ষ-বিদীর্ণ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে থাকিয়াও, তিনি তাঁহার বড় আদরের, আবাল্য সাধনার ধন এবং নিখিল পূজার বস্তু বঙ্গসাহিত্যকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, জাগতিক সাহিত্যে রামের তুল্য মহান্ চরিত্র দ্বিতীয় নাই,—এমন কি দেবপ্রতিম ভীষ্মচরিত্রের ধ্রুবমূল ত্রিলোকবিশ্রুত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং লোকোত্তর সদ্‌গুণাবলীও রামচরিত্রের ভাস্বর প্রদ্যোতের সম্মুখে ম্লান,—এই বিষয় অবলম্বন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা তাঁহার শ্মশানচিতায় মায়ামরীচিকায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। দৈহিক দুর্ব্বলতা তাঁহার কাল হইয়াছিল। এই দেহগত-দুর্ব্বলতার জন্যই, তিনি আপনার মানসিক কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই এবং এই দুর্ব্বলতাই তাঁহার জীবনের উপরে মহাকালের যবনিকা প্রকীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্তও, তাঁহার আত্মীয়েরা, জানিতে পারেন নাই, যে ভূপেন্দ্রনাথের বিদায়ক্ষণ আসন্ন। তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পাশের জানালা দিয়া,

ঘরের ভিতরে চাঁদের আলো আসিয়া পড়ায় তিনি যেন একটু প্রফুল্লিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চোখ দুইটী কেমন করিয়া উঠিলেন! তাঁহার অগ্রজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভূপু, অমন করিলে কেন?"

ভূপেন্দ্র—দেখ্‌লে না ঠাকুর!

অ। ঠাকুরকে (পাচককে) দেখে ভয় পেলে?

ভূ—ও ঠাকুর কেন? জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখ্‌লাম!

অ। আর কখনও এমন মূর্ত্তি দেখেছিলে?

ভূ—হাঁ, আর একদিন দেখেছিলাম। সেই তোমাদের বলেছিলেম, যে যেদিন সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে গোলদিঘীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই দিন এমনই মূর্ত্তি দেখেছিলাম, আর আজ দেখ্‌লাম। কিন্তু আজকার মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল আরও পরিষ্কার, এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন। মা আসিয়াছিলেন। ভক্তকে লইয়া যাইতে।

পৃথিবীর পাপের প্রাণত্রাসী প্রবাহ, অট্টরোলে, চরণ তলে বহিয়া যাইতে-ছিল,—স্বর্গের শোভা ভূপেন্দ্র—এ পাপাগারে তাঁহার স্থান কোথায়? তাই মা আসিয়া দেখা দিলেন; এবং ভূপেন্দ্রকে আপনার কোমল কোলে টানিয়া লইলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ভূপেন্দ্র আবার বলিলেন,—"দাদা, আমি বল পেয়েছি, দেখ, আমি হাত তুলতে পারছি।" বলিয়া দুই তিন বার হাত নাড়িলেন। হায়রে ভাই! এ যে পরলোকে যাইবার বল! আবার কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "দাদা, আমি বোধ হয় এইবার সে'রে উঠ্‌বো।" হ্যাঁ ভাই! তুমি সারিয়া গিয়াছ! রোগের যন্ত্রণা আর তোমার নাই,—তুমি এখন যাতনার বহু উর্দ্ধলোকে, সান্তের নাগপাশ ছাড়িয়া,—অনন্তে,—অসীমে অনাহত স্বাধীনতায় উঠিয়া, বিশ্ব-নিয়ামকের স্নেহাঙ্কে স্থানলাভ করিয়া, একেবারে সারিয়া গিয়াছ!

তাহার পর কি হইল? তাহার পর—হায়, তাহার পর তিনি তাঁহার যাতনায় সেবক, পালনে পিতা ও স্নেহে মাতা-স্বরূপ এবং দুঃখে আশ্রয়, ভালবাসায় বন্ধু ও প্রেমে দেবতাপ্রতিম ভ্রাতাদ্বয়কে, এবং আত্মীয়গণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, সেই সেখানে চলিয়া গেলেন—সেই অজানা প্রদেশে চলিয়া গেলেন যেখান হইতে কেহ কখনও ফিরিয়া আসে নাই, আসিবে না!

যেন, একটা স্বর্গের রশ্মি। উষার একটু দীপ্তি। শিশিরের একটী ফোঁটা।

এবং স্বপ্নের একটা কাহিনী। হা! পৃথ্বীর বিষদিগ্ধ নিশ্বাসে নিবিয়া যায়। বেলা বাড়িলে মিলাইয়া যায়। রবিকরতাপে শুকাইয়া যায়। এবং ঘুম ভাঙ্গিলে মিশাইয়া যায়।

যাও ভুপেন্দ্র! নন্দনের শোভন কুসুম তুমি,—ধরার কণ্টক ক্ষেত্রে তোমার শোভা কোথায়? যাও ভাই,—স্বর্গে যাও,—তুমি সাহিত্য বড় ভালবাস,—সেখানে মধুসূদন আছেন, বঙ্কিম আছেন,—হেমচন্দ্র আছেন, নবীনচন্দ্র আছেন,—সেখানে গিয়া তুমি বড় সুখে থাকিবে।

হরিচরণ দাস।

হরিচরণ দাস নামটি শুনিলে বাঙ্গালীর নাম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই নিবন্ধে যে মনিষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কার্য্যাবলি আলোচনা করিব তিনি পশ্চিমদেশীয় হিন্দু। যে সময় ভারতের ভাগ্য-লক্ষ্মী মোগল ও ইংরাজের মধ্যে চঞ্চল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, যে সময় মোগলের জীর্ণ গৌরবসৌধে পরাক্রমশালী ইংরাজ গুলি বর্ষণ করিয়া বিলাসপ্রিয় মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ সাগরমল মীরাট পরগণার চৌধুরী এবং কানঙ্গু ছিলেন; তিনি স্বয়ং নবাব কাসিমালি খাঁর অধীনে কর্ম্ম করিতেন এবং তাঁহার কন্যা অযোধ্যার নবাব পত্নী নজবুন্নিশা বেগমের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই বেগমের অনুগ্রহে তিনি নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইতেন এবং নবাব পরিবারের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি প্রভৃতি ভাষার অনুশীলন করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করিতে কৃতচেষ্ট হইয়াছিলেন। সাহনামা রাজাবলি রামায়ণ মহাভারত ভাগবত এবং পণ্ডিত ফৈজি কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় অনূদিত যোগবাশিষ্ঠ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু হরিচরণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক বিষয় ছিল ইতিহাস; ভারতবর্ষের অতি প্রাচীনকাল হইতে তাঁহার সময় অবধি ইতিহাস সঙ্কলন করিবার সংকল্প তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। তাঁহার এ সাধু সংকল্পে নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং তাঁহার প্রতিপালিকা নজবুন্নেসা বেগম উদারভাবে অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিয়া তাঁহার বাসনা সিদ্ধ করিলেন।

ইংরাজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইতিহাস সমাপ্ত হইল। আপনার নবাব প্রভুকে এই অভিনব গ্রন্থ উপহার দিবার জন্য তিনি এই ইতিবৃত্তখানির নাম করিলেন "চহার গুলজার সুজাই" অর্থাৎ সুজার গোলাপ কানন চতুষ্টয়।

এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মা মহেশ প্রভৃতির ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে সত্যযুগের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ডে ত্রেতাযুগ এবং অবতারগণের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ডে দ্বাপরের এবং পঞ্চম খণ্ডে কলিযুগের ইতিহাস সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য,ইতিপূর্ব্বে এরূপ বিশদ্‌ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে কেহ প্রয়াস করেন নাই।

কলিযুগের ইতিহাস আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে কলিযুগের প্রারম্ভ অর্থাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান কর্ত্তৃক দিল্লী বিজয়কাল অবধি দিল্লীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত বিষয় দিল্লীতে মুসলমান সিংহাসন প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সম্রাট সা আলমের রাজত্বের পঞ্চবিংশতি বৎসর অবধি ইতিহাস।

এই শেষ ভাগই এই গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য অংশ; কারণ ইহাতে ইংরাজদিগের সহিত মুসলমান ভূপতিদিগের মৃত্যু সংগ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায়।

সঙ্কলন।

কাগজ।

কাগজ সকল সভ্যদেশে সমান ভাবে আবশ্যক। আমাদের দেশ খুব প্রাচীন ও সভ্যতার আলোকে সর্ব্বপ্রথমে আলোকিত হইলেও এখানে কাগজের প্রচলন খুব কম ছিল। উপস্থিত এদেশে কাগজের ব্যবহার খুব অধিক হইয়াছে। কাগজের ব্যবসায় খুব লাভজনক, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এদেশে বাঙ্গালী পরিচালিত কোন কাগজের কল নাই। হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে, এক বৎসরের হস্ত-নির্ম্মিত কাগজে একদিনের কাজ চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দেশবাসীর এই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও লাভজনক ব্যবসায়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত হইতেছে না, ইহা অতীব দুঃখের কথা।

ইউরোপে প্রতি বর্ষে কত কাগজ প্রস্তুত হয়, বিগত ১০ই জুলাইয়ের Scientific American নামক পত্রে তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে——

	দেশ।			প্রতি বৎসর প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ।
১।	জার্ম্মানী	...	...	৪,২৫,০০০ টন্
২।	ইংলণ্ড	...	...	২,৬০,০০০ টন্
৩।	ফ্রান্স্	...	...	১,৯০,০০০ টন্
৪।	অষ্ট্রিয়া	...	...	১,৫৫,০০০ টন্
৫।	ইতালি	...	...	১,২০,০০০ টন্
			মোট	১১,৫০,০০০ টন্

ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে অতি অল্প পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সমগ্র ইউরোপ লইয়া ধরিলেও তাহাদের প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ আমেরিকা অপেক্ষা কম। কেবলমাত্র আমেরিকাতেই প্রতি বৎসর ১,৩৩০,০০০ টন্ কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমরা এতদিন জানিতাম কাগজ বুঝি কেবলমাত্র লিখিবার জন্যই ব্যবহার হয়, কিন্তু একখানি ফরাসী কাগজে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাতে প্রকাশ যে—কাগজের ছাদ * প্রস্তুত হয়। কাগজ হইতে একটী নমনীয় পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে চিকাগো (Chicago) নগরে কোন ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। সেগুলি এত লঘু, কমনীয়, নমনীয় এবং ব্যবহার করিবার পক্ষে সুবিধাজনক যে, হাসপাতালে সেগুলি প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সব পোষাকের ধারে উলের পাড় প্রভৃতি আছে।

কাগজের বোতল এবং শস্যাদি রাখিবার বা লইয়া যাইবার জন্য থলী Philadelphiaতে প্রস্তুত হয়। অশ্বের খুরও কাগজে প্রস্তুত হইতেছে। এই খুর সিমেণ্ট দিয়া অশ্বের পায়ের তলে সংলগ্ন করিতে হয়। আবিষ্কর্ত্তার মতে ইহা লৌহনির্ম্মিত খুর অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত।

সম্প্রতি দুইজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়র পূর্ব্বোক্তরূপ একটী মোমের মত মিশ্র

* শুনিয়াছি জাপানেও কাগজের ছাদ আছে।

পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা কাগজ, ক্যাম্বিস্, linen, রেশম এবং ইস্পাতের তার দ্রবীভূত করিয়া প্রস্তুত। এই নবাবিষ্কৃত দ্রব্যে প্রস্তুত দ্রব্যাদি লঘু জল প্রতিরোধক এবং অগ্নিতে দাহ্য নহে। এই দ্রব্যে নাকি যুদ্ধের জাহাজ, গাড়ী, রেল, এমন কি রাস্তার মেজিয়া অবধি অতি সুন্দররূপে হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

কবিতা-কুঞ্জ।

চিন্তা।

১

চিন্তা সখীরে আমার, অয়ি চিন্তাঙ্গনা—
একি তোর ভালবাসা!
প্রতি পল, দিবা নিশা!
বেড়িতেছ চিত্ত মোর, আমাতে মগনা—
একি তোর স্নেহ যত্ন, নির্ম্মম করুণা!

২

জীবন-প্রত্যুষ হ'তে প্রদোষ সময়ে
জীবনের পথে পথে,
চলিয়াছ সাথে সাথে,
লয়েছ সর্ব্বস্ব মম, তব বিনিময়ে!
মন্ত্রমুগ্ধ, জড়বৎ তোমার আশ্রয়ে!

৩

কৃপাময়ী-রূপে তুমি কভু বিরাজিত—
ঢালিছ করুণাবারি,
দুঃখ দৈন্য অপসারি,
'আশা'রূপে কন্যা তব ক'রে আশ্বাসিত
হৃদয়-কাননে পুষ্প হয় বিকশিত।

৪

কখনো বা সুখ-সূর্য্য তব করুণায়
আলো ক'রে হৃদাকাশ—
দেয় শান্তি, তৃপ্তি, আশ—
পঙ্গু তুঙ্গ শৃঙ্গ যরি, করে উলঙ্ঘন
অন্ধ পায় দিব্য দৃষ্টি, বধির শ্রবণ!

৫

কভু হেরি অধিষ্ঠিতা তোমারে রমণী
নরনারী হৃদিমাঝ—
নিয়ত হানিছ বাজ
ছিন্ন করি হৃদ্‌পিণ্ড প্রলয়কারিণী
দয়া মায়া স্নেহ-হীনা ঘোর পিশাচিনী।

৬

কীটরূপে নর-হৃদে হয়ে অধিষ্ঠিত
প্রতি শিরা, প্রতি মর্ম্ম
সর্ব্ব অঙ্গ, অস্থি চর্ম্ম
বিকট দংশনে তব—পরাণ নিঃসৃত
জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্মাধর্ম্ম—সর্ব্ব তিরোহিত।

৭

রহ চিরহৃদি-মাঝে অয়ি মনোরমা
চাহিনা করুণা-দৃষ্টি,
মনোরম স্বপ্ন-সৃষ্টি—
ভেদাভেদ আত্মজ্ঞান, ঘুচায়ে গরিমা
এস করি বিশ্ব কাজে নিয়োজিত তোমা'।

কর্ম্ম।

সুদুর্লভ জীবনের দীপ্ত মধ্যবেলা—
কাটাইবে কেন তবে অলস স্বপনে ?
অতীতের কূলে বসি সে স্বপন খেলা—
খেলিবে গো কতকাল অবসন্ন মনে ?
দেবতা প্রতিষ্ঠা কল্পে সে বীণা ঝঙ্কার—
পুষ্প গন্ধ রাশি রাশি সুষমা সম্ভার—
উৎসবের অন্তে যদি গিয়াছে থামিয়া—
তাই কি শুধাবে স্রোত হবে রুদ্ধ হিয়া ?
অধিষ্ঠিত দেব চান তাঁর নিত্য সেবা—
সঙ্কল্প নৈবেদ্য তার আনিয়াছ কিবা ?
কৌমুদী নিশীথে আর তমসার মাঝে—
নির্ম্মল প্রভাতে আর অবসন্ন সাঁঝে—
কর্ম্ম, প্রীতি, পূজা তাঁর চির প্রয়োজন
ভক্ত তুমি কর আজি সেই আয়োজন !

শ্রীউমাচরণ ধর।

মৃত্যু।

জীবনের শত ঝঞ্ঝা, শত বজ্রাঘাত,
স্নেহ, ভালবাসা, কল্পনার উত্তেজনা,
কর্ম্মের নিয়োগ, আকাঙ্ক্ষার কশাঘাত,
প্রিয়জন বিয়োগের অদম্য যাতনা,
প্রণয়ের তীব্র জ্বালা, শোক হাহাকার,
অপমান, অভিমান, স্মৃতির দংশন,
বহু যন্ত্রণার মাঝে, আশা-আকাঙ্ক্ষার
না মিটিতে ভোগবাঞ্ছা ; এসেছে মরণ
বরণ করিতে তারে, নিভৃত-নিবাসে।
ইন্দ্রিয় স্তম্ভিত হয়, বিস্ময়ে তরাসে॥

কেগো তুমি ? করুণার প্রতিমূর্ত্তি-খানি
চিত্রিত করিয়া, চিত্তে করিছ স্থাপন ?
মরি ! কি মাধুর্য্যময়ী ! কি মনোমোহিনী !
এত কি সুন্দর শোক ? ফিরে না নয়ন।
কামিনী কাঁদিছে কোথা, বিনা'য়ে কাতরে
শ্রবণে পশিছে তার করুণ ক্রন্দন।
সারা জীবনের স্মৃতি, স'রে যায় দূরে
ক্লান্তি আসি করিতেছে, গাঢ় আলিঙ্গন।
জীবনের সত্য যাহা, স্বপনের মত,
কভু মনে হয়, কভু হ'তেছে বিস্মৃত॥

আসিতেছে মহাতন্দ্রা ; যেথা ছিল নারী
নিত্য সহচরী, চিরপরিচিতা তার।
সেই চিরপরিচিত-করে কর ধরি
সেথা সাড়া নাই ; কে জানে সে কর কার
কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ কত জনে যার
পূর্ণ ছিল পৌরুষের ; কিছু তা'র নাই।
ইচ্ছা-দ্বেষ-রোষ-তেজ-দম্ভ-অহঙ্কার
একত্র হইয়া মিশে গেছে এক ঠাঁই।
কে করে খারত-স্বর শূন্যে উদীরণ।
ঝলসিছে সমুজ্জ্বল আলোকে নয়ন॥

বাজিল বিষম রণ জীবনে মরণে।
কৃষ্ণকায় মৃত্যুর কি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর !!
পুঞ্জীভূত-অন্ধকার-নিবিড়-নির্জ্জনে
লইতে সে এসেছে কি ? কম্পিত অন্তর !!
তাই কি জ্ঞানের-ধারা-শাখা-নদী যত
ইন্দ্রিয়-বিষয় হ'তে, হ'য়েছে বাহির
মিশাইতে সিন্ধু-গর্ভে ? করি উদ্‌ঘাটিত
নেত্রদ্বার, প্রাণপণে ধরিতে অস্থির ;
আবেগে-উদ্বেগে, জ্ঞান-সমবায়ে তারে।
আলোকে কি লুকাইতে চায় আপনারে ?

তিরস্কৃত, পরাজিত, সকল উদ্যম।
ব্যর্থ-যত্ন, আশা-ভঙ্গে ভ্রুকুটী ভীষণ
কি বিকৃত মুখভঙ্গী !! চেষ্টার চরম
অপাঙ্গ-বিস্তার আর অধর-দংশন।

অসুরের মূর্ত্তি যেন ; মহিষ-মর্দ্দিনী
হেথা মৃত্যু ; ধীরে ধীরে আরম্ভ করিছে
তারে ; নাগপাশে যথা, সেথা সে নাগিনী
শেষ হ'ল সব ; ধীরে আলো নিবিতেছে
দেখিতেছে শুধু প্রসারিত অন্ধকার।
ডুবিল তিমিরগর্ভে বসুধা তাহার॥

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

সাহিত্য-সমাচার

মানসী—ভাদ্র, ১৩১৬। এই নবপ্রকাশিত মাসিকে "কাব্যে নীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু ইহা কোন পত্রিকার শীর্ষ স্থানীয় হইবার যোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ প্রকাশযোগ্য কিনা, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। ইতিপূর্ব্বে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যে নীতি' আখ্যা দিয়া 'সাহিত্য' পত্রে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন এই প্রবন্ধ উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদছলে লিখিত। দ্বিজেন বাবুর মন্তব্যের সহিত আমাদের বিশেষ কিছু সহানুভূতি নাই এবং তাঁহার মতের সহিত সকলেরই যে ঐকমত্য হইবে, এমন আশা করাও দুরাশা। পৃথিবীতে যতদিন মানবের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন মতানৈক্যকে কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। সুতরাং বাদ প্রতিবাদ দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু এই প্রতিবাদ দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। সাধারণতঃ ভদ্রসমাজে যেরূপ মসীযুদ্ধ হইয়া থাকে ইহা সে শ্রেণীর নহে। ইহা এক অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিবাদ! প্রতিবাদকারীর বক্তব্য যুক্তি-তর্ক-সম্পর্কশূন্য হইলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি ছিল না। কারণ নবীনের অনেক দোষ মার্জ্জনীয় বলিয়া তাহাও আমরা উপেক্ষা করিতাম,—সহ্য করিতাম। কিন্তু এ রচনা যেরূপ সঙ্কীর্ণতা দোষে দূষিত,—দ্বিজেনবাবুকে ইহাতে যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে—তাহা অমার্জ্জনীয়—অসহনীয়। এমন 'মেছোহাটা ভাষা'য় লিখিত গালাগালিসর্ব্বস্ব প্রতিবাদ এই আমরা প্রথম দেখিলাম। বাস্তবিকই, যিনি ভদ্রসন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী, তিনি যে অপর ভদ্রসন্তানের প্রতি এরূপ ইতরজনোচিত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা আমরা এ রচনা না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। লেখকের ভদ্রসমাজে গতিবিধি আছে কিনা, জানি না। তবে তিনি যে নিজেকে একজন 'কৃতবিদ্য' বলিয়া দাবী করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেন না, তাঁহার নামের পেছনে গোলাম-খানার লেজুড় আছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যে, গোলামখানার লেজুড় থাকিলেই কি পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ-অধিকার লাভ করা যায়? এই লেজুড়ের সাহায্যে স্ত্রীমহলে বেশ পশার প্রতিপত্তি জন্মিতে পারে, এমন কি বিবাহের সময় উচ্চদরে বিক্রয় হইবার দাবীও করা যায় ; কিন্তু তা' বলিয়া পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রকে কলুষিত করিবার লেখকের

কি অধিকার আছে? যিনি নীতিশিক্ষার প্রথম পাঠ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনিই 'কাব্যে নীতি'র আলোচনা করিতে বসিয়াছেন,—ইহা কি কম ধৃষ্টতার পরিচায়ক? ইহা কি কম স্পর্দ্ধার কথা? উদারতা ও সংযম সাহিত্যের প্রাণ। সাহিত্যের সেই উদার ও পবিত্র বক্ষে একি বিদ্বেষ হিংসার হলাহল উদ্গীরণ! একি উন্মত্ততার ভীষণ রুদ্র-নর্ত্তন!! মার পবিত্র মন্দির যে এমন করিয়া কলুষিত করিতে সাহসী হয়, তাহাকে দণ্ডবিধান করিবার কি কেহ নাই? এ অন্যায়ের কি প্রতিবিধান নাই? এ বিদ্বেষ কলুষিত নীচতাপূর্ণ রচনার প্রতিবাদ করিতে আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হইতেছে না। ইহার প্রতিবাদ করিলে অভদ্রতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সত্য বলিতে কি, এই রচনা পড়িবার সময় আমাদের মনে কেবল এই কথা জাগিয়াছিল যে, শিষ্টাচার শিখাইবার জন্য লেখকের কি কখনও কোন অভিভাবকও ছিলেন না? শুনিয়াছি ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই শ্রেণীর সমালোচককে সময়ে সময়ে লাঠৌষধি গলাধঃকরণ করিতে হয়। ইংলণ্ড প্রত্যাগত হইলেও দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রবীণ ও কৃতবিদ্য এবং শান্তিরক্ষা করা তাঁহার ব্যবসায় সুতরাং আমাদের আশা আছে সমালোচকপ্রবর অক্ষত শরীরে ৺পূজা দেখিতে পাইবেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন রচিত"সুন্দর"কবিতাটীসুন্দরই হইয়াছে।"প্রকাশ" প্রবন্ধ আমাদের ভাল লাগিল না। বক্তব্য বিষয় লেখক গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। "স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু"নামধের প্রবন্ধে একটিও নূতন কথা দেখিলাম না,—সমস্তটাই চর্ব্বিতচর্ব্বণে জর্জ্জরিত। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষের "চিঠিপত্র" গল্প মোটে জমে নাই। শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি" ইতি শীর্ষক কবিতা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহা সেন-কবির উদ্দেশ্যে লিখিয়া লেখক বঙ্গভাষা, কি দেবেনবাবু, কাহার উপর অধিক অত্যাচার করিয়াছেন,তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। উপসংহারে আমরা এই পত্রিকার'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'র একটু পরিচয় দিব। সমালোচনার সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং তাহা আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়াও মনে করি না। শুধু পাঠকবর্গকে এই সমালোচনার একটু নমুনা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। কারণ এই সমালোচকপ্রবর 'প্রবাসী'র সমালোচককে যে ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন, বিন্দুমাত্র যাহার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, সে কখনই উহার "উত্তোর" গাহিতে পারিবে না। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে 'কাব্যে নীতি'র মত রচনা এ মাসিকের ক্রোড়ে কেন স্থান পাইয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে এ অনুষ্ঠান কোন ভক্তের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই—ইহা কতকগুলি 'চেঙ্গড়া'র খেয়াল মাত্র। এখানে সাধনার পরিবর্ত্তে 'চেঙ্গড়ামি'ই প্রবল—'চেঙ্গড়ামি'রই আধিপত্য দেখিতেছি। নতুবা নিঃসঙ্কোচে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া সমালোচক কেমন করিয়া লিখিলেন যে, "অবনীন্দ্রবাবুর "রাজকাহিনী" নামক গ্রন্থের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহাতে সমালোচককে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি জগতের যাবতীয় গ্রন্থ কর্ম্মনাশা জলে ফেলিয়া দিয়া একখানি 'রাজকাহিনী' লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন্।" এমন নির্লজ্জ সমালোচক আমরা আর দেখি নাই। ভাট-বন্দনা বা বন্দি-বন্দনা আর সমালোচনা এক জিনিস নয়।

সমালোচক 'ভারতীয় বিদুষী' নামক গ্রন্থের সমালোচনাতেও ঐরূপ কাণ্ডজ্ঞানবিহীনতার পরিচয় দিয়াছেন; "যাঁহারা নানা উপলক্ষ্য ধরিয়া আমাদের অজ্ঞ সমাজকে আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ করেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।" ঠিক কথা। কিন্তু যাহারা কার্য্যতঃ শ্বশুর কিম্বা অন্য কাহারও শক্তিতে নির্ভর করিতে আমাদের শিক্ষা দেন তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ কি আদৌ স্বীকার করিবার মতই নহে?"—ভগবানের নিকট আমাদের এক্ষণে এই কামনা যে, এই চেঙ্গড়া পরিচালিত কাগজের অস্তিত্ব যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, ততই দেশের মঙ্গল, সকলের মঙ্গল। কারণ এরূপ সাহিত্য সেবায় শুধু যে সাহিত্যের অবমাননা হয়, তাহা নহে। দেশেরও ইহাতে বিশেষ অমঙ্গল! যাঁহাদের ধারণা গালি দিয়া নাম জাহির করিব, বড় হইব, তাঁহারা মরীচিকায় ভ্রান্ত! সেদিন গত হইয়াছে।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।—শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত। আমরা এই পুস্তক একখানি উপহার পাইয়াছি।

আমরা সচরাচর যে বাঙ্গালা ভাষায় যে শ্রেণীর অভিধান দেখিতে পাই, ইহা সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। এই অভিধানখানি ছয় ভাগে বিভক্ত—(১) শব্দার্থ, জীবন-চরিত প্রভৃতি (২) সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) বাঙ্গালা উপন্যাস নাটকাদির চরিত্রাবলী (৪) বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী (৫) প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী (৬) আদালতে, মহাজনী ও জমিদারী সেরেস্তায় ব্যবহৃত শব্দাবলী, ইহা ব্যতীত ইহাতে 'ভাষা বিচার,' 'অর্থভেদে শব্দ বিভাগ,' 'সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা,' 'হিন্দুসঙ্গীত,' 'ভিন্ন ভিন্ন টাইপের নাম ও আকৃতির পরিচয়,' 'প্রুফ সংশোধন প্রণালী' এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা হইতেই পাঠক এই পুস্তকের পরিচয় পাইবেন। ইহার দ্বিতীয় ভাগে 'ফুলজানি' নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের এবং তৃতীয় ভাগে 'ভ্রান্তি' নাটকের অন্তর্গত 'রঙ্গলাল" চরিত্রের কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। এরূপ আরও দুই একটী ক্রটী পরিলক্ষিত হইল। আশা করি, সেগুলি পরের সংস্করণে সংশোধিত হইবে।

এই অভিধানখানি 'অভিধান' নামাভিধেয় হইলেও বস্তুতঃ একখানি Book of Reference ইহা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। এত স্বল্প মূল্যে এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর আছে কিনা আমরা জানি না। সাহিত্য-সেবিগণ ও বিদ্যার্থিগণের নিকট এই অভিধানখানি বিশেষ-রূপে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সম্পাদক-মহাশয় যেরূপ অকাতর পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিয়া এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে চিরদিনই বাঙ্গালা-সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।

কলিকাতা ৫।১২ সুকীয়া ষ্ট্রীট মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সুরমা

সেফালি সুবাসও সুরমার কাছে পরাজিত।

শরতের শোভা-সম্পদের শ্রেষ্ঠগরিমা সেফালি—বুঝি এবার বা মরমে মরিয়া যায়। তাহার চির-প্রিয়—চির-সমাদৃত সুমধুর সুবাস, বুঝি—"সুরমার" কাছে পরাজিত হয়। তাই মনের দুঃখে অভিমানিনী সেফালিকা গাছের তলায় ঝরিয়া পড়িতেছে। কথাটা কল্পনার সৃষ্টি নয়। সত্যই কবির স্বপ্নময়ী সেফালির সৌন্দর্য্য আর সুবাস, "সুরমা"র কাছে পরাজিত হইয়াছে। ইহা দশের মুখের কথা—আমাদের নয়। নতুবা দিন দিন সুরমার বিক্রয়াধিক্য কেন ? কারণ সুরমা গুণে শ্রেষ্ঠ, গন্ধে অতুলনীয়, দরেও সাধারণের ক্ষমতার সীমার মধ্যে।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৷৹ বার আনা, ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ।৶৹ সাত আনা। তিন শিশি ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৷৷৷৶৹ চৌদ্দ আনা।

সর্ব্বজন-প্রশংসিত এসেন্স

রজনী-গন্ধা।—র৷ গন্ধটুকু নিতান্তই স্নিগ্ধ-কোমল ই কোমলতাই রজনীগন্ধার নিজস্ব।

সাবিত্রী।—'সাবিত্রী' সাবিত্রী চরিত্রের মতই পবিত্র পদার্থ।

সোহাগ।—আমাদের 'সোহাগ' এসেন্স সোহাগের মতই চিত্তাকর্ষক।

মিলন।—মিলনের সুবাস মিলনের মতই মনোরম।

রেণুকা।—আমাদের 'রেণুকা' বিলাতী কাশ্মীরি বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

মতিয়া।—আমাদের মতিয়ার সৌরভ বিলাতী জস্‌মিনের গৌরব পরাজিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ টাকা। মাঝারি ৷৷৷৹ বার আনা। ছোট ॥৹ আট আনা। প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥৹ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট তিন শিশি ১।৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৷৷৷৹ বার আনা, ডাকমাশুল ।৴৹ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৴৹ পাঁচ আনা। আমাদের অটো ডি রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস্ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মৃত্যু-বিভীষিকা ।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ।

ষ্টেশনের দিকে যাইতে যাইতে গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার, বুঝিতে পারিলে, ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে ? কিন্তু এই ভয়ানক দুর্ব্বৃত্তের ভয়াবহ খুনের রহস্য আমরা সম্পূর্ণরূপে ভেদ করিতে পারি নাই,এখনও ইহার বিরুদ্ধে ফাঁসি হইবার মত কোন প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই ; যখন হইবে তখন জগতের লোকে এরূপ অদ্ভুত খুনের প্রথা আর কখনও কেহ শুনে নাই, তাহাই বলিতে বাধ্য হইবে। যাহা হউক, আর বিলম্ব নাই, এইবার এই বদমাইশের সকল বুদ্ধিরই একটা সীমা পাওয়া যাইবে।"

আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিবার কিয়ৎক্ষণ পরে কলিকাতার গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। অক্ষয় বাবু লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, তিনি গোবিন্দরামকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "খবর ভাল ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "খুব ভাল, অনেক কাল এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় নাই—এস, আর দেরি করিবার সময় নাই, আজ রাত্রে যে মাঠ আর যে দৃশ্য দেখিবে, তাহা জীবনে কখন দেখিতে পাইবে না, ভুলিতেও পারিবে না।

আমরা আবার সেই মাঠের দিকে ফিরিলাম। গোবিন্দরাম নিজে কখন কি করিবেন, তাহা কখনও কাহাকে বলিতেন না, কাজেই তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের অনেক সময়ে এই জন্য বিরক্ত হইতে হইত। তিনি কি করিবেন, তাহা আমি বা অক্ষয়বাবু কিছুই জানি না, অন্ধের ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি মাত্র।

আমরা একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ীতে যাইতেছিলাম। গোবিন্দরাম নীরব, কাজেই আমরা দুই জনে এ কথা সে কথা কহিয়া সময় কাটাইতেছিলাম। সদানন্দের বাড়ীর প্রায় আধ ক্রোশ দূরে আসিয়া গোবিন্দরাম গাড়ী বিদায় করিয়া দিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়; আমরা প্রকাশ্য পথ ত্যাগ করিয়া মাঠের পথে চলিলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "অক্ষয় বাবু, সঙ্গে পিস্তল আছে তো?"

অক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "যতক্ষণ আমার গায়ে কোট আছে, ততক্ষণ তাহার তিন চারটা পকেটও আছে, যখন পকেটগুলি আছে, তখন পকেট-গুলিতে নিশ্চয়ই কিছু আছে।"

গোবিন্দ। খুব ভাল, ডাক্তারের আর আমার পকেটও খালি নয়।

অক্ষয়। গোবিন্দরাম বাবু, ব্যাপারটা বিন্দুবিসর্গ বুঝিতেছি না, এ পর্য্যন্ত তো এক কথাও বলেন নাই—উপস্থিত ব্যাপারটা কি?

গো। উপস্থিত ব্যাপার—ধৈর্য্য।

অ। ধৈর্য্য—বুঝিলাম না।

গো। এখনই বুঝিবেন।

অ। কি ভয়ানক মাঠ, এমন দুর্গম স্থানও সংসারে আছে, জনমানবের চিহ্ন নাই—তবে দূরে আলো দেখা যাইতেছে, বোধ হয় একটা বাড়ী।

গো। হাঁ, ঐ বাড়ীটা আমাদের লক্ষ্য, খুব সন্তর্পণে পা টিপিয়া চল, আস্তে কথা কও।

আমরা অতি নিশব্দে সদানন্দের বাড়ীর নিকটস্থ হইলাম, তখন বোধ হয় রাত্রি আটটা। বাড়ীর কাছে আসিলে গোবিন্দরাম মৃদুস্বরে বলিলেন, "চুপ—আর না, এই গাছের ঝোপটা লুকাইয়া থাকিবার বেশ জায়গা, এস এখানে।"

অ। এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে?

গো। হাঁ, এইখান হইতে পাহারা দিতে হইবে। ডাক্তার, তুমি বাড়ীটা আগে দেখিয়াছ, যে ঘরে আলো জ্বলিতেছে, সে ঘরটা কি?

আমি। বৈঠকখানা।

গো। এস আস্তে আস্তে—দেখি ভিতরে কে।

আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া প্রায় জানালার কাছে আসিলাম; দেখিলাম, গৃহমধ্যে কেবল দুই জন লোক বসিয়া আছে; দেখিবামাত্রই চিনিলাম, একজন সদানন্দ অপর নবীন রাজা মণিভূষণ।

তাহারা আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন; তবে ভাবে বুঝিলাম, উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পান ও তামাক চলিতেছে। ইহাতে বোধ হইল, ইহাঁদের ভোজন ব্যাপারটা ইহারই মধ্যে শেষ হইয়াছে।

এই সময় দেখিলাম, সদানন্দ উঠিয়া সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং মণিভূষণ তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। তাহার পরেই একটা দরজা খুলিবার শব্দ পাইলাম। বোধ হইল, কে যেন বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। সত্য সত্যই সদানন্দ বাড়ীর বাহির হইয়া আসিয়া আমার সম্মুখ দিয়া বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে গেল; সেখানে সে একটা ঘরের চাবি খুলিয়া প্রবেশ করিল, সে ঘর হইতেও কি একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম; কিন্তু পরক্ষণেই সদানন্দ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে আবার গৃহে প্রবেশ করিল।

আমরা নিঃশব্দে আবার ঝোপের নিকটে আসিলাম। তখন গোবিন্দরাম বলিলেন, "ইহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইলে?"

আমি বলিলাম, "কই না।"

গোবিন্দরাম চিন্তিতভাবে বলিলেন, "অন্য কোন ঘরে আলো দেখিতে পাইতেছি না—সে কোথায় তবে?"

আমি বলিলাম, "কেমন করিয়া বলিব?"

গোবিন্দরাম কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমাদের আরও একটু দূরে গিয়া থাকা উচিত, এস।"

আমরা তিন জনে সদানন্দের বাড়ী হইতে এই নির্জ্জনতায় ভয়ানক প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে সরল কঙ্করাকীর্ণ পথ গড়ের দিকে গিয়াছে, সেই পথে অগ্রসর হইলাম—কোন দিকে একটী গাছ পর্য্যন্ত নাই; অনেক দূর আসিয়া একটা খাদ দেখিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "লুকাইয়া থাকিবার এই উপযুক্ত স্থান, এস এইখানে অপেক্ষা করা যাক—মণিভূষণ শীঘ্রই এই পথে যাইবে। আর বেশী দূরে যাওয়া উচিত নহে—কি জানি কি হয়।"

আমরা নীরবে স্পন্দিত হৃদয়ে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সেই গর্ত্তের ভিতর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সহসা গোবিন্দরাম ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এইবার বোধ হয়, মণিভূষণ আসিতেছে!"

তখন আমরা কান পাতিয়া শুনিয়া বুঝিলাম যে, দূরে কেহ দ্রুতপাদবিক্ষেপে

আসিতেছে ; আমরা তিন জনেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারে চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তবে পদশব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল ; একটু পরে আমরা দেখিলাম, দূরে মাঠের উপর দিয়া মণিভূষণ বিস্মিত ও ভীতভাবে পশ্চাতের দিকে ঘন ঘন চাহিতে চাহিতে যথাসম্ভব শীঘ্র চলিয়াছেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হইলে গোবিন্দরাম এক হাতে আমার কাঁধ ও অপর হাতে অক্ষয় বাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন, "চুপ্।" আমরা যেখানে লুকাইয়া ছিলাম, মণিভূষণ সত্বর পদে তথা হইতে গড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

পর মুহূর্ত্তেই আমি পিস্তলের ঘোড়া তুলিবার শব্দ পাইলাম, গোবিন্দরাম বলিলেন, "আসিতেছে—পিস্তল—পিস্তল——"

তৎক্ষণাৎ আমরা পিস্তল বাহির করিলাম।

তখন সেই মাঠ হইতে যেন কি একটা আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, এরূপ পদশব্দ পাইলাম—কি বিভীষিকা আমাদের দিকে আসিতেছে, তাহা না জানিতে পারিয়া আমাদের প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। আমি সভয়ে গোবিন্দরামের মুখের দিকে চাহিলাম। তাঁহার চক্ষু তখন নক্ষত্রের মত অন্ধকারে তীব্রভাবে জ্বলিতেছিল, কিন্তু সহসা তাহা ঘোরতর বিস্ময়ে পরিণত হইল, এই সময়ে অক্ষয় বাবু ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলেন।

গোবিন্দরাম লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিয়াছিলাম ; কিন্তু যাহা সম্মুখে দেখিলাম, তাহাতে আমার দেহের সমস্ত রক্ত যেন গলিত তুষারবৎ শীতল হইয়া গেল—কি দেখিলাম, তাহার বর্ণনা হয় না,—সে কি ভয়াবহ—কি ভীষণ—কি ভয়ঙ্কর!

অন্ধকার হইতে যাহা বাহির হইল, তাহা কুকুর নিশ্চয়—তবে সেই কুকুরটা প্রায় বাঘের মত বড়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এরূপ জন্তু কেহ কখন দেখে নাই। ইহার মুখ অগ্নিময়, ইহার চক্ষু হইতে অগ্নিধারা বিকীর্ণ হইতেছে, ইহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, এরূপ ভয়াবহ বিভীষিকা আর কখনও দেখি নাই।

এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর পশু লম্ফে লম্ফে ছুটিয়া মণিভূষণের অনুসরণ করিতেছে। আমরা উভয়েই এই ভয়ঙ্কর জন্তু দেখিয়া এতই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম যে, আমরা ইহাকে আমাদের সম্মুখ দিয়াও নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দিলাম, তাহার পরেই গোবিন্দরাম ও আমি দুই জনে এক সঙ্গে পিস্তল ছুড়িলাম। বিকট জন্তুটা একটা

বিকট শব্দ করিয়া উঠিল ; তাহাতে আমরা বুঝিলাম, হয় আমার—না হয় গোবিন্দরামের পিস্তলের গুলি তাহার গায়ে লাগিয়াছে। আমরা আর এক নিমেষও বিলম্ব করিলাম না। উর্দ্ধশ্বাসে সেই জন্তুর দিকে ছুটিলাম।

দূরে মাঠের পথে আমরা মণিভূষণকে দেখিতে পাইলাম, তিনি এক একবার সভয়ে পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন ; ভাবে বোধ হইল, তিনি আরও ভীত হইয়াছেন।

কিন্তু কুকুরটা সেই ভয়াবহ আর্ত্তনাদ করায় আর আমাদের ভয় নাই,গুলিটা নিশ্চয় সাংঘাতিক ভাবে লাগিয়াছে—নিশ্চয় সেটাকে এবার মরিতে হইবে। আমি আর কখনও গোবিন্দরামকে এরূপ প্রবলবেগে ছুটিতে দেখি নাই। আমিও খুব ছুটিতে পারিতাম, কিন্তু গোবিন্দরাম আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিতেছিলেন।

আরও কিছুদূরে গিয়া শুনিলাম, মণিভূষণ প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ; এ কি—তিনি এই ভয়ঙ্কর কুকুরের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না!

কুকুরটা মণিভূষণের উপর গিয়া পড়িল, তিনি ধরাতলে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দরাম পুনঃ পুনঃ কুকুরটার দেহের উপরে,মস্তকে গুলি করিলেন। কুকুরটা বিকট চিৎকার করিয়া সেইখানে গড়াইয়া পড়িল, আমিও গিয়া কুকুরের মস্তকে পিস্তল চাপিয়া ধরিলাম, কিন্তু আর গুলি চালাইতে হইল না—দেখিলাম, তাহার লীলাবসান হইয়াছে।

মণিভূষণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিলাম,কুকুরটা তাঁহাকে কামড়াইতে পারে নাই, তিনি কেবল ভয়ে অজ্ঞান হইয়াছেন। এই সময়ে অক্ষয় বাবুও ছুটিয়া তথায় আসিলেন ; তাঁহার পকেটে সর্ব্বদাই এক শিশি ব্রাণ্ডী থাকিত, তিনি তাহাই মণিভূষণের মুখে ঢালিয়া দিলেন। তখন মণিভূষণ ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "কি—কি ভয়ানক—সেটা কি ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "সেটা যাহাই হউক, আর নাই—সেটা মরিয়াছে। আপনার বংশের ভূতের দফা আজ আমরা রফা করিয়াছি।"

যে জন্তুটা আমাদের সম্মুখে মৃত পড়িয়া আছে, তাহা অতি বৃহৎ হইলেও কুকুর বটে, এই জাতীয় কুকুর কোন লোকের কোন দ্রব্য হইতে তাহার দেহের গন্ধ পাইলে, সে যেখানেই যাউক না কেন, তাহার গন্ধ অনুসরণ করিয়া তাহাকে গিয়া ধরে ও ক্ষুধার্ত্ত থাকিলে তাহাকে অনায়াসে হত্যা করে। কুকুরটার উদর দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম যে, সদানন্দ ইহাকে বহু দিন অনাহারে রাখিয়াছিল।

তখনও তাহার মুখের চারিদিক্ হইতে আগুন বাহির হইতেছিল, আমি তাহার মুখে হাত দিলাম, আমার অঙ্গুলিতে কি লাগিয়া গেল, তাহাও অন্ধকারে আমার অঙ্গুলিতে জ্বলিতে লাগিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, "ফস্ফরাস।"

গোবিন্দরাম তৎক্ষণাৎ মৃত কুকুরের মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "নূতন রকমে প্রস্তুত, দেখিতেছ না যে গন্ধ নাই। রাজা মণিভূষণ, আমি ইচ্ছা করিয়া যে আপনাকে এ বিপদে ফেলিয়াছিলাম, তাহার জন্য আমাকে মাপ করুন। আমি জানিতাম যে, একটা কুকুরের সঙ্গে আমাদিগকে বোঝাপড়া করিতে হইবে, কিন্তু এমন ভয়ানক ব্যাপার লইয়া যে কাজ করিতে হইবে, তাহা মনে হয় নাই।"

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মণিভূষণ তখনও আত্মসংযম করিতে পারেন নাই, তখনও ভীতিবিহ্বল নেত্রে কুকুরটার দিকে চাহিতেছিলেন। গোবিন্দরামের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।"

গোবিন্দ। প্রথমে আপনাকে বিপদে ফেলিয়া—যাহা হউক, এখন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন কি ?

মণি। হাঁ, এখন সুস্থ হইয়াছি। এখন কি করিতে চাহেন ?

গো। আপনার আর কোন ভয় নাই—আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমরা এখনই আসিতেছি; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে দুর্ব্বৃত্ত পলাইবে।

মণিভূষণের তখনও চলিবার মত অবস্থা হয় নাই, তিনি সেইখানে বসিয়া রহিলেন, আমরা তিন জনে সদানন্দের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

ছুটিতে ছুটিতে গোবিন্দরাম বলিলেন, "খুব সম্ভব, আমরা তাহাকে বাড়ীতে পাইব না। নিশ্চয়ই সে বন্দুকের শব্দ শুনিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "এখান হইতে তাহার বাড়ী দূরে, আর হাওয়া অন্য দিকে,—নাও শুনিতে পারে।"

গোবিন্দরাম ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সে নিশ্চয়ই কুকুরটার পিছনে পিছনে আসিয়াছে, সে আমাদের বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাহার লীলাখেলা ফুরাইয়াছে জানিয়া এতক্ষণে পলাইয়াছে, তবু প্রথমে তাহার বাড়ীটা দেখাই আমাদের উচিত।"

আমরা সদানন্দের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে, আমরা সত্বর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘরের পর ঘর খুঁজিতে লাগিলাম, তাহার দুই জন চাকর সভয়ে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল, আমাদের সকলের হাতেই পিস্তল।

বাড়ীর একটা ঘর ভিন্ন আর কোন ঘরে আলো ছিল না; গোবিন্দরাম আলোটা তুলিয়া লইয়া প্রত্যেক ঘর দেখিতে লাগিলেন। একটা ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। গোবিন্দরাম বলিলেন, "নিশ্চয়ই এই ঘরে কেহ আছে। ভিতরে শব্দ হইতেছে, খোল—এই দরজা।"

ভিতরে যেন কে ক্ষীণস্বরে গোঙাইতেছিল। গোবিন্দরাম মুহূর্ত্তমধ্যে দরজা খুলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু সে ঘরে সে দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বৃত্ত নাই—তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম।

গৃহের এক পার্শ্বে একটা থাম ছিল, সে থামে একটা মূর্ত্তি আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ—পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এমনই ভাবে কাপড়ে বেষ্টিত যে, সে পুরুষ কি স্ত্রীলোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। গোবিন্দরাম নিমেষমধ্যে এই মূর্ত্তির মুখ হইতে কাপড় ছিনাইয়া লইলেন, তখন আমরা দেখিলাম, সে মুঞ্জরী—সদানন্দের স্ত্রী।

আমরা তাহার বন্ধন খুলিয়া দিলে সে অবসন্নভাবে মাটীতে বসিয়া পড়িল, তাহার পৃষ্ঠে আমরা স্পষ্ট বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিলাম। অক্ষয় বাবু অবসন্না মুঞ্জরীর মুখেও খানিকটা ব্রাণ্ডী ঢালিয়া দিলেন।

ক্ষণপরে মুঞ্জরী চক্ষু মেলিল, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার কোন বিপদ্ হয় নাই—তিনি তো পলাইতে পারিয়াছেন?"

গোবিন্দরাম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমাদের হাত হইতে পলায়ন করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে, এমন বোধ হয় না।"

মুঞ্জরী। আমি আমার স্বামীর কথা বলিতেছি না, আমি—আমি—রাজার কথা বলিতেছি।

গো। রাজা রক্ষা পাইয়াছেন।

মু। আর কুকুরটা?

গো। কুকুরটা আমাদের গুলিতে মরিয়াছে।

মু। ভগবান আছেন—ভগবান আছেন!

মুঞ্জরী অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেখুন, আমার স্বামী—সে আমার কি দশা করিয়াছে !"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহা দেখিতেছি, যখন আপনার স্বামীর উপর ভক্তি নাই, যখন আপনি তাহার দুর্ব্বৃত্ততা সব জানিয়াছেন, তখন আশা করি, আপনি আমাদের বলিবেন, তিনি কোথায় লুকাইয়াছেন।"

মুঞ্জরী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আমার সে যে দশা করিয়াছে, আমাকে এত কাল যে জ্বালা দিয়াছে, তাহাতে তাহার উপর আমার বিন্দুমাত্র মমতা নাই। বোধ হয়, সে তাহার সেই গুপ্তস্থানে লুকাইয়াছে।"

গো। কোথায় সে গুপ্তস্থান ?

মু। এই মাঠের উত্তর দিকে যে চোরাবালি আছে—তাহারই মধ্যে একটা পাহাড়ের মত আছে, এই পাহাড়ের ভিতর একটা গহ্বর আছে, সেই-খানেই তাহার আড্ডা, নিশ্চয়ই সে সেইখানে পলাইয়াছে।

গো। চোরাবালির দিকে এই রাত্রে গেলে কাহারও কি রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা আছে ?

মু। একটা পথ আছে—সে পথ আর কেহ জানে না,—কেবল সে-ই জানে।

আমরা বুঝিলাম, আজ রাত্রে আর এই দুর্ব্বৃত্তের অনুসন্ধান করা বৃথা, সে কখনই রেলে পলাইবার চেষ্টা পাইবে না, তাহার ন্যায় চালাক লোক অনায়াসেই বুঝিয়াছে যে, গোবিন্দরামের ন্যায় লোক কখনই রেলের পথ বন্ধ না করিয়া নিশ্চিন্ত নাই। প্রকৃতই গোবিন্দরাম পূর্ব্ব হইতে রেল-ষ্টেশন—কেবল রেল-ষ্টেশন কেন, এখান হইতে পলাইবার সকল পথই বন্ধ করিয়াছিলেন, সকল পথেই লোক রাখিয়াছিলেন ; আর এখানে থাকিয়া কোন ফল নাই, ভাবিয়া আমরা মণিভূষণের নিকট চলিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

কারণ !

(আশ্বিন ও কার্ত্তিক যুগ্ম সংখ্যায় "নব্যভারত"তে শ্রীযুক্ত বেণোয়ারী লাল গোস্বামীর 'কেন ?' কবিতা পাঠে।)

(১)

পড়েছি "নৈবেদ্য" আমি ওহে বংশীধারী !
পড়েছি "চোখের বালি !" 'মহেন্দ্র'-'বিহারী'
বিনোদিনী সাথে যাহে করিয়াছে কেলি !
'চিত্রা'রে 'দ্বিজেন্দ্র কবি' পাড়িয়াছে গালি
'দুর্নীতি' দেখায়ে শুধু—এই অপরাধ !
তারি তরে তব চিত্তে এতই বিষাদ !
কেহ কহে রোষে ক্ষোভে, "সম্বর দ্বিজেন !
চুম্বন-চয়নে রত রবীন্দ্র রবেন !"
থাকুন চুম্বনে তিনি, কিবা কার ক্ষতি !
তবে কিনা রোগা তিনি কাহিলও অতি,
পাছে কোন 'ভাল মন্দ' হয় বা তাঁহার—
এই ভয়ে 'দ্বিজু রায়' লয়ে উপকার
লেখনীর শিরে—দিতেছিলা ছিটে ফোঁটা !
কে জানিত 'গোঁড়া' তাঁর সবাই 'আক্কাটা' !
আলোচনা—আলোচনা, উন্নতি বিধান !
'ঈর্ষা' হ'ল নাম তার—হত মতিমান !

(২)

হেথা এস ! বংশীধারী হেথা এস ফিরে !
'মহেন্দ্র' আজিকে দেখ শয্যার উপরে
করিছে আঘ্রাণ—উন্মাদ কামুক হয়ে,
যে শয্যায় ছিলা পূর্ব্বে 'বিনোদিনী' শুয়ে !
বিধবার শয্যা ছি ছি ! করিছে আঘ্রাণ
উন্মত্ত 'মহেন্দ্র' আজ—এর পরিত্রাণ
দুর্নীতি হইতে কেবা করিবারে পারে ?
পারে কিগো "'নৈবেদ্যের' মন্দার মঞ্জীরে ?"
'নৈবেদ্য' নৈবেদ্যে থাক—পরিচয় তার
সুনীতির সাথে সেতো হইবে আবার !
সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষ কিম্বা এ সমালোচনা,
'ঈর্ষা' আখ্যা পাবে শেষে দ্বিজেন জানে না !

কবির গান।

তোরা চুপ কর, তোরা চুপ কর, তোদের করিগো মানা !
এযে শুধু গালি, এযে শুধু দ্বেষ, কলহে দিন যাপনা !
আমার যা' ভাব দিয়েছিতো ফেলে পাঠক-কাঁধে চাপায়ে,
তারা যদি তার নাহি পায় স্বাদ্—মরুগ্ তবে হাঁপায়ে !
তবে যদি কেহ টেকো মাথা নাড়ি' যায়গো টীকা লিখিয়া,—
তবে তার পিছু যেও ওগো প্রিয়, ফুটাতে হুল্ ছুটিয়া !

আগরা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উদ্যান। ১৭ই কার্ত্তিক, রবিবার প্রভাতে চা পান করিয়া ক্যাণ্টনমেণ্ট গার্ডেন (Cantonment gardeu) নামক উদ্যানে উপনীত হইলাম। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুরক্ষিত এই সুরম্য উদ্যান নগরীর একটি অলঙ্কার। ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজিতে উদ্যানটী পরিপূর্ণ। উদ্যান মধ্যে ঝিলও আছে। ভ্রমণপথগুলি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই উদ্যান মধ্যে আড্যামস্ নামক জনৈক ইংরাজপুঙ্গবের স্মৃতি রক্ষাকল্পে একটি অত্যুচ্চ বিচিত্র প্রস্তরস্তম্ভ রচিত হইয়াছে।

ইতমদ্দৌলা। উদ্যান পরিদর্শনান্তে ইতমদ্দৌলা দেখিতে গেলাম। ইহা যমুনার বাম উপকূলে একটি উদ্যান মধ্যে অবস্থিত। নৌসেতু (Ponton bridge) দ্বারা যমুনা পার হইলাম। এখানকার লোকে এই সেতুকে পিপা-কা-পুল বলিয়া থাকে। আমি একা করিয়া গিয়াছিলাম; একাভাড়া ব্যতীত পুলের অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইল। পদব্রজে গমনকারী পথিকদিগের প্রত্যেককে এক পয়সা করিয়া মাশুল দিতে হয়। অশ্বযানে গমন করিলে ভাড়া ব্যতীত অতিরিক্ত ।।৹ আনা মাশুল লাগে। এই নিয়মটি ভাল নহে। অনভিজ্ঞ পথিকদিগকে সময়ে সময়ে ইহার জন্য অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

যমুনা পার হইয়া তীরবর্ত্তী পথের অনুসরণ করিয়া ইতমদ্দৌলার সুদৃশ্য তোরণ সমীপে উপনীত হইলাম। সৌধের বর্ণনার পূর্ব্বে ইহার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে প্রপীড়িত হইয়া পারস্যনিবাসী মীর্জ্জা গিয়াস্‌বেগ তিহারাণ হইতে ভীষণ মরুপথ অতিক্রম করিয়া সপরিবারে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বাদশাহ হুমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শাহের অতিথিরূপে পারস্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গিয়াসবেগের পিতা খাজা মহম্মদ শরিফের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। মহম্মদ শরিফের মৃত্যুর পর গিয়াসের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভের আশায় তিনি দুই পুত্র,

একটি কন্যা ও গর্ভবতী পত্নী সমভিব্যাহারে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কান্দাহারের সন্নিহিত মরুবক্ষে তদীয় পত্নী একটি রূপসী কন্যা প্রসব করিলেন। মহারৌদ্রে তৃণতরুজলশূন্য ভয়ঙ্কর মরুভূমে সদ্যোজাত শিশুকন্যা মৃতকল্প হইয়াছিল। এরূপ কথিত আছে যে, এক ভীষণ অজগর ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্রতাপ হইতে অসহায় শিশুকন্যার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এই কন্যাই ভবিষ্যতে "নূরজাহান' নামে ভারতের সম্রাজ্ঞী হইয়াছিলেন।

নানা বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াসবেগ আগ্রায় উপনীত হইলে কোন বিশিষ্ট বণিকের সাহায্যে সম্রাট আকবরের সহিত পরিচিত হইলেন। নির্ব্বাসিত হুমায়ুনের তত্ত্বাবধায়কের পুত্র গিয়াসবেগকে সম্রাট মহাসমাদরে আশ্রয় দান করিয়া একটি রাজকর্ম্ম প্রদান করিলেন। অচিরে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে প্রীত হইয়া সম্রাট তাঁহাকে ধনাধ্যক্ষের পদে উন্নীত করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী গিয়াসের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলে তিনি উজীর বা প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইয়া সম্ভ্রমসূচক 'ইতমদ্দৌলা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইংরাজি ১৬২২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর গমনকালে পথিমধ্যে পঞ্জাব প্রদেশের কাঙ্গরা নামক স্থানে তাঁহার দেহাবসান হয়। তদীয় দুহিতা নূরজাহান শবদেহ গন্ধপ্রলেপে সুবাসিত করিয়া আগ্রায় আনয়ন করিয়া যমুনাতীরে সমাহিত করেন। তাঁহারই সমাধিহর্ম্ম্য 'ইতমদ্দৌলা' নামে বিখ্যাত।

সমাধিহর্ম্ম্য দ্বিতল। চারিকোণে চারিটি মিনার সংযুক্ত প্রথম তলের ছাদের ঠিক মধ্যস্থলে মর্ম্মর রচিত অতীব সুচারু চতুষ্কোণ মণ্ডপ। মর্ম্মর প্রস্তরের জালী দ্বারা আবৃত। প্রতি কক্ষের প্রাচীর গাত্রে নানাবিধ রঙ্গিণ প্রস্তরের খচিত কারুকার্য্য (Mosaik work) বড়ই মনোমুগ্ধকর। সমাধিসৌধের বাহ্যদৃশ্য একখানি সুচিত্রিত চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নিম্নতলের মধ্যভাগে উজীর ও তদীয় পত্নী জহরবেগমের কবর পাশাপাশি অবস্থিত। সমাধি গৃহটী আরবীয় প্রথায় রচিত ও মর্ম্মর রচিত কক্ষ-আস্তরণ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে সুশোভিত। ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কক্ষে উজীর ও উজীর পত্নীর প্রকৃত কবর। বিপুল দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য হইতে চিরঅবসর গ্রহণ করিয়া উজীর মহোদয় পত্নীসহ সমাধিতলে চিরবিশ্রাম ভোগ করিতেছেন। সমাধিভবনের অপরাপর কক্ষে রাজপরিবারস্থ অন্যান্য বিশিষ্ট নরনারীগণ মরণের মহাস্বপ্নে চিরাভিভূত হইয়া রহিয়াছেন।

এই সৌধের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম শিল্পসমন্বিত কারুকার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক মোগল সৌধশিল্পের ইহাই প্রথম নিদর্শন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহাকে আদর্শ করিয়া সম্রাট সাজাহানের সময় অপূর্ব্ব মনোহর হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সামাধিকক্ষের প্রাচীর গাত্রে মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বিবিধ শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। বিচিত্র প্রস্তরের দ্বারা অক্ষর সন্নিবেশিত। তরুলতাফুল ফুল বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে রঙ্গিণ প্রস্তরের দ্বারা প্রাচীরবক্ষে বিন্যস্ত হইয়াছে। তাজগৃহে এই প্রকার শিল্পের পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়।

সৌধশিখরে উপবেশন করিয়া কিয়ৎকাল প্রভাতের শীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে যমুনার পরপারে সৈকতশোভিত নগরীর দৃশ্য দর্শন করিয়া রামবাগ দেখিতে গমন করিলাম।

রামবাগ। ইতমদ্দৌলা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে রামবাগ অবস্থিত। ইহা বাদশাহী আমলের প্রাচীন উদ্যান। ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বাবরশাহ এই উদ্যান সন্নিবিষ্ট করেন। কেহ কেহ ইহাকেই তাঁহার রচিত চরবাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহারাষ্ট্রেরা এই উদ্যানের রামবাগ নামকরণ করে। বর্ত্তমান সময়ে আগ্রায় চরবাগ বলিয়া কোন উদ্যানের অস্তিত্ব নাই। এই উদ্যানই বাবর রচিত উদ্যানসমূহের মধ্যে আজিও বাঁচিয়া আছে। সুদূর অতীতের বিস্মৃত স্মৃতির ক্ষীণ চিত্র-অবশেষ এই উদ্যান দেখিয়াই স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া থাকে।

যখন আমি উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম তখন রৌদ্রতেজ ক্রমশঃ খরতর হইতেছিল। আমি একটি ছায়াময় বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া কিছুক্ষণ বিরাম সুখ উপভোগ করিয়া লইলাম।

এই উদ্যানটী বাদশাহী আমলের হইলেও প্রাচীনত্বের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। তবুও পূর্ব্ববৈভবের নষ্ট-শ্রী এখনও ইহার অঙ্গে পরিদৃষ্ট হয়। যমুনা-তীরে কয়েকটী কক্ষের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দু'একটি প্রাচীন বৃক্ষের কুম্ভীরবৎ অবয়ব দেখিয়া অতি পুরাতন বলিয়া মনে হইল। উদ্যানের একপার্শ্বে কদলীকুঞ্জ। এই দূরদেশে রৌদ্রদগ্ধ ভূমিখণ্ডে ফলজলপূর্ণা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর দীর্ঘ হরিতোজ্জ্বল কদলীপত্র স্বরূপ শ্যামাঞ্চল মৃদুল পবনে তরঙ্গায়িত দেখিয়া আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কদলীকুঞ্জে ছোট ছোট মোচা হইয়াছে। মালীকে মূল্য জিজ্ঞাসা

করায় সে ভালমন্দ হিসাবে এক একটীর মূল্য চারি আনা ও ছয় আনা বলিল। আমি দশ আনা মূল্যে দুইটী মোচা ক্রয় করিয়াছিলাম।

রামবাগে একটী আধুনিক সুন্দর দ্বিতল প্রমোদ ভবন বিরাজিত। আগ্রা-বাসী ভদ্রলোকগণ এইখানে উদ্যানভোজ,অবকাশে আমোদপ্রমোদ ও নৃত্য গীত প্রভৃতি বিলাস উপভোগ করিয়া থাকেন।

নূরজাহান বেগম এই উদ্যানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই উদ্যানকে লোকে রাণীবাগ বলিত। সেই স্বর্ণচূড়াশ্রেণী পরিশোভিত চিত্রপ্রতিম বিরামমন্দির উদ্যান মৃত্তিকায় বহুকাল বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহার চিহ্নাবশেষও নাই। বাবরশাহ এই উদ্যানে সুদূর অতীতের চন্দ্রালোকে সুরাসেবিত ও সুন্দরী ললনাকুল পরিবৃত হইয়া বিপুল বিলাস করিয়াছিলেন ও মৃত্যুর পরে প্রথমে এই খানেই সমাহিত হইয়াছিলেন। আমি অনেক প্রাচীন স্মৃতিমাল্যে মর্ম্ম বিজড়িত করিয়া উদ্যান পরিত্যাগ করিলাম।

চিনি-কা-রোজা। রামবাগ হইতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে একটি পুরাতন ভগ্ন মস্‌জীদের ন্যায় সৌধ দেখিয়া এক্কা হইতে অবতরণ করিলাম। প্রবেশ পথের পার্শ্বেই একটী স্তম্ভে প্রস্তর ফলকে চিনি-কা-রোজা ইংরাজী ভাষায় লিখিত আছে। পূর্ব্ব-শ্রী ইহার অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। কতকগুলি রঙ্গিণ কাচখণ্ড ইহার অঙ্গ মণ্ডিত করিয়া ক্ষীণ সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছে। ইহা আফজল খাঁর সমাধি। তিনি জীবদ্দশায় ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে (১৬১৭) সিরাজ নিবাসী সাহিত্য-বিদ্ মৌলবী সরকুল্লা সুরাটে আসিয়া জাহাঙ্গীরের অধীনে রাজকার্য্য গ্রহণ করেন। সাজাহানের সময় তিনি দেওয়ানের পদ লাভ করেন। ইনিই ইতিহাসে আফজল খাঁ নামে বিখ্যাত। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তথা হইতে আগ্রায় মৃতদেহ আনীত হইয়া তাঁহার স্বরচিত সমাধিহর্ম্ম্যে সমাহিত করা হইয়াছিল।

সেকেন্দ্রা। ১৯ শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩০৮ অদ্য আমার জীবনের একটী স্মরণীয় দিন—সুপ্রভাত। আজ আমি সেকেন্দ্রা দর্শন করিব। মোগল-কুল-কেশরী সম্রাট আকবরের পুণ্য সমাধিভূমি নিরীক্ষণ করিয়া নয়নচক্ষু সার্থক করিব। কি দেখিব? দেখিব সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান! সম্রাটের মহাশ্মশান! কীর্ত্তি গৌরবের মহাশ্মশান! ঐশ্বর্য্যের মহাশ্মশান! এমন শ্মশান ভারতে

আর কোথাও আছে কি? সেই ব্রহ্মাণ্ডঘোষিত গৌরবগরিমা সেকেন্দ্রার নির্জ্জন শ্মশানে পর্য্যবসান হইয়াছে! সেই মহাদৃপ্তোজ্জ্বল সম্রাটদেহ পার্থিব ধূলায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! সেই কীর্ত্তিদীপ্ত বজ্রনিনাদী নামের প্রতিধ্বনি সমাধির ঘোর অন্ধকারময় গহ্বরতলে গিয়া লুকায়িত হইয়াছে! আমি চর্ম্মচক্ষে সেই বিশ্বগ্রাসী শ্মশানের মহা বৈরাগ্যভাব দর্শন করিব, তাই বলিতেছিলাম আজিকার দিন আমার জীবনের একটী স্মরণীয় দিন!

রজনী প্রভাত—আকাশ কুজ্ঝটিকাময়! বিলক্ষণ শীত বোধ হইতে লাগিল। এক পেয়ালা গরম চা ও রুটি মাখনে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া একারোহণে সেকেন্দ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পক্ষীরাজ অশ্ববর আমার দেহের সমস্ত ধমনীতে খরপ্রবাহে শোণিত সঞ্চালিত করিয়া মন্দবেগে ছুটিতে লাগিলেন। আগ্রার জনাকীর্ণ রাজপথ অতিক্রম করিয়া আমি প্রাচীন দিল্লীদ্বার দিয়া নগরের বহির্দ্দেশে আসিয়া পড়িলাম। পথের উভয় পার্শ্বে বহুল প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতে লাগিল! কোথাও রক্ত-প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর পরিবেষ্টিত পুরাতন উদ্যান! কোথাও ভগ্নচূড় মস্‌জীদ, কোথাও ধূল্যবলুণ্ঠিত সৌধাবশেষ, দীর্ঘিকা, বাউলী ও কূপ প্রভৃতি কালের বিশ্বধ্বংসী লীলার নিদর্শনরূপে বিরাজিত হইয়া অতীত ঐশ্বর্য্যের ম্লান স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেখিতে অতীতের স্মৃতিভারে প্রাণ ভোর করিয়া সংসারের সমস্ত জ্বালা বিস্মৃত হইয়া চলিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ সেকেন্দ্রার নভোচুম্বী রক্তোজ্জ্বল তোরণ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল! আমি অনিমিষ নেত্রে দেখিতে দেখিতে তোরণ সমীপে উপনীত হইলাম।

ভূমিতল হইতে দ্বারের উচ্চতা ৭০ ফিট। তোরণদ্বারের চারিদিকে কোরাণ হইতে বয়েদ উদ্ধৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের অক্ষরে বিন্যস্ত হইয়াছে। বিচিত্র স্থাপত্য কৌশলে দ্বিতল তোরণ নির্ম্মিত। উপরে উঠিবার জন্য ভিতর দিয়া সোপানশ্রেণী সংযুক্ত। এই তোরণ আকবরের সমাধিরই উপযুক্ত। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জাঠেরা সূর্য্যমলের অধীনে আগ্রা বিধ্বস্ত করিয়া ইহার মিনার চতুষ্টয়ের শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া দেয়। কীন সাহেব বলেন কতকগুলি গোরা সৈন্য উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়, তাই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক মিনার ভগ্ন করিতে আদেশ দেন। কিন্তু ভ্রমণকারী হিউজ সাহেব ১৭৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহার চূড়াদেশ ভগ্ন দেখিয়াছিলেন। সুতরাং জাঠদল কর্ত্তৃকই মিনার ভগ্ন হইয়াছিল। *

---

* শুনিয়াছি সম্প্রতি লর্ড কর্জ্জন মিনারশীর্ষ পুনর্গঠন করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের কথা।

তোরণ অতিক্রম করিয়া উদ্যানপথ দিয়া সমাধিমন্দির দর্শনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সম্মুখেই পঞ্চতল বিরাট সৌধ আমার চিত্ত বিস্ময় রসে পরিপ্লুত করিল। এরূপ বিচিত্রদর্শন সমাধিহর্ম্ম্য ভারতবর্ষে আর নাই। কেন্ সাহেব বলিয়াছেন যে, তাজমহলের নিম্নেই সেকেন্দ্রা স্থান পাইতে পারে। এ মত কতদূর ঠিক তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে মহম্মদ তোগলকের সমাধি, হুমায়ুন টুম্ব, সেরশাহের রোজা, সফদর জঙ্গ, নীজামুদ্দিন, আলতামাস কবর, রসিনারা বাগ ও লক্ষ্ণৌয়ের নবাবউজীর ও রাজাগণের যে সকল সমাধি-মন্দির দর্শন করিয়াছি, কোনটিই সেকেন্দ্রার সহিত সাদৃশ্যে তুলনীয় হইতে পারে না। ইহার স্থাপত্যকৌশল, শিল্পসৌন্দর্য্য ও বাহ্যদৃশ্য উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমাধি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের।

বিশাল সম-চতুষ্কোণ (৪০০ × ৪০০) বেদীর উপর সমাধি মন্দির সংস্থাপিত। উচ্চতায় প্রথম তল ৩০ ফিট, দ্বিতীয় ১৫ ফিট, তৃতীয় ১৫, চতুর্থ ১৫ ও পঞ্চম তল ছাদহীন। সর্ব্বসমেত উচ্চতায় প্রায় ১০০ ফুট হইবে। এই প্রকাণ্ড সৌধের বনিয়াদ ১২ ফিট প্রশস্ত খিলানের উপর গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম চারি তল রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত কিন্তু পঞ্চম তল সমস্তই মর্ম্মর বিনির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন সৌধের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য চাঁদনী, বুরুজশ্রেণী ও শিরোরত্ন সমূহ প্রত্যেক তলের শিরোভাগে বিচিত্র শোভায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পঞ্চম তলের মর্ম্মর প্রাচীরের কারুকার্য্য অতিশয় মনোহর। মর্ম্মরখোদিত সূক্ষ্ম জাফরী (trellis work) এত সুন্দর যে দেখিলে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। মর্ম্মর রচিত সুচারু স্তম্ভশ্রেণী পরিপাটি রূপে গঠিত হইয়াছে। মর্ম্মর প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে আরবী ভাষায় কোরাণ হইতে ৯৯ প্রকার ঈশ্বরের মহিম্ন স্তোত্র লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চমতলের মধ্যভাগে মর্ম্মর-রচিত শিল্পফুলে সুশোভিত সম্রাট আকবরের অনুকৃত কবর। নিকটেই একটী মর্ম্মরপাত্র সমন্বিত সুদৃশ্য স্তম্ভ। শুনিলাম উক্ত পাত্রে কোহিনুর হীরক রক্ষিত হইত। কেহ কেহ বলেন উহাতে স্বর্ণ ধুনিতে ধুপ ধুনা প্রভৃতি গন্ধরস প্রজ্বলিত হইত।

সেকেন্দ্রাশিখর হইতে শ্যামবনরম্যকাননকুন্তলা ধরিত্রীর শোভা বড়ই নেত্রবিমোহন। জাফরির ভিতর হইতে যতদূর দেখিতে পারা যায় ততদূর কানন ও উদ্যানরাজী মরকত হরিত শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। উত্তরপূর্ব্বে মৃদুমন্থরবাহিনী বক্রগামিনী যমুনা হরিত প্রান্তরের মধ্য দিয়া রজত

সাটীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। অদূরে চিরশোভনা আগরা নগরী গগনমার্গে বিচিত্র বিমানের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাজমহলের স্বর্ণকীরিটশোভিত বিরাটধবল গম্বুজ ও মিনার চতুষ্টয় সূর্য্যকিরণে ভাসমান রহিয়াছে। যেন শরতের নীল নিথর গগনে হেম চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে।

আগরার মসজীদ মিনারে, সৌধচূড়ে, প্রাসাদশিখরে, ও দুর্গশীর্ষে স্বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তি বিকশিত হইতেছে,—আর সুদূর দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল তরুরাজীর বক্ষভেদ করিয়া ফতেপুর-শিক্‌রির নীলাকাশচুম্বিত, 'বুলন্দ দরওজা' সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া সুদুর অতীতের মহাশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে! অদ্য সেকেন্দ্রা শিখর হইতে যে অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দেখিলাম তাহা জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না! আবার কবে এ জীবনে এ দৃশ্য দেখিব!

সৌধশিখর হইতে প্রথম তলে অবতরণ করিয়া আকবরের সমাধি দর্শন করিতে গেলাম। কক্ষআস্তরণ পূর্ব্বে স্বর্ণমণ্ডিত বিচিত্র রঙে চিত্রিত ছিল, কালমাহাত্ম্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আস্তরণের নষ্ট-শ্রীর পুনরুদ্ধার করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন কিন্তু সামান্য অংশ পুনরুদ্ধার করিতে গিয়া বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হওয়াতে সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

উক্ত কক্ষ হইতে একটী পথ নিম্নগামী। ঐ পথ অবলম্বন করিয়া প্রকৃত সমাধিস্থলে উপনীত হইলাম। অন্ধকার বলিয়া প্রদর্শক প্রদীপ লইয়া আসিল কিন্তু অকস্মাৎ দীপ নিবিয়া গেল! আমি স্তব্ধভাবে ও মৌনমুখে সমাধি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভরে ও মহা সম্ভ্রমে সম্রাটের উদ্দেশে মস্তক অবনত করিলাম।

সমাধির নিকট মহাত্মা আকবরের ধর্ম্মগ্রন্থ, রাজপরিচ্ছদ, রাজদণ্ড, রাজমুকুট ও যুদ্ধাস্ত্র রক্ষিত ছিল। জাঠেরা সেকেন্দ্রা বিধ্বস্ত করিয়া রাজ আভরণ ভরতপুরে লইয়া যায়। লর্ড নর্থব্রুক সমাধি আচ্ছাদনের জন্য যে বহুমূল্য জরীর কার্য্য সমন্বিত বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে।

সেকেন্দ্রা উদ্যান। সমাধি ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ সুবিশাল রমণীয় উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। নানা জাতীয় পুষ্প বৃক্ষ লতা প্রভৃতি দেখিয়া নয়ন জুড়াইয়া গেল। প্রায় তিন শত বিঘা পরিমিত ভূমি অধিকার করিয়া এই অপূর্ব্ব নন্দনকানন তুল্য উদ্যান রচিত হইয়াছে। দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় প্রাচীর ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য এক মাইলের অধিক হইবে।

নির্ম্মাণ কার্য্য। সেকেন্দ্রা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় পনের লক্ষ মুদ্রা শ্রমজীবী ও স্থপতিগণকে (Engineers) দিতে হইয়াছিল। আকবর স্বয়ং ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করিয়া সাত বৎসরে ইহার গঠনকার্য্য সম্পূর্ণ করেন। ইহা শেষ হইতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছিল যে, জাহাঙ্গীর ধৈর্য্যহারা হইয়া শীর্ষদেশে গম্বুজ নির্ম্মাণের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া লাহোর যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে সেকেন্দ্রা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধিমন্দির বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে টমাস্ হারবার্ট নামক জনৈক ইংরাজ ভ্রমণকারী এই সমাধি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—"Such a monument the sun through all the world sees none more great." আমি বহু স্মৃতিজালে চিত্ত বিজড়িত করিয়া সেকেন্দ্রার সমাধিভবন পরিত্যাগ করিলাম।

আগরা হইতে সেকেন্দ্রার পথে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেগুলি দেখিবার সময় অতি অল্প পরিব্রাজকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। বিশপ হিবার যথার্থই বলিয়াছেন—"There are many other ruins in the vicinity some of them apparently handsome, but Akbar's tomb leaves a stranger little time or inclination to look at anything else."

সেকেন্দ্রা। এই স্থানের নাম সেকেন্দ্রা কেন হইল এ বিষয়ে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। ঐতিহাসিকেরা বলেন এই স্থানে সেকেন্দর লোদীর প্রমোদ-উদ্যান ছিল। রাজকার্য্য হইতে সময়ে সময়ে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম ও আমোদ উপভোগ করিতেন। তদবধি এই স্থানের নাম সেকেন্দ্রা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

কবি-যুগলের পত্রব্যবহার

বোলপুর—শান্তিনিকেতন।

২রা কার্ত্তিক, ১৩১৬।

শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন বাবু,

আপনি আমার 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের দুর্নীতি দেখাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন, এজন্য অনেক 'বালক' আপনার পদে হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

"………লজ্জা সরম তেয়াগি'
'রবিপ্রেম' নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
'নীতিরে' ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
'বালকেরা' চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।"

এই শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি শুনিয়া ও তাহাদের 'ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা' দেখিয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। শুনিলাম ইতিপূর্ব্বে কোনো কোনো বাংলা মাসিক পত্রিকাও নাকি আপনার নিন্দা গাহিয়া গেছে। কিন্তু, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, নিন্দার চর্চ্চা সমস্ত মানব সমাজকে আদ্যন্তমধ্যে জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাহাকে একেবারেই মন্দ বলিয়া বসা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির কাজ। কারণ পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে। বয়স বিবেচনা করিয়া ইহার প্রতি কতকটা সম্মান এবং শ্রদ্ধা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা ছোট, এবং আজ আছি কাল নাই, যে পরনিন্দা আমার চেয়ে অনেক বৃহৎ এবং অনেক দিন টিকিয়া আছে, তাহার প্রতি একটা অন্ধবিশ্বাস রাখাও আমি দোষের বিবেচনা করি না।

নোনাজল পানের পক্ষে উপযোগী নহে, একথা শিশুও জানে, কিন্তু যখন দেখি, সাত সমুদ্রের জল নুণে পরিপূর্ণ; যখন দেখি, এ নোনাজল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তখন একথা বলিতে কোন মতেই সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে নুন না থাকিলেই ভাল হইত। নিশ্চয়ই ভাল হইত না—হয়ত লবণ জলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত। তেমনি, পরনিন্দা সমাজের

কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের অনর্থ ঘটিত। সংসারে আবর্জ্জনার অবধি নাই, সে সমস্ত পচিয়া প্রেমসমুদ্রকে বীভৎস করিয়া তুলিত—সমুদ্রের সর্ব্বত্র বিদ্বেষ এবং নিন্দার ক্ষারে মিশিয়া আছে বলিয়াই নিস্তার! আপনি ভাগ্যবান এই জন্যই বোধ হয় জনকয়েক বালক আপনার বিরুদ্ধে তাহাদের নিন্দার উৎস খুলিয়া দেছে। বস্তুতঃ, নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভাল কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না—সে ভালকাজের দাম কি! কাব্য সমালোচনা সাহিত্যের উন্নতি বিধায়ক। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত সমালোচনা নাই বলিলেই হয়। আপনি এই নির্ভীক সমালোচনা করিয়া নিন্দিত হইতেছেন। কিন্তু, নিন্দার রায় চূড়ান্ত রায় নহে—নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন কি নিন্দাবাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া সুবুদ্ধি বলিয়া গণ্য।

সকল কাজে সকল চেষ্টায় বিশ্বশুদ্ধ লোকের কাছে সমানভাবে যে লোক বাহবা লইয়া গেছে, নিশ্চয়ই সে ফাঁকি দিয়াছে। নিশ্চয়ই সে কাজের চেয়ে লোকের স্তুতিকে বেশী করিয়া চাহিয়াছে। মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়, ইহাতে তাহার পদে পদে পরীক্ষা হইয়া থাকে। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে, শুধু তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ! আমি বলি নিন্দা, দুঃখ, বিরোধ যেন ভাল লোকের, গুণীলোকের, যোগ্যলোকের ভাগ্যেই বেশী করিয়া জোটে। যে যথার্থরূপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে, সেই যেন ব্যথা পায়! অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দা বেদনার অনাবশ্যক অপব্যয় না হয়!

আমার কাব্যের সহিত এখন আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল মন্দ তাহা বিচারের ভার পাঠকদের উপর। তাহাদের প্রতি আমার একেবারেই মায়া নাই বলিলে, নিজেকে বড় করা হয়, এজন্য বলিলাম না। তবে তাহার উপযুক্ত সমালোচনা হইলে কোনোই ক্ষতি নাই! আমিও তরুণ বয়সে 'মেঘনাদবধের' সমালোচনা করিতে বসিয়া যে সকল ভুল করিয়াছিলাম, পরে পরিণত বয়সে তাহা সংশোধন করিয়াছি। আপনার সমালোচনাও দোষেগুণে জড়িত হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য উভয় পক্ষীয় অন্ধোপাসকদের দলাদলির স্রোতে আমরাও যেন গা ভাসাইয়া না দিই! ইতি।

সম্ভবতঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা

২০শে কার্ত্তিক, ১৩১৬।

শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবু,

ঠিক বলেছেন;—কিন্তু দেখলেন, বাঙ্গলা দেশের অর্ব্বাচীন গুলার বিদ্যাবুদ্ধি! তাদের জ্ঞানহীনতা ও রকম দেখে 'ইচ্ছা হয় যে দৌড় মারি কটকে কি পাবনায়।' আমাকে যাহারা আক্রমণ করেছে ও গালি দিয়েছে, যথার্থ বলিতে কি, তাহারা curious commodities, literary oddities তাহাদের প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হয়! আর মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—

"আমি হাসব কি কাঁদব সখি,
কি তারে বলব!"

আপনার কাব্যের দুর্নীতিও আমি যেমন দেখিয়েছি, আবার ইচ্ছা আছে তাহার সৌন্দর্য্য ও সুনীতি গুলিও তেমনি দেখাইব। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি কোনও বিষয়ে অপেক্ষা করিতে চায় না—চট্‌পট্‌ সব একসঙ্গে দেখিতে চায়। একটা হুজুক চায়, মজা করিতেই ভালবাসে। বোমার হুজুকে ভাঁটা পড়েছে, কাজেই এখন এরা এই একটা সোরগোলে ভারি জমে আছে। ইতি

সম্ভবতঃ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

উল্লিখিত পত্রদ্বয় রঙ্গ করিবার জন্য লিখিত হয় নাই। আমরা উহা অর্চ্চনা কার্য্যালয়ের সন্নিকটে কুড়াইয়া পাইয়াছি। Internal Evidence (আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য) হইতে বোধ হয় পত্র দুইখানি প্রকৃতই কবিদ্বয়ের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু হস্তাক্ষর প্রভৃতি অপরাপর সাক্ষ্য মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে উক্ত ধারণা নির্ভুল নহে। পত্র দুইখানি যে কবিদ্বয়ের মত মনীষীদের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের (উচ্চ নীচ অভেদে) মধ্যে যেরূপ দলাদলি ও মাসিক পত্রিকার মারফৎ রবীন্দ্রবাবু ও দ্বিজেন্দ্র বাবুর 'গোঁড়ারা' যেরূপ 'খেউড়' গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তাহা নিতান্তই ভদ্রতা বিরুদ্ধ। রবীন্দ্রবাবু ও দ্বিজেন্দ্রবাবু উভয়েই অন্ধোপাসকগণের কবল হইতে পরিত্রাণের আশায় সম্ভবতঃ ভগবানের নিকট দরখাস্তের উপর দরখাস্ত পেশ্‌ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু, জেনারেল পোষ্ট

আফিসের কার্য্যতৎপরতার গুণে বোধ হয় উত্তর আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিতেছে। এই জন্যই 'গোঁড়া'দের অম্লরস ক্রমে তিক্তরসে পরিণত হইবার অবসর ঘটিয়াছে।

এখন তাঁহারা কি বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া উল্লিখিত পত্রদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশও করিবেন না ?

সাম্য ও মৈত্রী।

আশ্রয়।

বিহঙ্গ উড়িতে যায় গগনের চারিধার,
ধরা বক্ষে লুটে পড়ে—করে শুধু হাহাকার !
ছিন্ন তার এক পক্ষ—ব্যাধ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে,—
তথাপি বাঁচিতে চায় এক পক্ষ বুকে লয়ে !
কি মমতা, কি বাসনা তবুও বাঁচিবে হায় !
আশে পাশে চাহে আর লুকাবার স্থান চায় !
পাছে যায় শেষ পক্ষ—ওই বুঝি ব্যাধ আসে,
প্রতি শব্দে মৃত্যু গণে, কাঁপিতেছে মহাত্রাসে !
দেখিয়া বারেক তারে—দেখি ফিরে আপনারে–
লইলাম ছুটে গিয়ে আপনার বক্ষে তারে।
জুড়াইল হিয়া মোর—উভয় ব্যথার ব্যথী—
বাঁচিল বিহঙ্গ, তার দূরে গেল ব্যাধ ভীতি।
আমিও বিহঙ্গ প্রায়—নিষাদের তীক্ষ্ণ শরে
এক পক্ষ দেছি কাল, এক পক্ষ আছি ধরে !
এ ব্যাধ চাহে না মোরে, লক্ষ্য তার পক্ষ পানে-
শোকানলে প্রতি পলে পোড়াইতে শুধু জানে !
এ ব্যাধের শর যে গো লক্ষ্য ভ্রষ্ট নাহি হয় !
আমারে আশ্রয় দিতে কে আছ ভুবনময় !

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

মৌলিক প্রবন্ধ।

আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে যতই কেন স্পর্দ্ধা করি না, বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে একটু সময়াতিবাহিত করিলেই বুঝিতে পারি যে, চিত্তোৎফুল্লকর ফলফুলশোভী বৃক্ষরাজি অপেক্ষা আমরা সাহিত্য-কাননে অধিক পরিমাণে আগাছাই রোপণ করিতেছি। কিন্তু এই আগাছাগুলা যে অন্যের উদ্যানের জরাজীর্ণ বা পরিত্যক্ত বৃক্ষের শাখা পল্লব তাহা সহজে বুঝিতে একটু বিলম্ব হয়। যাঁহারা এ সাহিত্য লইয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন, কেবল দূর হইতে ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে না দেখিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক অঙ্গটি যদি কেহ পরীক্ষা করেন তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন যে, আমরা আজকাল যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছি তাহার মস্তকটি হয়তঃ ইংরাজী—ইংলণ্ডের সাহিত্যের সপ্তদশ শতাব্দীর এক মৃতভাব দ্বারা গঠিত, কোনও অবয়বে ফরাসীদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজ্য বিপ্লবকারীদিগের স্বাধীন ভাবের সমাবেশ আর সর্ব্বাঙ্গেই অতি প্রাচীন সর্ব্বদেশপূজ্য অধুনালুপ্ত সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার হইতে গৃহীত জীর্ণ মলিন ভাবের লেপন। অবশ্য ভাষাটা বঙ্গদেশীয়, অধিকাংশ সময়েই বেশ মোলায়েমভাবে যমুনার স্রোতের মত তর তর বেগে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া যায়। কেবল ভাব গুলাই সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজস্ব নহে।

এই অপর সাহিত্য কানন হইতে অপহৃত ভাবগুলা ষোল আনা তথাকার নয় বলিয়াই আমাদের এত নিরাশা. বঙ্গীয় সাহিত্য-কাননটা এত অহিতকর পত্র পুষ্পে সমাচ্ছন্ন! আমরা পরের দ্রব্য যদি পূর্ণমাত্রায় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আমা-দের গৃহ সজ্জিত করি, তাহা হইলেও তো জিনিসটার অধিস্বামী আমরাই হইব, লোকে না হয়ত বলিবে বিদেশী দ্রব্যে বা অপরের নির্ম্মিত সরঞ্জামে ঘর সাজাই-য়াছে। কিন্তু পরের দ্রব্যকে স্বকীয় করিবার জন্য তাহাকে একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া আমার স্বহস্ত নির্ম্মিত একটা অপদার্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইবার চেষ্টায় একটা বিকট দেহবিশিষ্ট কিম্ভূত কিমাকারের সৃষ্টি করিব, সেই নীতি কোন্ নীতিবাদী সম্মত? মিলানের ক্যাথিড্রল গির্জ্জার চূড়া কাটিয়া আনিয়া আমাদের জীর্ণ কালের অত্যাচার নিপীড়িত গ্রাম্য ভগ্ন কুটীরের উপর বসাইয়া দিলে যেরূপ বিসদৃশ হয়, আমাদের মধ্যে দিন দিন যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে

অধিকাংশই সেইরূপ বিকট দর্শন। যদি পরের মত বাঙ্গলা ভাষায় প্রকটিত করিবে তো কর কিন্তু তাহাতে তোমাদের অল্পবুদ্ধির ভেজাল মিশাইয়া সমস্ত-টাকে "মৌলিক" করিবার চেষ্টা করিও না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। হার্ব্বার্ট স্পেনসারের উচ্চ বৈজ্ঞানিক মতের একটুকরা চুরি করিয়া সেটাতে নিজের প্রতিভার ক্ষীণ রশ্মি সঞ্চারিত করিয়া সমস্তটাকে একটা প্রভাময় "মৌলিক" ভাবপ্রদীপ বলিয়া তাহার দীপ্তিতে আমাদের এই সাহিত্য-গৃহ আলোকিত করিতে চেষ্টা করার নাম মাতৃসেবা নহে। যেমন এক পাত্র দুগ্ধে এক বিন্দু গোময় পতিত হইলে সমস্ত দুগ্ধের পাত্রটি অহিতকর বলিয়া পরিত্যক্ত হয় তেমনি পরের ভাবের সহিত নিজেদের অপরিণত ভাব মিশাইয়া আমরা পরের ভাবটিও নষ্ট করিয়া ফেলি।

আমরা লেখক বিশেষকে বা গ্রন্থ কি মাসিক পত্রিকা বিশেষকে গালি দিবার জন্য এইরূপ অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতেছি না। নিজ মুখে আত্মকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্যটাকে অসারবান প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া বাতুলতা। যে সকল ইংরাজী শিক্ষিত নবীন যুবক মাতৃভাষার পরিপুষ্টির জন্য পরিশ্রম করিয়া অধুনা প্রচারিত রাশি রাশি মাসিক পত্রিকা বা অপরাপর স্থলে প্রবন্ধ লিখিয়া স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিতেছেন, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, প্রবন্ধ লিখিয়া মৌলিকতার প্রশংসা পাইবার প্রলোভন হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুই একটা উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। যাঁহারা অহোরাত্র নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, কিসে নিজের উন্নতি হইবে, কিরূপে সমাজে স্বয়ং প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন, এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেবল মাত্র তাহার সাধনায় দিনপাত করেন এবং সুবিধামত আত্মোন্নতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় বোধ করিলে স্বজাতিকে, স্বদেশকে, স্বদেশী আচার ব্যবহার রীতিনীতি জাতীয় সাহিত্য এবং সাহিত্যসেবীদিগের নিন্দা করেন,সে সকল অধম জীবগুলি অপেক্ষা সকল শ্রেণীর সাহিত্যসেবী যে উচ্চ দরের জীব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনাদের পরিশ্রম ও উদ্যমের জন্য তাঁহারা সমগ্র জাতির ধন্যবাদের পাত্র। আমরা বলি তাঁহারা যে তাঁহাদের মনের ভাব মাতৃভাষায় প্রকাশিত করিবার ক্ষমতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার করিবার অন্য উপায় আছে। আমাদের বুদ্ধির পরিনতি না হইলে, আমাদের ভাবের প্রবীণতা না জন্মিলে আমাদের কথার মূল্য থাকিবে কেন ?

অনুকরণ ব্যতীত জগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয় না। অথচ আমাদের ক্রিয়া কলাপ অপরের অনুকরণ মাত্র একথা পরের মুখে শুনিলে আমাদের ক্ষোভের সীমা থাকে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় যে, যে জীব আপনার পরিবেষ্টনীর সহিত আপনার অবস্থার সামঞ্জস্ত করিয়া লইতে পারে জগতের ভীষণ জীবন-সংগ্রামে কেবল সেই সকল জীবই রক্ষা পায়। আমাদিগের পূর্ব্বে যে সকল জীব এই জীবনসংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়াছে, আমরা তাহাদের অস্ত্র আয়ুধ লইয়া এই সংগ্রামে নিত্যই অগ্রসর হইতেছি। শিশু চলিতে শিখে অনুকরণ করিয়া, কথা কহিতে শিখে অনুকরণের ফলে, শৈশবাবস্থা হইতে আমরা অনুকরণ করি বলিয়া বয়োজ্যেষ্ঠদিগের অর্জ্জিত বহুদর্শিতার ফলটুকু প্রাপ্ত হই। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র যদি অজ্ঞ অসহায় জ্ঞানহীন মানব শিশুকে কোলাহলপূর্ণ জ্ঞানীজন সমাকীর্ণ মনুষ্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জনপ্রাণী হীন নির্জ্জন গহনে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে সে শিশু যে মানব সুলভ কোনও গুণেই অলঙ্কৃত হইতে পারে না, এ সত্য পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে। এরূপ শিশু ভাষা শিখিতে পারে না, এমন কি মানবজাতির মত উন্নত হইয়া পদের উপর ভর দিয়া চলিতে পারে না। এ সকল সাধারণ শারীরিক প্রক্রিয়া শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে পরিবেষ্টনীর অনুকরণ করিতে হয়। আমরা নিত্য যাহা অবলোকন করি, যে সকল কার্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সেই গুলার স্মৃতি সেইরূপ কার্য্য করিবার একটা বাসনা আমাদিগের মনের মধ্যে উপস্থাপিত করে। সেই বাসনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা বহুবার করিয়া তবে ধীরে ধীরে আমরা প্রাণ ধারণ সম্বন্ধে সাধারণ কার্য্য গুলা শিক্ষা করি। পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলকে পদের উপর ভর দিয়া উন্নত ভাবে চলিতে দেখিয়া অজ্ঞ শিশুর মস্তিষ্কে সে কার্য্যের অনুকরণ করিবার বাসনা হয়। তাহার পর তাহার নবীন উদ্যমকে, তাহার ক্ষুদ্র শক্তিকে সেই বাসনা সিদ্ধির উদ্দেশে চালিত করিয়া তবে সে পদের উপর ভর দিয়া চলিবার তত্ত্ব আয়ত্ত করে। এই রূপেই আমরা বাক্‌শক্তি অর্জ্জন করি এবং দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হই। যে পরিবেষ্টনীতে ঐ সকল সদ্‌গুণের অভাব সেরূপ স্থলে থাকিয়া ললিত বপু ফুল্লার-বিন্দনিভানন শিশুরত্ন ক্রমে অসংযমী দুর্দ্দমনীয় যুবক রাক্ষসে পরিণত হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। তাই উপদেশাপেক্ষা দৃষ্টান্তই মানব চরিত্র গঠনে অধিক ফলপ্রদ, এ নীতি সর্ব্ববাদী সম্মত।

যাহা ব্যক্তিগত মানব চরিত্র পরিস্ফুটন সম্বন্ধে সত্য তাহা জাতীয় চরিত্র গঠন সম্বন্ধেও সত্য। শুধু জাতীয় চরিত্র গঠনে কেন, সকল সমবেত অনুষ্ঠানেও এ নীতির যাথার্থ্য আমরা পদে পদে উপলব্ধি করি। ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় উন্নতিশীল সকল জাতিই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষপ্রদর্শিত পথেই চলিয়া কেবল তাহাদিগের দোষগুলি বর্জ্জন করিয়া যশোমন্দিরের সোপানে আরোহণ করিয়াছে। বিপ্লবের পরই ফরাসী জাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের গন্তব্য পথ হইতে একেবারে বিচ্যুত হইয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া অর্দ্ধ শতাব্দী কিরূপ যাতনা ভোগ করিয়াছিল, কি পরিমাণ নরশোণিতে ফরাসী দেশ প্লাবিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে আজিও হৃদয় স্পন্দিত হয়। জাপানী প্রভৃতি আধুনিক উন্নতিশীল জাতি অপর জাতির অনুকরণ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এ নীতি সকলকেই মানিতে হয়। আমরা একথা বুঝি কার্য্যতঃ এ নীতিরও অনুসরণ করি, কিন্তু প্রত্যেকে মনকে আঁখি ঠারিয়া জগত সমক্ষে জাহির করিতে চাহি যে আমি যে উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, আমি যে পন্থায় স্বজাতিকে লইয়া যাইতেছি তাহা নূতন, আমি যে ভাব প্রকটিত করিতেছি তাহা একেবারে মৌলিক। এরূপ ভাবের জন্মস্থান মোহ এবং আত্মশ্লাঘায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কুপ্রবৃত্তি।

সমাজ সংস্কারকদিগের মধ্যে, রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগের বাক্‌যুদ্ধ-কুরুক্ষেত্রে এমন কি সাহিত্যের শান্তিময় প্রমোদ উদ্যানে সর্ব্বত্রই এই ভাবের বিকাশ। এইরূপে অনুকরণ করিব অথচ লোককে জানিতে দিব না যে আমার কার্য্যটা মৌলিক নহে, অপরের ভাব চুরি করিয়া আনিয়া নিজের ভাণ্ডারে পুরিয়া স্বোপার্জ্জিত শ্রমলব্ধ রত্ন বলিয়া লোকসমাজে ডঙ্কা বাজাইব, পরের বিপণি হইতে দ্রব্য কিনিয়া নিজের ছাপ দিয়া আমার কারখানার পণ্য বলিয়া বিক্রয় করিব, এ প্রবৃত্তিটা আমাদের আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যে যে পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রতিমাসে যতগুলি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখ এই কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবে। অধিকাংশ মাসিক পত্রিকার সমালোচনার স্তম্ভে যে প্রবন্ধগুলি 'গবেষণাপূর্ণ' বা 'মৌলিক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেগুলি পড়িয়া দেখ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই মৌলিকতা উক্ত শ্রেণীর। লেখক দুইটা ইংরাজী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বা নিজ নিবন্ধমধ্যে দুইটা সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন দেখিয়া সমালোচক মহাশয় তাহার রচনা সম্বন্ধে উক্তরূপ

মন্তব্য প্রকাশ করিয়া দায়মুক্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশের লোক পরিশ্রম করিতে চাহে না সুতরাং পরিশ্রম করিয়া অপরের প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে সমালোচকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। অথচ আমাদিগকে সমালোচনা করিতে হইবে, অপরের রচনার উপর কলম চালাইতেই হইবে।

যখন অনুকরণ ব্যতীত জগত চলে না তখন তাহা প্রকাশ্য ভাবে করিতে ক্ষতি কি? দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভাব কোনও জাতিবিশেষের নিজস্ব নহে। সুতরাং অপর ভাষা শিখিয়া তাহাদের ধনরত্নাদি আমাদের ভাষায় আনিলে কি এমন পাপানুষ্ঠান করা হইবে? আমরা প্রতিমাসে যে শক্তি, যে পরিশ্রম "মৌলিক প্রবন্ধ" লিখিয়া অপব্যয় করিতেছি, সেই পরিশ্রমের ফলে কেবল ইংরাজি বা সংস্কৃত মূল জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থগুলি মাতৃভাষায় অনুদিত করিলে আপনাদেরও উন্নতি হয় এবং দেশীয় সাহিত্যেরও উন্নতি হয়। যাঁহারা গোঁড়া, যাঁহারা বলেন বিদেশীয় ভাব বিদেশীয় বিজ্ঞান অনুদিত করিলে বঙ্গীয় সাহিত্যের পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে তাঁহাদিগকে মলিন দীন "মৌলিক প্রবন্ধ" লিখিতে আমরা নিষেধ করি না। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুঝিবেন যে প্রকৃত মৌলিক অথচ সারবান প্রবন্ধ লিখিতে পারিব না, আমরা তাঁহাদিগকে বিদেশী সারবান গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিতে একান্ত অনুরোধ করি। তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সহিত ভাবের পরিণতির সহিত তাঁহারা মৌলিক প্রবন্ধ লিখিলে দেশমধ্যে তাঁহাদের ও তাঁহাদের রচনার সমাদর হইবেই।

ইংরাজী শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী অনেক যুবককে আমরা মাতৃভাষার সেবা করিতে অনুরোধ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন— বাঙ্গালা সাহিত্য কতকগুলি লেখক এক প্রকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা মাথামুণ্ড যাহাই লিখুন না কেন, মাসিক পত্রিকাতে তাহাই প্রকাশিত হয়। অথচ আমরা ভাল প্রবন্ধ লিখিলেও তাহা প্রকাশিত হয় না। অনেকের মুখে শুনিয়াছি বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লেখা কেবল ইংরাজী সাধারণ ভাবের দীন প্রতিধ্বনি মাত্র। এ সকল কথার আমরা এস্থলে আলোচনা করিতে চাহি না। কিন্তু একেবারে কলম ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা জ্ঞানপূর্ণ ইংরাজী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা কি হিতকর নহে? আমরা বলিতেছি অনুবাদ করা হিতকর, কিন্তু বিদেশী গ্রন্থের একটা ভাব লইয়া তাহার সহিত নিজের গবেষণা মিশাইয়া 'খিচুড়ি' করা হিতকর নহে। আমরা সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীকে অনুরোধ করিতেছি সাধ্যানুসারে যেন তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উক্ত প্রকারে সেবা করিতে পরাঙ্মুখ না হন।

মোগল রাজত্বে জ্যোতিষী।

দেশপূজ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'রাজসিংহ' নামক উপন্যাসে অক্ষয় তুলিকায় মোগল রাজধানী, বাদসাহী শিবির প্রভৃতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অলীক বা কল্পনাপ্রসূত নহে। তৎসাময়িক পাশ্চাত্য পরিব্রাজক ও ইতিবৃত্তকারদিগের লেখনী হইতে বঙ্গসাহিত্যাকাশের ভাস্কর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বর্ণনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্ণনাটি তাঁহার নিজস্ব। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় প্রতিভাবলে তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বের চিত্রগুলি আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। মৃত পাত্রপাত্রী বহুদিন বিস্মৃত দৃশ্যাবলীকে সঞ্জীবিত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই বঙ্গসাহিত্যে তিনি অত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রাজসিংহে মোগল রাজধানীর বাজার মধ্যস্থ জ্যোতির্ব্বিদের চিত্র পাঠক মাত্রেরই নিকট বেশ মনোরম। ফলতঃ বার্ণিয়ে প্রমুখাত ইতিবৃত্তকারদিগের গ্রন্থে মোগলাধিকৃত প্রসিদ্ধ নগরগুলিতে আমরা ঐরূপ জ্যোতির্ব্বিদদিগের প্রাদুর্ভাবের বর্ণনা পাই। কোনও একটা দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে, যবনিকাবৃত ভবিষ্যতের অঙ্কে ঝম্প প্রদান করিবার পূর্ব্বে জ্যোতিষীর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিবার পদ্ধতি নাকি সে সময় হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে একটা সাধারণ বৃত্তি ছিল। শুধু ভারতবাসী কেন, সমস্ত এসিয়াবাসী নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদের দ্বারস্থ হইত। প্রাচ্যের সকল স্থলে ভাগ্য গণনা বিদ্যার আদর ছিল এবং সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিত।

ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে আমাদিগের ভাগ্য সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আছে এ কথাটা জানিবার ঔৎসুক্য মানব মাত্রেরই হইয়া থাকে। ধরণীমধ্যস্থ সকল কালের সমৃদ্ধিশালী সুসভ্য জাতিদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপরাপর বিদ্যার উন্নতির চেষ্টার সহিত তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি মনীষী জ্যোতিষ বিদ্যার দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে মানবাদৃষ্টের ভবিষ্যদবস্থা জানিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, এ বিদ্যার আকাঙ্ক্ষাটা মিশরবাসীদিগের

মধ্যে অত্যধিক প্রবল ছিল। 'জাডকিয়েল' নামটাই এখন ইংরাজিতে গণকের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যাবিলন, চালডিয় প্রাচীন মিশর প্রভৃতি প্রদেশেও ভাগ্যগণকের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। রোম ও গ্রীসের ইতিবৃত্ত পাঠে বুঝিতে পারি যে, তদানীন্তন কালের সভ্যতাভিমানী এই দুই কর্ম্মপ্রধান জাতিও সিবিল ও অরেকলের ভবিষ্যদ্বাণী) পরামর্শ না লইয়া কোনও কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইত না। আর প্রাচীন হিন্দুজাতির তো কথাই নাই। জ্যোতিষশাস্ত্রে হিন্দু আর্য্য যে পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের মধ্যে মানবজাতির উপর গ্রহ, নক্ষত্রের প্রভাবের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা হইত। কেবল আপনাদের জ্যোতিষ জ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যতের জ্ঞান পাইবার জন্য নির্ভর না করিয়া শেষে প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর পণ্ডিত সামুদ্রিক শাস্ত্র, কাকশাস্ত্র, কোকশাস্ত্র প্রভৃতির উদ্ভব করিয়াছিলেন।

[illegible]লাধিকৃত ভারতবর্ষেও জ্যোতির্ব্বিদদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। বার্ণিয়ে বলেন প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানের পূর্ব্বে বাদসাহ হইতে দীন অর্দ্ধবুভুক্ষু প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই একবার জ্যোতিষীর স্মরণাপন্ন হইয়া ভবিষ্যতের ফল জানিয়া লইত। কোনও [illegible]ভিযানের সময়, একস্থল হইতে অপর স্থলে ভ্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে, বিবাহাদি অনুষ্ঠানের সময় লোকে জ্যোতিষীদিগের নিকট কোন মুহূর্ত্তে এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিলে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিত। হিন্দুদিগের মধ্যে পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ তিথিতে উপযুক্ত লগ্নে কার্য্য করিবার পদ্ধতি তো চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কর্ম্মপ্রধান মোগল সম্রাটগণও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তবে কোনও বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন।

দিল্লি, আগ্রা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের বাজারমধ্যে একদিকে জ্যোতির্বিদ্গণ বসিত। যবনিকাবৃত অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলিপ্সু কৌতূহলাক্রান্ত লোকের নিকট হইতে ভবিষ্যদ্ বলিয়া দিবার ভান করিয়া অনেকেই জ্যোতির্ব্বিদ সাজিয়া বাজারের মধ্যে দোকান খুলিয়া বসিত। সম্মুখে একখানা পঞ্জিকা লইয়া, একখণ্ড কাগজে রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া, দুই একটা জ্যোতিষের যন্ত্র লইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া এই সকল ভাগ্য গণকেরা অর্থোপার্জ্জন করিত। যে সকল লোক তাহাদিগের স্মরণাপন্ন হইত তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিপন্ন, উচ্চাভিলাষী বা মন্দ প্রকৃতির। মানবজীবনের

সাধারণ কার্য্যাবলীর কথাতো ইহারা বলিতই পরন্তু কোন যুবকের প্রেম সফল হইবে কিনা, কোনও প্রেমাভিলাষিণী বিরহিনী মনোমত নায়কের অঙ্কে শায়িত হইয়া নারী জীবন ধন্য করিতে সক্ষম হইবে কিনা, এ সকল গণনাও ঐ শ্রেণীর গণকদিগের নিকট হইতে লোকে জানিতে পারিত। সকল শ্রেণীর প্রজাই বাজারে দলে দলে ইহাদিগের নিকট ভবিষ্যতের ফলাফল জানিবার জন্য আসিত। বোরকাবৃত অবগুণ্ঠনবতী কুলনারীরাও ইহাঁদিগের শক্তির সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হইত না।

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই গণনাবিদ্যা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। তাহাদের ব্যবসায় লাভের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্লি সহরে একটা পর্ত্তুগীজ নাবিক গণক সাজিয়া বসিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিত। অশেষ প্রকার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পর পর্ত্তুগীজটি দিল্লিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ঐরূপ ভবঘুরে ফিরিঙ্গিগণ বাদসাহ সরকারে গোলন্দাজরূপে নিযুক্ত হইত। এ ব্যক্তি বোধ হয় গোলন্দাজ জীবনের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গণক সাজিয়া সহজে উদরান্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে ঐ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিল। একটা নাবিকদিগের কম্পাস (দিক্ নির্ণয় যন্ত্র) একখানা অর্ণবজান ব্যবহৃত মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া এই ফিরিঙ্গি গণক অজ্ঞ ভারতবাসীদিগকে ঠকাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পশার জমাইয়া ছিল। ইউরোপীয়দিগের সকল বিষয়ই বিভিন্ন প্রণালী এইরূপ ভাবিয়া তাহার সেই পরিত্যক্ত সরঞ্জামকে লোকে ফারঙ্গ প্রদেশের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। একদিন একজন পর্ত্তুগীজ তাহার অদ্ভুত গণনালয়ে উপস্থিত হইয়া হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সকল যন্ত্রের দ্বারা কোন শাস্ত্রমতে ভাগ্যগণনা হইতে পারে?" লোকটা হাসিয়া উত্তর দিল—"যেমন জন্তু সব তেমনি তাদের ভাগ্য গণনার যন্ত্র।"

পারস্যের সম্রাট সাহ আব্বাসও ভাগ্য-পরীক্ষকদিগের সহিত সকল কার্য্যে পরামর্শ করিতেন। তিনি একদিন একটি নূতন প্রমোদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়া রাজজ্যোতিষীর সহিত পরামর্শ করেন। জ্যোতিষী নানা প্রকার গণনাদি করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার এই বাগানের বৃক্ষরাজি বহু দিন অবধি জীবন ধারণ করিবে এবং উদ্যানটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। বাদসাহ সাহ আব্বাস প্রীত হইয়া আম, কাঁটাল, বাদাম, আখরোট, সেব, নেশপাতি প্রভৃতি উত্তম ফলের বৃক্ষাদি আনাইয়া রাখিয়া কিরূপ ভাবে সে গুলিকে বাগান

মধ্যে বসাইলে সুদৃশ্য হইবে তাহার মানচিত্রাদি নির্ম্মিত করিলেন। সেই সকল স্থলে মৃত্তিকা খনন করিয়া উদ্যানরক্ষক সম্রাটের নিজ হস্তে দুই একটি বৃক্ষ বসাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় বেশ বৃষ্টি হওয়ায় উপবনের ভূমি প্রায় বৃক্ষরোপণের উপযোগী হইল। উদ্যানরক্ষকও সেই সময় উপবনে বৃক্ষ রোপণ করিল।

রাজজ্যোতিষী আসিয়া একটা উৎসব করিয়া শুভদণ্ড দেখাইয়া সম্রাটের দ্বারা বৃক্ষ রোপণ করাইলে কিছু অর্থাগম হইবে এবং রাজসভায় আপনার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং উদ্যানে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। সম্রাটের নিকট এ কথার অভিযোগ করিয়া তিনি বলিলেন—"জাঁহাপনা! শুভ মুহূর্ত্তে আপনার স্বহস্তে প্রমোদোদ্যানে বৃক্ষ রোপিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু বে-আদব মালী সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বুদ্ধিতে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে।" বলা বাহুল্য, এ কথায় সম্রাট স্বয়ং কোপান্বিত হইলেন। তিনি জ্যোতিষীকে লইয়া স্বয়ং বাগান মধ্যে গমন করিয়া অশিষ্ট উদ্যানরক্ষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কম্পিত কলেবরে ভীত উদ্যানরক্ষক আসিলে বজ্রগম্ভীর স্বরে সম্রাট তাহাকে তাহার আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেচারা মালী জ্যোতিষীর আজ্ঞা অবহেলা করিবার কারণ বিবৃত করিল। সম্রাট তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ক্রুদ্ধ জ্যোতিষী স্বহস্তে উদ্যানরক্ষক রোপিত বৃক্ষ গুলাকে উৎপাটিত করিতে

. . !

বৃদ্ধ মালী একটু সাহসের উপর নির্ভর করিয়া প্রভুর নিকট একটা কথা নিবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। পারস্যাধিপতি তাহার কথা শুনিতে চাহিলেন। উদ্যানরক্ষক বলিল—"জাঁহাপনা আপনি এই জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া এ অধীনের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। যদি ইহাঁর গণনাশক্তি বাস্তবিকই উচ্চ দরের হইত তাহা হইলে আপনার শাস্তি আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতাম। জাঁহাপনার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রথমে জ্যোতিষী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এই উদ্যানের বৃক্ষরাজি অত্যন্ত দীর্ঘজীবি হইবে। জাঁহাপনা আমি এই বৃক্ষগুলি মোটে দুই দিন মাত্র রোপণ করিয়াছি আর আজ তাহাদের জীবননাশ হইল। সুতরাং এরূপ জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কি আপনার ন্যায় সুধীজনের পক্ষে উপযুক্ত

উদ্যানরক্ষকের বাক্যে জ্যোতিষী ক্রোধে অধীর হইয়া তখনই তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য বাদসাহের নিকট প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট একটু হাসিয়া বলিলেন,—"এ ব্যক্তি ঠিক সত্য কথাই বলিয়াছে। আপনার গণনাশক্তি অপেক্ষা উহার বিচারশক্তি ও প্রভুভক্তি প্রশংসনীয়। আমি এ বালককে মার্জ্জনা করিলাম।"

আমাদিগের সম্রাট সাহজাহানের দরবারেও জ্যোতিষীদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনিও সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একদা তাঁহার এক প্রিয় জ্যোতিষীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সম্রাট অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। একজন সভাসদ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন—"জাঁহাপনা আপনি তাঁহার গুণপনা স্মরণ করিয়া বৃথা শোক করিতেছেন কেন? অবশ্য একজন ভৃত্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিতে পারেন। কিন্তু জ্যোতিষীর যদি ভবিষ্যৎ গণনা করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে কি তিনি নিজের মরণ কাল আসন্ন দেখিয়া আপনার নিকট তাহা নিবেদন করিতেন না?" ওমরাহের কথা শুনিয়া সম্রাট স্মিতমুখে স্বীকার করিলেন যে জ্যোতিষীদিগের গণনাশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা দুর্ব্বলতার চিহ্ন।

লহ ফিরে।

এই মুছিলাম অশ্রু,—কাঁদিব না আর!
জীবনে মঙ্গল যার,—বজ্রের বেদন,
মরণে নাহিক যার কভু অধিকার,
তার কেন আঁখি-লোর, আকুল ক্রন্দন!
এই দেখ শুষ্ক আঁখি,—নাহি হাহাকার!
রুদ্ধ শোক, নাহি উৎস—হৃদয় পাষাণ!
তারি মাঝে এককোণে জ্বলন্ত অঙ্গার—
রাখিয়াছি সঙ্গোপনে—হ'বে না নির্ব্বাণ!
সে অঙ্গার দিব তারে দিব ফিরাইয়া
যাহার মঙ্গল দান ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া!
কহিব তাহারে ফিরে লহ তব দান
বিশ্বভরা এ করুণা তোমারি বিধান!
অনলে গরলে বিশ্ব করে হাহাকার!
তোমারি এ লীলা প্রভু—করুণা অপার!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

সাহিত্য-সমাচার।

পূর্ণিমা—আষাঢ়, ১৩১৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার "সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব" আলোচনা করিতে বসিয়া বঙ্গসাহিত্যের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পরম হিন্দুলেখক বঙ্গসাহিত্যে 'বেহুলা' 'খুল্লনা' ব্যতীত আর কিছু দেখিতে চাহেন না। তিনি 'কুন্দ' 'শৈবলিনী' প্রভৃতির চরিত্র দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। প্রবন্ধের একস্থলে বলিতেছেন—"পাপের ছবি দেখাইয়া, পাপীর মোহ কাটান যায় না—তাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে তাহার সম্মুখে আদর্শ পুণ্য চরিত্রের চিত্র ধরিতেই হইবে, নতুবা তাহার গতি নাই—এত বড় কথাটা বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিবার সময় যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন।" এমন হাস্যকর কথা আর কখনও কাহাকে' বলিতে শুনি নাই। ইহা প্রতিবাদেরও অযোগ্য। প্রফুল্ল, শ্রী, সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কমলমণি প্রভৃতির চরিত্র যাঁহার ধর্ম্মদৃষ্টির অগোচর, তাঁহার কথার উত্তর দিলে তাঁহার প্রবন্ধকে প্রশংসা করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে শুধু এইমাত্র বলা যায় যে, লেখক কি বলিতেছেন, তাহা তিনি নিজে বুঝেন নাই। আমাদের মনে রাখা উচিত, শুধু সুন্দর লইয়াই জগৎ নয়। সুন্দর অসুন্দর দুইয়ের ছবি তুলিকায় তুলিয়াই জগতে সেক্সপীয়রের আজ এত মান। অন্ধকার না দেখিলে আলোক জিনিষটার স্বরূপ অতটা উপলব্ধি হইত কিনা সন্দেহ। বাল্মিকীকেও সীতার পার্শ্বে শূর্পনখাকে আনিতে হইয়াছে। লেখক বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের দুই একটি আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন,—"তাই আজ ঘরে ঘরে শোকের ঝড় বহিতেছে, দ্বারে দ্বারে মহা অশান্তি বিরাজ করিতেছে।" কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোককে আমরা 'আত্মঘাতিনী' হইতে দেখিয়াছি, তাঁহারা যে বঙ্কিমবাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া আত্মহত্যা করিতে শিখিয়াছেন, একথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ, আমরা যতগুলি এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি, সে সকল গুলিই প্রায় অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই নিকট বঙ্কিমবাবুর নাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আর এক কথা। যদি বা কেহ বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস পড়িয়া 'আত্মহত্যা'ই করিতে শিখেন, তাহা হইলে তজ্জন্য আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না। কারণ, যিনি ভ্রমরাদির চরিত্র হইতে শিক্ষা লাভের পরিবর্ত্তে কুন্দনন্দিনীর দেখাদেখি বিষপান করিতে শিখেন, তাঁহার পক্ষে মরণই পরম মঙ্গল। আত্মহত্যা অপেক্ষা যে মহা মহাপাপ ব্যাস রচিত মহাভারতে আছে। তা' বলিয়া কি তাহাই জনসাধারণে অনুকরণ করিবে? কাব্যকে পুরামাত্রায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে গেলে চলিবে কেন? বড় বড় সাহিত্য রথীদিগের লেখায় দোষ দেখাইতে পারিলে, অবশ্য তাহাতে বাহাদুরী লাভ করা যায়; কিন্তু লেখকের স্মরণ রাখা উচিত যে, সেই দোষ দেখাইবার সময় যুক্তি-তর্কেরও অবতারণা করা প্রয়োজন। নতুবা জনসাধারণে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। লেখক কবিকঙ্কনাদির 'তুলসীর মালা' লইয়াই মজিয়া থাকুন। বঙ্কিমবাবুর এ মুক্তার মালা তাঁহার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। "কাব্যে ইতিহাস" পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্" তেমন চিত্তাকর্ষক হইতেছে না।

এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর

সুপ্রসিদ্ধ লিনসিড তৈল

হাঁসমার্কা

এই তৈল ব্যবহারে রংয়ের কার্য্য বহুকাল উজ্জল থাকে এবং কাষ্ঠকে খারাপ কিম্বা নষ্ট হইতে দেয় না। গৃহস্বামীদিগকে রংয়ের কার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়ে অকৃত্রিম লিন্‌সিড তৈল ব্যবহার না করিয়া পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিশুদ্ধ তৈলই রংয়ের জীবন। এই তৈল প্রস্তুত করিতে কেবলমাত্র তিসি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয় না। এই কারণ রং আবরক পদার্থ (gummy matter) প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাতে রংএ কখন ফোস্কা কিম্বা চটা উঠে না। সকল রংয়ের দোকানে এবং আমাদের অফিসে লিখিলেই পাইবেন।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—৮ নং ক্লাইভ রো।

কিলবরণ কোম্পানীর



ইমারতকে বহুকাল স্থায়ী ও অতিশয় কঠিন করে।

মফঃস্বলবাসী অনেকেরই সীলেটচুণ ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কলিকাতা হইতে ইহা আনয়ন করা সুবিধাজনক নয় মনে করিয়া অপর চুণ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমরা অর্ডার পাইলেই গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বস্তাবন্দী করিয়া রেল কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই এবং যাঁহারা নৌকা করিয়া চুণ লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদের কারখানায় পাঁচপাড়া কিম্বা নিমতলার গুদামের সম্মুখে নৌকা পাঠাইলে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া থাকি। নিকটবর্ত্তী স্থান হইলে আমাদের নিজের নৌকায় মাল পাঠাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের সীলেট চুণ ইমারতের যাবতীয় কার্য্যে বিশেষতঃ ছাতের কার্য্যে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সহস্র সহস্র লোকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।

কিলবরণ এণ্ড কোং

এজেন্টস্—৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা ৩নং ব্লুকীয়া ষ্ট্রীট মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সদানন্দের সকল কথা-ই আমরা মণিভূষণকে বলিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু সেই রাত্রেই তাঁহার প্রবল জ্বর হইল, প্রায় পনের দিন পরে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি নলিনাক্ষ বাবুকে সঙ্গে লইয়া সেইদিন গড় পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে চলিয়া গেলেন। আর বহুদিন গড়ে ফিরেন নাই।

* * * *

এক্ষণে আমি এই ভয়াবহ ইতিহাসের উপসংহার ভাগে আসিয়া পড়িয়াছি। এই ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া কখন আমার মনের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আমি তাহাই যথাসাধ্য সরলভাবে বর্ণন করিতে চেষ্টা পাই... আমার অদ্ভুতকর্ম্মা বন্ধু গোবিন্দরাম কখন কি করিয়াছিলেন, তাহাও লিখিয়াছি। এখন পরে কি হইল, তাহাই সংক্ষেপে বলিব।

পরদিন আমরা চোরাবালির দিকে চলিলাম। মুঞ্জরীর কাছে শুনিলাম যে, এই চোরাবালির মধ্যস্থ পাহাড়ের গহ্বরেই সদানন্দ কুকুরটাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে নিজে রাত্রে তাহাকে খাবার দিয়া আসিত; কেবল যে রাত্রে কুকুরটাকে তাহার দরকার হইত, তাহার আগের রাত্রে বাটীতে আনিয়া বাটীর পশ্চাদ্দিকের একটা ঘরে বাঁধিয়া রাখিত, আমরা আরও শুনিলাম, চোরাবালির ভিতর যে পথ ছিল—তাহা ঠিক রাখিবার জন্য সে এই পথে বরাবর ছোট ছোট কাঠ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল।

আমরা তিনজনে এই ভয়াবহ চোরাবালির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম, তাহার পর এই পথ খুঁজিতে লাগিলাম, বহুক্ষণ চেষ্টার পর এক স্থানে দেখিলাম যে, যথার্থই একটা কাঠ পোতা রহিয়াছে, তাহার পর বিশেষ করিয়া দেখিয়া দেখিলাম যে, একটার পর একটা কাঠ বরাবর রহিয়াছে, ইহা ক্রমে সেই পাহাড়ের দিকে গিয়াছে। পথটি নিশ্চয়ই অতি অপ্রশস্ত।

ভয় কাহাকে বলে, তাহা গোবিন্দরামের জন্ম-পত্রিকায় লেখে না। সুতরাং তিনি সেই পথে অগ্রসর হইলেন, অগত্যা আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম, তবে সত্যকথা বলিতে কি, এই ভয়াবহ পথে অগ্রসর হইতে প্রতিক্ষণে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে গোবিন্দরামের একটা পা হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া গেল, আমরা দুইজনে সবলে তাঁহাকে টানিয়া না তুলিলে বোধ হয়, তাঁহাকে সেইখানেই অনন্তকালের জন্য থাকিতে হইত, তবে তিনি সেইখানকার বালি হইতে একপাটি পুরাতন জুতা টানিয়া বাহির করিলেন।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বালির ভিতর যাওয়ায় লাভ ভিন্ন লোকসান হইল না। এই সেই মণিভূষণের হারাণ জুতা!"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "নিশ্চয়ই সদানন্দ পলাইবার মুখে এ জুতাটা এখানে ফেলিয়া দিয়াছিল।"

"নিশ্চয়ই। কুকুরটাকে মণিভূষণের উপর লেলাইয়া দিবার জন্য সে ইহা হাতেই রাখিয়াছিল, তাহার পর যখন দেখিল যে, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, তখন সে এখানে ফেলিয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, ইহাতে এখন জানা গেল যে, সে এইদিকে আসিয়াছিল।"

এই পর্য্যন্ত—সদানন্দ সম্বন্ধে আমরা আর কিছু জানিতে পারিলাম না, দুই-এক স্থানে সেই ক্ষুদ্র পথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাহার পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, তাহার পর কোন চিহ্ন নাই। এক্ষণে গোবিন্দরামও আর অগ্রসর হইতে ভীত হইলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনেক কষ্টে নিরাপদ শক্ত জমিতে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "দেখিতেছি, দুর্বৃত্ত তাহার আড্ডায় রাত্রে পৌঁছিতে পারে নাই, সাধারণভাবে সাবধানে যাওয়া এক রকম—আর প্রাণভয়ে পলাইয়া যাওয়া আর এক রকম—সে এই পথে ছুটিয়া যাইবার সময় নিশ্চয়ই এই চোরাবালিতে পড়িয়াছিল—তাহার পা এখানে পড়িলে যাহা হয়, তাহাই তাহার ঘটিয়াছিল।"

তখন গরুর সেই বিকট আর্ত্তনাদ আমার মনে পড়িল, প্রাণ শিহরিয়া উঠিল —পাপীর এইরূপেই দণ্ড হয়!

গড়ের দিকে ফিরিতে ফিরিতে গোবিন্দরাম বলিলেন, "এরূপ বুদ্ধির সহিত খুন করা তোমরা আর কি কখনও শুনিয়াছ? আমি এ পর্য্যন্ত অনেক খুন

দেখিয়াছি, কিন্তু খুন করিবার এমন সুবন্দোবস্ত আর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।"

এ মতলব তাহার মাথায় নিশ্চয়ই গড়ের রাজবংশ হইতেই ঢুকিয়াছিল, তাহাই এই জাল কুকুর-ভূত দেখাইয়া রাজা অহিভূষণের মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয় যে, হতভাগ্য হারু ডাকাত এই ভয়াবহ কুকুরের ভয়ে খাদে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ রকমে মানুষ খুন করিবার উপায় উদ্ভাবন যে খুব ক্ষমতার কাজ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ডাক্তার, আমি তোমায় কলিকাতায়ই বলিয়াছিলাম যে, এ রকম ভয়ানক লোক আমি আর কখনও দেখি নাই, এখন আমার কথা সত্য হইল না কি? দেখিলে তো!"

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

সেইদিন হইতে অনেক দিন গোবিন্দরাম আর এই বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলেন না। আমি জানিতাম, তিনি যখন যে বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিতেন না, তখন কেহ তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিত না; সেজন্য আমিও কখনও তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা সেই পর্য্যন্ত আর জিজ্ঞাসা করি নাই। এতদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলাম। সম্প্রতি মণিভূষণ নলিনাক্ষ ডাক্তার বাবুর সহিত পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিলেন; কাজেই পুরাতন গড়ের কথা উঠিল—সেই কুকুর, সেই সদানন্দের কথা উঠিল।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার, যে লোকটা সদানন্দ নাম লইয়াছিল, তাহার দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, সকল কথাই সহজ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আমরা এই ব্যাপারের ভিতরে কি উদ্দেশ্য আছে, তাহা না জানিতে পারায় সেই সমস্তই জটিল ও রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সেই সকল ঘটনার পর আমার সঙ্গে সদানন্দের স্ত্রীর দেখা হইয়াছিল; তুমি শুনিয়া নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে যে, তাহার টাকার অনটন নাই, সে বিষয়ে সদানন্দ যথেষ্ট রাখিয়া গিয়াছে। সদানন্দের স্ত্রী এখন কাশী চলিয়া গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আশা করি, তুমি আমাকে এ সম্বন্ধে সকল বিষয়েরই ব্যাখ্যা করিবে—আমি ইহার এখনও অনেক বিষয় জানি না।"

গোবিন্দরাম বলিতে লাগিলেন, "তুমি এ অনুরোধ করিতে পার; কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, আমি এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা যে মনে করিয়া রাখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না—অনেক কথায়ই এখন আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। একজন উকীল আজ যে মোকদ্দমা সুদক্ষতার সহিত চালাইলেন, কাল তিনি অন্য মোকদ্দমার জন্য সে মোকদ্দমার সমস্ত কথায়ই ভুলিয়া গেলেন। আমার সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটে, আমি এক ব্যাপার শেষ করিয়া অপর ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলে, আর আগেকার ব্যাপার বড় মনে থাকে না। যাহা হউক, আমি এই মণিভূষণের ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা যাহা মনে আছে, সমস্তই বলিতেছি. ইহা ছাড়া তোমার যদি কিছু আমায় জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করিও।

"মণিভূষণের বাড়ীতে যে ছবিখানা ছিল, তাহা দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারি, আমাদের এই সদানন্দ মণিভূষণের বংশের লোক—ভুল নহে। তাহার পর অনুসন্ধানে জানিলাম, অহিভূষণের পিতার যে ভাই নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বিনোদলাল নামে পশ্চিমে বাস করিতেছিলেন। সেইখানেই তিনি বিবাহ করেন; তাঁহারই পুত্র আমাদের চতুর-চূড়ামণি, শঠ-শিরোমণি, নর-পিশাচ সদানন্দ।

"পিতার মৃত্যু হইলে সদানন্দ পশ্চিমে নানা জাল জুয়াচুরী করিতে আরম্ভ করে, তাহার পর সেখানে থাকা অসম্ভব দেখিয়া সেখান হইতে পলায়ন করে।

"পরে সদানন্দ এ দেশে আসিয়া বাঁকুড়ায় এক স্কুল খুলে; কিন্তু স্বভাব কখনও যায় না, সেখানেও নানা জুয়াচুরী করায় সে সেখান হইতেও পালাইতে বাধ্য হয়—তাহার পর স্ত্রীকে লইয়া সে মণিভূষণের দেশে আসিয়া সেই নির্জ্জন মাঠের নির্জ্জন বাড়ীতে বাস করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, তাহার পশ্চিমে এক নাম ছিল, বাঁকুড়ায় আসিয়া সে আর এক নাম লইয়াছিল, তাহার পর মণিভূষণের দেশে আসিয়া আর এক নাম ধারণ করে।

"এখন এখানে আসিয়া সে যাহা করিল, তাহারই সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ। দেখা যাইতেছে, এ দেশে আসিয়া লোকটা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিল যে, নন্দনপুরের জমিদারী ও গড সে চেষ্টা করিলে পাইতে পারে। অহিভূষণের মৃত্যু হইলে এক অন্তরায় থাকিতেছে মণিভূষণ,অহিভূষণের মৃত্যুতে সম্পত্তি আইনানুসারে মণিভূষণ পাইলে,আর মণিভূষণের মৃত্যু হইলেই সমস্ত সম্পত্তির সে

নিজেই ওয়ারিসান্ হইতেছে; সুতরাং কোনরূপে এই দুইজনকে সরাইতে পারিলে সে অনায়াসে নন্দনপুরের জমিদারী পাইতে পারে।

"সে যখন নন্দনপুরে আসিল, তখন কি উপায়ে এ কার্য্য সুসিদ্ধ করিবে, তাহা সে নিশ্চয়ই ঠিক জানিত না, তবে তাহার যে ভিতরে ভিতরে একটা ভয়ানক দুরভিসন্ধি ছিল, তাহা এক কারণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; তাহার যদি মনে কোন দুরভিসন্ধি না থাকিত, তাহা হইলে এ দেশে আসিয়া সে নিজের স্ত্রীকে ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিত না। তাহার স্ত্রীকে এইরূপে যে তাহার উদ্দেশ্য সাধনে লাগাইবে, তাহা তাহার গোড়া হইতেই মনে ছিল। পরে কি ভাবে কিরূপে যে কার্য্যোদ্ধার করিবে, তাহা তখনও স্থির করিতে পারে নাই।

"সে প্রথমে নন্দনপুরের নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার পর নানা উপায়ে রাজা অহিভূষণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিল।

"'এইরূপে ক্রমে সদানন্দ অহিভূষণের নিকট হইতেই তাহাদের পৈতৃক কুকুর-ভূতের গল্প শুনিল। অহিভূষণ এই ভূতের কথা এত বিশ্বাস করিতেন যে, কাহা-কেই বলিতে ছাড়িতেন না; তখন ভাবে নাই যে তিনি ইহাতেই তাঁহার নিজের মৃত্যুর উপায় গড়িতেছেন।

"সদানন্দ দেখিল, অহিভূষণ এই ভূতের কথা খুব বিশ্বাস করেন—কোন গতিকে এই ভূতের ভয় তাঁহাকে দেখাইতে পারিলে তখনই ভয়ে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তখন সদানন্দের মনে হইল যে, তাহা হইলে অতি অনায়াসে এই অহি-ভূষণের মৃত্যু সংঘটিত করিতে পারা যায়। সে পূর্ব্ব হইতেই ভাবিতেছিল, অহি-ভূষণকে কিরূপে সরাইবে—তাঁহাকে সরান চাই—তাঁহাকে হত্যা করা প্রয়ো-জন—অথচ কেহ যেন জানিতে না পারে যে, সে তাঁহাকে খুন করিয়াছে; তাহা হইলেই তাহাকে ফাঁসী-কাষ্ঠকে আলিঙ্গন করিতে হইবে।

"তখন সে খুনের এক অতি অদ্ভুত নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। ডাক্তার, শতবার স্বীকার করিতেছি, আমি অনেক খুন দেখিয়াছি, অনেক খুনের নূতন নূতন প্রক্রিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অতীব চমৎকার ব্যাপার কখনও দেখি নাই। এই অত্যাশ্চর্য্য উপায় মনে মনে স্থির করিয়া সদানন্দ তখন অতি সুদক্ষতার সহিত তাহার উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত হইল।

"সাধারণের মত হইলে সদানন্দ একটা ভয়ানক কুকুর জোগাড় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, কিন্তু সদানন্দ অতীব অসাধারণ—সে ঠিক সে প্রকৃতির লোক ছিল না। সে সেই কুকুরকে প্রকৃতই ভূতের মত করিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

"কোথা হইতে সে এই কুকুরটাকে সংগ্রহ করিয়াছিল, সন্ধানে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। পাছে কেহ জানিতে পারে বলিয়া সে কুকুরটাকে রাত্রে চোরাবালির সেই পাহাড়ের গহ্বরে লুকাইয়া রাখে, এইজন্যই সে দেশের কেহ এই কুকুরকে কখনও দেখিতে পায় নাই।

কুকুরটাকে এইখানে রাখিয়া সে সুবিধা খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু সহজে সুবিধা হওয়ায় ত সহজ নহে। অহিভূষণ এই কুকুর-ভূতের ভয়ে এতই ভীত ছিলেন যে, তিনি কিছুতেই রাত্রে বাড়ীর বাহির হইতেন না, অথচ বাড়ীর বাহির না হইলে তাঁহাকে হত্যা করা সম্ভবপর নহে।

"রাজাকে রাত্রে বাড়ীর বাহিরে আনিবার জন্য সে তাহার স্ত্রীকে উৎপীড়ন করিয়াছিল, কিন্তু মুঞ্জরী এ কার্য্যে সম্পূর্ণ অসম্মত হইল, তখন সদানন্দ অন্য উপায় খুঁজিতে লাগিল। নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিলেও যখন মুঞ্জরী সম্মত হইল না, তখন সে নবদুর্গাকে ঠিক করিল, নানা কৌশলে তাহার সহিত প্রণয় স্থাপন করিল, সে কথা তুমি আগেই শুনিয়াছ। তখন সদানন্দ নবদুর্গাকে দিয়া কার্য্যোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইল। নবদুর্গার দুঃখের কথা শতগুণ বাড়াইয়া সে রাজাকে বলিল। রাজার দয়ার্দ্র চিত্ত নবদুর্গার দুঃখে গলিয়া গেল,তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে নবদুর্গাকে দিয়া সে মধ্যে মধ্যে রাজাকে পত্র লিখাইতে লাগিল, উদ্দেশ্য—কোন গতিকে তাঁহাকে দিয়া রাজাকে রাত্রে বাড়ীর বাহিরে আনিবে। এই সময়ে সে শুনিল যে, অহিভূষণ পশ্চিমে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে তো কার্য্যে বিলম্ব পড়িয়া গেল। আর তাহার বিলম্ব সহিল না, সে তৎক্ষণাৎ সেইদিনেই রাজার মৃত্যু ঘটাইবার উপায় স্থির করিল। নানা প্রলোভনে ফেলিয়া নবদুর্গাকে দিয়া রাজাকে একখানা পত্র লিখাইল! পত্রে আবার নানা কথা বলিয়া বুঝাইয়া নবদুর্গাকে সে রাত্রে রাজার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে দিল না।

"সন্ধ্যার পর মাঠে গিয়া সদানন্দ তাহার কুকুরটাকে ফস্ফরাস মাখাইল, তখন কুকুরটার মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল, রাত্রি দশটার সময় সে তাহার এই ভয়ানক কুকুর লইয়া গড়ের নিকট উপস্থিত হইল। করুণ-হৃদয় অহিভূষণ নবদুর্গার অনুরোধে যাহা তিনি কখনই করিতেন না, সেই রাত্রে তাহা করিলেন, তিনি রাত্রি দশটার সময় বাটীর বাহির হইয়া গড়ের সাঁকোর নিকট আসিলেন। সেই সময়ে এই নর-রাক্ষস সদানন্দ তাহার সেই ভয়াবহ কুকুর তাহার উপর লেলাইয়া দিল, তখন সেই ভয়ানক বিভীষিকা দেখিয়া রাজার ভয়ে মৃত্যু

হইল। তিনি যে প্রাণভয়ে কতদূর ছুটিয়াছিলেন, তাহা আমরা নলিনাক্ষ বাবুর কথায় জানিতে পারিয়াছি; তিনি রাজার পায়ের দাগ ও কুকুরটার পায়ের দাগ দুই-ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

"কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে দেখিয়া দুর্বৃত্ত সদানন্দ তখন তাহার কুকুরটাকে লইয়া আবার মাঠের সেই নির্জ্জন স্থানে বাঁধিয়া রাখে। তাহার ডাক মধ্যে মধ্যে লোকে শুনিতে পাইত, তাহাই এই চির প্রসিদ্ধ কুকুর-ভূতের কথায় সেখানকার সকল লোকের আরও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

"রাজা অহিভূষণের মৃত্যু সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। তাহার পরেই এ ব্যাপার আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে। দেখিতেছ, কি ভয়ানক লোক সে—খুন করিলেও তাহাকে খুনী বলিয়া কিছুতেই প্রমাণ করা যায় না। এই খুনে তাহার একমাত্র সঙ্গী যে, সে কখনই তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিবে না। কুকুরটা কখনই তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিবে না, আর তাহার এই ভয়ানক কাণ্ডের কথা এই কুকুর ব্যতীত আর কেহই জানিত না।

"যে দুইজন স্ত্রীলোক—সদানন্দের স্ত্রী আর নবদুর্গা আসল কথা কিছুই জানিত না, কেবল সদানন্দকে সন্দেহ করিত মাত্র। নবদুর্গা কুকুরের কথা আদৌ জানিত না; সদানন্দের স্ত্রী তাহা জানিত, আরও জানিত যে, সদানন্দ রাজাকে কোন রকমে খুন করিবার চেষ্টায় আছে; কিন্তু তাহার ভয়ে কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিত না; আর সদানন্দও জানিত, এই দুই স্ত্রীলোক, তাহার বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলিতে সাহস করিবে না। এইরূপ সাহস পাইয়া সদানন্দ অতি সহজে নিরাপদে তাহার ভয়াবহ কুকুরের ভয় দেখাইয়া রাজা অহিভূষণকে হত্যা করিল, কেহ তাহাকে সন্দেহ করিল না; সে যে ভাবে কাজ করিতেছিল, তাহাতে তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন উপায়ও ছিল না।

"আমার বোধ হয়, সদানন্দ প্রথমে মণিভূষণের কথা জানিত না। প্রথমে ভাবিয়াছিল, এক অহিভূষণকে সরাইতে পারিলেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; কিন্তু পরে জানিল যে, অহিভূষণের মৃত্যুতে তাহার এ জমিদারী পাইবার উপায় নাই, তাহার মৃত্যুর পর আইনানুসারে মণিভূষণ ওয়ারিসান।

"যখন সে এ কথা শুনিল, তখনও সে হতাশ হইল না, তখন কিরূপে মণিভূষণকেও হত্যা করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। মণিভূষণের সমস্ত কথাই সে অতি অনায়াসে নলিনাক্ষ বাবুর কাছে শুনিতে পাইত, কেহ তাহাকে সন্দেহ করিত না, কাজেই সকলেই সকল কথা তাহাকে বলিত।

তাহার প্রথম অভিপ্রায় ছিল যে, লোকাকীর্ণ কলিকাতা সহরে মণিভূষণ উপস্থিত হইবামাত্র কোনরূপে তাহাকে হত্যা করিবে, তাহাই সে কলিকাতায় চলিল, স্ত্রীকে একা রাখিয়া গেলে কেহ সন্দেহ করে বলিয়া তাহাকেও সঙ্গে লইয়া চলিল। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার তাহার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, সে তাহার স্ত্রীকে আদৌ বিশ্বাস করিত না, তাহাই তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য চোখের আড়াল করিতে সাহস পাইত না।

পরে কলিকাতায় আসিয়া সে পরচুলার জাল দাড়ী পরিল, তাহার পর কি করিয়াছিল, তাহা আমরা জানি, সর্ব্বদা নলিনাক্ষ ও মণিভূষণের পিছু পিছু থাকিয়া সুবিধা খুঁজিতেছিল, আমরা কলিকাতায় তাহাকেই গাড়ীতে দেখিয়াছিলাম।

"মুঞ্জরী তাহার স্বামীর উদ্দেশ্য কতক সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু সদানন্দের ভয়ে কিছুতেই মণিভূষণকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতেছিল না। তাহার পর সে কি উপায়ে মণিভূষণকে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা আমরা জানি। তখন এই পত্র লেখা রহস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এই পত্রই আমাদের অনুসন্ধানের প্রথম সূত্র হইয়াছিল।

"মণিভূষণের উপর যদি কুকুরটা লেলাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার কোন একটা পরিধানের দ্রব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক, সদানন্দ প্রথমে তাহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সে হোটেলের চাকরদের ঘুস দিয়া মণিভূষণের একপাটি জুতা সংগ্রহ করিয়াছিল। প্রথমবার জুতাটা নূতন হওয়ায়, সে আবার আর একপাটি পুরাতন জুতাও লইয়াছিল, এই জুতা চুরি হইতেই আমার মনে হয় যে, যথার্থ ই এই ব্যাপারের ভিতর একটা কুকুর আছে, আর সেই কুকুর জীবন্ত কুকুর ভূত নহে। যদি ইহা না হইবে, তবে কোন লোক মণিভূষণের ব্যবহারের একপাটি পুরাতন জুতা সংগ্রহের জন্য এত ব্যস্ত হইবে কেন? যখন কোন ঘটনার মধ্যে কোন সামান্য হাস্যজনক বা অর্থ-শূন্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই বিষয়টাই অতি বিশেষরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; যাহার কোন অর্থ নাই বলিয়া প্রথমে মনে হয়, শেষে তাহারই আবার নানা রকম অর্থ বাহির হইয়া পড়ে আর তাহা হইতেই শেষে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। হয় ত তুমি তখন এই সকল আদৌ মনে আন নাই, কিন্তু আমি আগে হইতেই বুঝিয়াছিলাম যে, যথার্থই একটা কুকুর লইয়াই আমাদের কাজ।

"তাহার পর মণিভূষণ আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন ; সদানন্দও গাড়ী করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল, সদানন্দ পূর্ব্ব হইতে আমাকে চিনিত,আমি কোথায় থাকি তাহা জানিত, ইহাতে আমার মনে হয় সদানন্দ প্রথম এইরূপ ভয়ানক কাজ করিতে উদ্যত হয় নাই। সে এই সকল কাজে নিশ্চয়ই সিদ্ধহস্ত। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম যে, মণিভূষণদের দেশে এক বৎসরের মধ্যে চারিটা বড় চুরি হইয়া গিয়াছে, অথচ কোন চুরিরই চোর ধরা পড়ে নাই, ইহাতে আমার বিশ্বাস যে, সদানন্দ এইরূপ উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিত।

"সে যে কিরূপ লোক,তাহার প্রমাণও আমরা সেই দিনেই জানিতে পারিয়াছিলাম। সে অনায়াসে আমাদের চোখে ধূলি দিয়া পলাইয়াছিল ; কেবল ইহাই নহে, গাড়োয়ানকে আমার নাম বলিয়াছিল, সুতরাং আমি জানিলাম যে, আমি যে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সে জানিতে পারিয়াছে। সুতরাং সাবধানও হইয়াছে, আরও বুঝিয়াছে যে, এখন সে কলিকাতায় মণিভূষণের কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। সেই জন্য সে কলিকাতা হইতে সেই দিনই দেবগ্রামে চলিয়া গিয়াছিল।"

ক্রমশঃ

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

চিত্রাঙ্গদা।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' লইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা' একখানি খণ্ডকাব্য,—Manfred,Comus প্রভৃতির ন্যায় কথোপকথনে গ্রথিত। এই কাব্যখানি লইয়া দুই সম্প্রদায়ের লেখক পরস্পরের সহিত বিবাদ বাধাইয়াছেন। এই বিবাদে এমন কি, ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসংযত ভাষা ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। গালাগালি যে ব্যঙ্গ নহে, গালাগালি যে সমালোচনা নহে, একথা ইঁহারা বিস্মৃত হইতেছেন। বাস্তবিক, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। তাঁহারা সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়া সমালোচনার উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, বঙ্গ-সাহিত্যের উপর অত্যাচার করিতেছেন। তাঁহাদের স্মরণ

রাখা উচিত, সমালোচক নিন্দুকও নহে, সমালোচক স্তাবকও নহে। সমালোচক শাসক, বিচারক, এমন কি তাঁহাকে বিধি প্রবর্ত্তকও বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য হইতেছে কি লইয়া, তাহাই দেখা যাউক। এক সম্প্রদায়. এই কাব্যকে কদর্য্য দুর্নীতিমূলক বলিয়া 'পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত'—এই উপদেশ দিতেছেন। অপর সম্প্রদায়, 'ইহা একখানি অতি উচ্চদরের কাব্য'ও 'রবিবাবু মহাকবির ন্যায় ইহাতে সৌন্দর্য্যের জয়ই নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা ইহাকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় উভয়দলের রচনাই অতিরঞ্জনে অনুরঞ্জিত। কিন্তু আতিশয্য চিরদিনই দূষ্য। বিশেষতঃ, নিন্দাতেই হউক আর প্রশংসাতেই হউক মাত্রা অতিক্রম করা সমালোচকের পক্ষে অতি নিন্দার কথা। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, উভয় পক্ষেরই অভিমত অতিরঞ্জনে দূষিত,অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয় পক্ষের রচনাতেই আংশিক সত্য নিহিত আছে।

'কবি, ভগবৎ প্রেরিত সৌন্দর্য্যাচার্য্য।'* আর কবির কাব্য সেই সৌন্দর্য্যের আধার। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। পণ্ডিতেরা"বাক্যংরসাত্মকং কাব্যম্"অর্থাৎ 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' বলিয়া যে রসকে নির্দ্দেশ করেন, আমাদিগের বিবেচনায় সে রস জিনিষটা উল্লিখিত সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবল উভয়ে উভয়ের নামান্তর মাত্র। অতএব যে কাব্য সৌন্দর্য্য সুধায় সঞ্জীবিত, তাহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিলে চলিবে না। আর নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করিলেও বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সাহিত্য জগতে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জনসন্ সেক্সপীয়রকে বিলুপ্ত করিবার জন্য যে তর্কজাল রচনা করিয়াছিলেন, সেক্সপীয়র সৃষ্ট সৌন্দর্য্য রাশি সে তর্কজালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কোথায় উড়াইয়া দিয়াছে! জোলাকে যাঁহারা অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ প্রভৃতি বলিয়া তাঁহার রচনা পরিহার করিতে উপদেশ দেন, তাঁহাদের উপদেশ চিরদিন অবজ্ঞার খাতাতেই জমা হইয়া রহিয়া গেল। 'মেঘদূত' চিরদিনই দিবাকরের ন্যায় সাহিত্য গগনে শোভা পাইতেছে। নিন্দা কুৎসার কুয়াসা তাহাকে কোন কালেই ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। সেই জন্যই বলিতে-ছিলাম যে, কাব্যই হউক আর শিল্পই হউক, সৌন্দর্য্যে যাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা

---

* God's prophets of the beautiful,
these poets were.
—*Browning.*

হইয়াছে, তাহার মৃত্যু নাই। তাহাকে উপেক্ষা করিলে মানবস্বভাবকে উপেক্ষা করা হয়,—ঈশ্বর প্রদত্ত বৃত্তিকে অবমাননা করা হয়। Ruskin বলুন আর ভগবানই বলুন, কালের চেয়ে বড় সমালোচকত আমি আর কাহারেও দেখি না। সেই কালের নিকষপাথরে কষিয়া দেখিয়াছি যে, "যাহার মূলে দুর্নীতি, তাহা কাব্য হয় না,"—একথা সত্য নহে। ভারতচন্দ্রের মত কদর্য্য স্বভাবান্বিত কবিও আমাদের দেশে সমূহ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন। কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে। তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই কবি স্ত্রীজাতিকে একেবারে রূপের ক্রীতদাসী করিয়া আঁকিয়াছেন—রূপের নিকটে পাতিব্রত্য নাই, শান্তভাব নাই, রূপ দেখিলেই তাহারা অধীর। সুন্দরকে দেখিয়া বর্দ্ধমানের স্ত্রীবর্গ অকাতরে স্বামী আত্মীয় পরিজনদিগের নিন্দা করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের চরিত্রে উন্নত ভাব আদবেই নাই।" * সুন্দর লম্পটের মত গুপ্তভাবে সুড়ঙ্গ পথ দিয়া বিদ্যার ঘরে যাতায়াত করে। কুমারী অবস্থায় বিদ্যার গর্ভ হইল! ন্যায়ের কষ্টি-পাথরে কষিয়া দেখিলে ইহাপেক্ষা দুর্নীতিমূলক কাব্য আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান রুচির হিসাবে ভারতচন্দ্র indecent এবং immoral উভয়ই। কিন্তু উহা সত্ত্বেও ইহার সৌন্দর্য্যকে অস্বীকার করে কাহার সাধ্য? ভারতচন্দ্র এমন 'কতকগুলি ছিটাফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র জানেন' যে তাহাতে পাঠকবর্গ আপনা-আপনিই বশ হইয়া পড়ে।

তবে দ্বিজেনবাবুর একথা স্বীকার করি যে, 'যে কাব্য পড়িয়া কোনও উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা না হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর বিবেচনা না করে, তাহা উচ্চ কাব্য হয় না।' 'বিদ্যাসুন্দর'কে যদি কেহ উচ্চদরের কাব্য মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার রুচির আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। যাহা আদৃত হইবার যোগ্য, তাহার আদর থাকাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু "যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনী-স্বভাবাপন্ন-কবি-যোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চান, তাঁহাদের দিকে সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"

এই সকল কথায় যদি কেহ "Mysteries of the Court of London" এ সৌন্দর্য্য অনুসন্ধান করিতে বসেন, তাহা হইলে তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধের অভাব বুঝিতে হইবে। নিধুর টপ্পায় ও কুৎসিৎ বেশ্যা সঙ্গীতের পার্থক্য কোথায়, যাঁহারা

* ভারতচন্দ্র—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা কাব্য পড়িবার অধিকারী নহেন। "এমন অনেক কাব্য আছে, যে তাহা অশ্লীলতা দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্য-বুদ্ধিসৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়। কোন কোন স্থানে, অশ্লীলতা, কাব্যের উৎকর্ষ পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যিনি এ কথা হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না, তিনি দুর্য্যোধনের সভায় দ্রৌপদীর কথা পাঠ করিবেন।" * সেইজন্য বলিতেছিলাম, যাহার অন্তঃকরণ অশুচি, তাহার সৌন্দর্য্যানুভব শক্তি আদৌ থাকিতে পারে না। জান্তব লালসা, সৌন্দর্য্যের পরম শত্রু।

'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনায় পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির অবতারণা অনেকের নিকট বাগাড়ম্বর ও অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যসমাজের অবস্থা দেখিয়াই এত জবাবদিহি দিতে বাধ্য হইয়াছি। 'চিত্রাঙ্গদা' দুর্নীতিমূলক কিনা সে কথা পরে আলোচ্য; কিন্তু দ্বিজেনবাবুর কথামত ইহাকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া স্বীকার করিলেও এ পুস্তককে যে দগ্ধ করা যাইতে পারে না,—তাহাই বুঝাইবার জন্য এত সৌন্দর্য্যের কথার অবতারণা করিয়াছি। 'চিত্রাঙ্গদা'র নির্ঝরের বারিরাশির মত যে সৌন্দর্য্যধারা প্রবাহিত, সে প্রবাহকে রোধ করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত। এ কাব্যের সেই সৌন্দর্য্যটা কি, তাহাই এক্ষণে বলিতেছি।

বাহ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের ন্যায় অন্তঃ প্রকৃতির বৈচিত্র্যও আনন্দরসের উৎস। সেইজন্য মনুষ্য হৃদয়, কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন;— "মনুষ্য হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও তদ্রূপ। রাবণ ব্যতীত রামায়ণ হইত না। দুর্য্যোধন ব্যতীত মহাভারত হইত না।" এই মানব হৃদয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। 'মানব চিন্তার ব্যবচ্ছেদ' করা দর্শনের অঙ্গ বটে কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া, সরস করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়'। রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্লেষণ যেরূপ সুন্দর ভাবে দেখাইতে পারেন, সেরূপ বিশ্লেষণ শক্তি বঙ্গ সাহিত্যে আর কাহারও নাই। এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের স্থানে স্থানে আছে। সেই জন্যই আমরা ইহার পক্ষপাতী।

মানব নিজকে যত বড়ই শক্তিশালী বলিয়া স্পর্দ্ধা করুন না কেন, মদনের পুষ্পশরের আঘাত প্রায় সকলকেই অল্প বিস্তর সহ্য করিতে হয়। পুষ্পবাণের এই বিদ্ধাবস্থা—মানবজীবনের একটা শোচনীয় অবস্থা। রবীন্দ্রবাবু এই কাব্যে এই

* বঙ্কিমচন্দ্র।

শোচনীয় অবস্থার অনেক 'অস্ফুটভাব ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া অব্যক্তকে ব্যক্ত করিয়াছেন।' মানবহৃদয়ের অব্যক্ত অংশটুকুর কতকাংশ ইহাতে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে বলিয়াই এই কাব্য সমাদৃত হইবার যোগ্য। কামজ-প্রেমে ধর্ম্মের কথা নাই, নীতির কথা নাই বলিয়া আক্ষেপ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। গোলাপ গাছে এলাইচ হয় না বলিয়া গোলাপ গাছকে গালি পাড়িলে চলিবে কেন? কবি যাহা দিয়াছেন, তাহা সুন্দর হইয়াছে কিনা দেখাই সমালোচকের কর্ত্তব্য।

এই কাব্য দুর্নীতিমূলক কিনা এইবারে তাহাই আলোচ্য।

আমাদের মনে হয়, নীতি—দুর্নীতি, শ্লীলতা—অশ্লীলতা, রুচি—কুরুচি প্রভৃতি লইয়া যে বাক্‌বিতণ্ডা তাহা কতকটা, নীতিশূন্য, শ্লীলতাশূন্য, রুচিশূন্য ও অপূর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক, অনেকস্থলে কোন্‌টা নীতি, কোন্‌টা দুনীতি তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। পাত্র-ভেদে, স্থানভেদে ও কালভেদে সুনীতি দুর্নীতি হইয়া দাঁড়ায়, আবার দুর্নীতি সুনীতি হইয়া থাকে। রমেশবাবুর 'সুধা' এক সম্প্রদায় হিন্দুর নিকট ভয়ঙ্কর দুর্নীতিমূলক। আবার অপর সম্প্রদায়ের নিকট ইহা নীতিমূলক। অতএব এ সম্বন্ধে অধিকাংশ সময়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। দ্বিজেনবাবু এই নীতি নির্ণয় করিতে গিয়া, বিষম গোলে পড়িয়াছেন,—ভুল করিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ কোর্টশিপের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এ কাব্যকে দুর্নীতিমূলক বলিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রবাবু ইহাতে বঙ্গীয় সামাজিক চরিত্র আঁকিতে প্রয়াস পান নাই। দ্বিজেনবাবু বলিতেছেন;—"সমাজে ১২ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক ভদ্রঘরের অনূঢ়া কন্যা একরূপ পাওয়াই যায় না। আর ১২ বৎসরের পূর্ব্বে প্রেম হয় না। ফল দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরাজি (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক), না হয়—দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক।"—'চিত্রাঙ্গদা' যদি আমাদের ঘরের রামী শ্যামী হইত, তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা কতকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেও করিতে পারিতাম, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তাহা নহে। উহা পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না—কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরাজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে, ইংরাজ কন্যার জীবনই

তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে।" সুতরাং চিত্রাঙ্গদাকে'কোর্টশিপ' করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ দেখি না। এস্থলে 'কোর্টশিপ' ব্যাপারটা আদৌ দুর্নীতিমূলক হয় নাই।

তবে কি এ কাব্যের দোষ নাই? আছে বৈকি! পৃথিবীতে ত আমি এমন সৌন্দর্য্য দেখি নাই, যাহা কুরূপের সংসর্গ বা সংস্পর্শযুক্ত নহে। 'চন্দ্রের কলা ও কলঙ্কের' ন্যায় সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যে 'কলা ও কলঙ্ক' আছে। এমন কাব্য কি কেহ দেখাইতে পারেন যে যাহা দোষ-সংস্পর্শ-যুক্ত নহে? ইহার গুণের কথা বলিয়াছি, এইবারে দোষের কথা বলিব।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন এই কাব্যের নায়ক, আর মণিপুর রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদা ইহার নায়িকা। এই দুই চরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ নিপুণতা দেখাইতে পারেন নাই। উভয় চরিত্রেই অল্পবিস্তর অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে। মানব-চিন্তার অদ্ভূত বিশ্লেষণ ইহাতে আছে বটে, কিন্তু সেই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া প্রতিমা ফুটিয়া উঠে নাই। ইহাই এ কাব্যের দোষ। প্রথমে অর্জ্জুন-চিত্র লইয়াই আলোচনা করা যাউক, তাহা হইলে ঐ দোষ কতকটা বুঝা যাইবে।

অর্জ্জুনকে ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় রূপমোহে মুগ্ধ ব্রতভঙ্গকারী করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে বলিয়া যে এ চরিত্র অসঙ্গতিদোষে দূষিত বলিতেছি, তাহা নহে। এমন কথা যিনি বলিতে চাহেন, তাঁহার বুদ্ধির আমরা প্রশংসা করি না। কারণ, আর্য্যসাহিত্যে দেখিয়াছি,—

"কত ঋষিমুনি
করিয়াছে বিসর্জ্জন নারীপদতলে
চিরার্জ্জিত তপস্যার ফল।"

অর্জ্জুন উর্ব্বশীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া কি তিনি রূপমোহের অতীত? সুভদ্রাহরণ তিনিই করিয়াছিলেন। উলূপী সম্ভোগ তাঁহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কাহাকেও জিতেন্দ্রিয় বলিলেই ভীষ্মদেব বলা হয় না। অতএব অর্জ্জুনকে ব্রতভঙ্গকারী রূপে আঁকা হইয়াছে বলিয়া যে, অর্জ্জুন-চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, একথা আমরা স্বীকার করি না।

এই কাব্যে অর্জ্জুনের সহিত যেখানে চিত্রাঙ্গদার মিলন হইল, সেখানেও অর্জ্জুন-চরিত্রে বিশেষ অস্বাভাবিকত্ব বা অসামঞ্জস্য প্রকাশ পায় নাই। "অর্জ্জুন কুমারীর ধর্ম্মনষ্ট করিলেন", "অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্ম্মনাশ করিলেন" প্রভৃতি বাক্য, যাহা দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত। অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি'
হেন রূপরাশি জনহীন দেবালয়ে
হেলায় দিতেছ বিসর্জ্জন, হতভাগ্য
মর্ত্ত্যজনে করিয়া বঞ্চিত !"

উত্তরে চিত্রাঙ্গদা বলিলেন,—

"শুধু এক
কামনা সাধনা তরে, একমনে করি
শিবপূজা।.........
............ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি আমি যাঁরে চাহি।
....
জন্ম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।.........
অর্জ্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবন বিজয়ী।
সে অক্ষয় নাম, সমস্ত জগৎ হতে
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি'।"

এই সমস্ত বিনয়পূর্ণ, অনুরাগপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণান্তর অর্জ্জুন বলিলেন,—

"বরাঙ্গনে,
সে অর্জ্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
সেই ভাগ্যবান চরণে শরণাগত।"

এইরূপ আত্মসমর্পণকে কি 'ধর্ম্মনষ্ট করা' বলে? তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে অর্জ্জুনের মত আত্মসংযমীর অসংযত অবস্থাতেও আর একটু সংযত ভাব থাকা উচিত ছিল। চিত্রাঙ্গদা কাহার মেয়ে, কি জাতি, এসব না জানিয়া শুনিয়া চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করা অর্জ্জুনের মত লোকের উচিত হয় নাই। ইহাতে অর্জ্জুন-চরিত্র কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে অর্জ্জুন-চিত্রে অধিক মাত্রায় অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়াছে কোথায়? এই প্রেম সম্মিলনের পূর্ব্বে কবি একটি ঘটনার অবতারণা করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, অর্জ্জুন-চরিত্রে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছেন। সে কার্য্য অর্জ্জুন কেন, যে কোন ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে আমরা মনুষ্যপদবাচ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, ভদ্রসমাজে মিশিতে

দিই না। চিত্রাঙ্গদা যখন 'নিবিড় নির্জ্জন বনে নির্ম্মল সরসীতে' স্বীয় 'পরিস্ফুট দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ ও নব গৌরতনুতলে আরক্তিম আলজ্জ আভাস' দেখিতেছিলেন, সে সময় সে সমস্ত গুপ্তভাবে লোলুপ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা অর্জ্জুনের মনুষ্যোচিত কার্য্য হয় নাই। অর্জ্জুনের সহিত চিত্রাঙ্গদার মিলন হইবার পর হইতেই আবার অর্জ্জুন-চিত্রে বিশেষ দোষ ঘটিয়াছে,—অর্জ্জুন আর অর্জ্জুন নাই। 'কাম প্রবৃত্তি যে কতদূর যাইতে পারে,তাহা অতিশয়োক্তি দ্বারা' প্রকাশ করিতে গিয়া কবি শেষাংশে আর অর্জ্জুন চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'চোখের বালি'র বিনোদিনী যেমন মহেন্দ্রের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়াছে, এস্থলে চিত্রাঙ্গদাও অনেকটা অর্জ্জুনকে সেইমত করিয়াছে। অর্জ্জুন যেন একটি মেষ! 'চিত্রাঙ্গদা' নিজমুখেই সে প্রেমের ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

"ধনুর্দ্ধর যমশ্যাম
ব্যাধেরে আমার, করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহত প্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দ্দয় বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি।"

অর্জ্জুনের এখানে পুরুষোচিত দৃঢ়তা বিন্দুমাত্র নাই। তিনি 'চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া কামপরতন্ত্র হইয়াছিলেন' বলিয়া কি তাঁহাকে মেষের অধম করিয়া গড়িতে হইবে? তাঁহার মত আত্মসংযমীর অসংযত অবস্থাতেও একটু সংযমের ছায়া, একটু গাম্ভীর্য্যের ছায়া থাকা প্রয়োজন। নহিলে চরিত্র অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে,—অসঙ্গতি-দোষে দূষিত হয়। ভোগ বিলাসে যাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত, আর যাহার জীবন সংযমাভ্যাসে গঠিত, এই উভয়ে কামপরবশ হইলে উভয় চরিত্রের একই পরিণতি কখনই হইতে পারে না। অর্জ্জুন ব্রতভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া আঁকিতে হইবে? সমরে সিংহও পরাজিত হয়, শৃগালও বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু সিংহ শৃগালের মত মরেনা। একটি 'হাল্কা স্বভাব বিলাসী বাবু-চরিত্র' রূপের ফাঁদে পড়িয়া যেমন রমণীর 'খেলেনা' হইয়া থাকে, এ কাব্যের শেষাংশে অর্জ্জুনও তাহাই হইয়াছে। এ অর্জ্জুনকে দেখিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে রবিবাবুর ভাষাতে বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"হা 'অর্জ্জুন', কি করিলি? তুই কি উন্মাদ হলি?
সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসর্জ্জন,

লুটিতে শুধু কি এক নারীর চরণ?
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার উঠিতে পড়িতে?
কাঁদিতে হাসিতে তার কটাক্ষে ইঙ্গিতে?
খেলেনা হইতে তার ভ্রূকুটি হাসির?
কেন এত গেলি গোলে! শুধু রূপ আছে বোলে?
....
জীবনের উদ্দেশ্য করিলি ছারখার?
সমস্ত জগৎ হাসে ধিক্ ধিক্ বলি—

তবু তার পদতলে লুটাইবি গিয়া
শুধু তার আঁখি দুটী সুদীর্ঘ বলিয়া?"

যদিও অর্জ্জুন এই সম্ভোগের মাঝে মাঝে দুই একবার বীরত্বের আস্ফালন করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদাকে বলিয়াছেন;—

"এস এস দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মত!"

কিন্তু সেরূপ অধঃপতনের অবস্থায় কথাগুলি যেন জোরজবরদস্তি করিয়া অর্জ্জুনের মুখে বসান হইয়াছে। যেন একটা লম্পট ছোঁড়াকে জোর করিয়া অর্জ্জুন দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

'দুষ্ট প্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অযাচিতভাবে—উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার' প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া কবি যেমন অর্জ্জুন-চরিত্র মাটি করিয়াছেন, এ চিত্রাঙ্গদা চরিত্রও অনেকটা সেইরূপেই নষ্ট হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা যেন একটি হেঁয়ালী। এ চরিত্রে, কবি, হৃদয়ের কোন্ ভাবটি প্রদর্শন জন্য যে ইহা কল্পনা করিয়াছেন, বুঝা যায় না। কখনও ইহাকে কতকটা আনন্দ-মঠের শান্তির মত বলিয়া মনে হয়, কখনও ইহাকে কপালকুণ্ডলার মত উদাসীনা দেখি; আবার সময়ে সময়ে ইহাকে একটা ভয়ঙ্কর কামুকী বলিয়া ধারণা হয়।

'শান্তি' ও 'চিত্রাঙ্গদা' এই উভয় চরিত্রের মূলভিত্তি প্রায় একই উপাদানে গঠিত। কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে এই একই চরিত্রের বিভিন্ন রূপ বিকাশ হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়াছেন।

"যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারাই কল্পনার বলে জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিতে পারেন।"* এ ক্ষমতা আমাদের সাহিত্যে কেবলমাত্র বঙ্কিমের ও গিরিশের আছে। যে অদ্ভুত কল্পনাবলে শ্রী, শান্তি, প্রফুল্ল, শৈবলিনী, রঙ্গলাল, বৈষ্ণবী, গুলসানা, মুকুল, গঙ্গাবাই প্রভৃতি Original character এর সৃষ্টি হইয়াছে, সে শক্তি রবীন্দ্রনাথের নাই। তিনি একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইতে পারেন; কিন্তু চরিত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। সেই জন্যই চিত্রাঙ্গদা-সৃষ্টিতে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

"শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে
পুরুষের বেশ, পুরুষের সাথে থেকে"

চিত্রাঙ্গদা কিছু পুরুষস্বভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার চরিত্রের কিছু নির্ম্মমতা ও কিছু কঠোরতা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ দেখি না। বরং বলিব ইহাতে চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে। আর সেই জন্যই সরসীজলে তাঁহাকে তাঁহার রূপচ্ছায়া দেখিতে দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হই না। কিন্তু যে রমণীকে স্বামী পাইবার জন্য 'তপস্যার তাপে যৌবনকুসুম মলিন ও খিন্ন' করিতে দেখিয়াছি, সেই রমণী যখন স্বামী পাইয়া স্বামীকে বলেন,—

"এই মালা পর গলে। শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহুপরে টেনে লও বীর।
সন্ধি হোক অধরের সুখ সম্মিলনে
ক্ষান্ত করি' মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের
সুধাময় চির পরাজয়ে।"

"বেশি দিন নহে
পার্থ! যে ক'দিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া কর পান! এর পরে
বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে' ফিরে', গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে, তৃষিত ভৃঙ্গের মত।"

——তখন সে রমণীকে সহধর্ম্মিণীর উচ্চাসনে, পবিত্রাসনে বসাইতে আদৌ

* দীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রবৃত্তি হয় না। তখন সত্যসত্যই মনে হয় যে, এ 'অভিসারিকার সম্ভোগ' দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে আনিয়া রবীন্দ্রবাবু এ কি খিচুড়ীর সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে। চিত্রাঙ্গদা মদনকে বলিলেন,—

"ধনুর্দ্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার, করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহত প্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দ্দয় বিজয় সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি।"

মদন উত্তরে চিত্রাঙ্গদাকে উপদেশ দিয়াছেন,

"থাক! ভাঙ্গিয়োনা খেলা।
এ খেলা আমার! ছুটুক্ ফুটুক্ বাণ,
টুটুক হৃদয়! ……
দাও দাও শ্রান্ত করে' দাও; কর তারে
পদানত; বাঁধ তারে দৃঢ়পাশে; দয়া
করিয়োনা, হাসিতে জর্জ্জর করে' দাও,
অমৃত-বিষেতে-মাখা খর বাক্যবাণ
হান বুকে! শিকারে দয়ার বিধি নাই।"

সাধনায় যে চিত্রাঙ্গদার জীবন গঠিত, কঠোর সাধনার বলে যিনি অর্জ্জুনকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই ব্রতধারিণীর চরিত্রের কি এই বিকাশ? এ বেশ্যাবৃত্তি না আনিলে কি কামজ প্রেমের বর্ণনা হয় না?

চিত্রাঙ্গদা আবার সময়ে সময়ে কপালকুণ্ডলার মত উদাসীন হইয়া অর্জ্জুনকে বলেন,—

"নাই, নাই, নাই!—যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানেনি! সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।"

আমাদের মনে হয়, কবি এই সমুদয় দোষ বুঝিতে পারিয়াই সর্ব্বশেষে অর্জ্জুন সমীপে চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন;—

"হয়ত পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবর তীরে, শিবালয়ে, দেখা

দিয়েছিল এক নারী, * * *
প্রভু আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি' বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।
আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
* * * *
যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে,
* * *
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

যদি কোন কবি, সীতা ও সূর্পণখা এই উভয়ের চরিত্র সংমিশ্রণে একটি নায়িকা সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থশেষে তাহারই মুখ দিয়া বলান যে,—"আমায় যাহা দেখিলে, আমি তাহা নহি;—আমি সীতাও নহি, আমি সূর্পণখাও নহি।—আমি সুভদ্রা।"—তাহা হইলে সেই চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা হয়, সেইরূপ এ চিত্রাঙ্গদার মুখেও ঐ কথাগুলি শুনিয়া এ চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের সেই ধরণের এক কিম্ভূতকিমাকার ধারণা জন্মিয়াছে।

যাহা অস্বাভাবিক, যাহা অসম্ভাবিত, তাহার অবতারণা সৌন্দর্য্যহানি কারক। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'চন্দ্রের কলা ও কলঙ্কের ন্যায় সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য কলায়ও কলঙ্ক আছে। এ কাব্য গ্রন্থের যে কি সৌন্দর্য্য, ইতিপূর্ব্বেই তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি; এখন তাহার দৃষ্টান্ত দিতে গেলে আর একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয় এবং তাহা দেওয়া আমি প্রয়োজনও মনে করি না। কারণ, কাব্যামোদীকে সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট মনে করি,—উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে গেলে তাঁহাদের রসগ্রাহিতার অবমাননা করা হয়। যে পাঠক 'চিত্রাঙ্গদা' পাঠ করিয়া সৌন্দর্য্য আহরণে অক্ষম, তিনি কাব্য পড়িবার অনধিকারী;—দ্বিগুণ মূল্য দিলেও যেন তাঁহাকে কাব্য দেওয়া না হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষা ও ছন্দোবন্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিতে-ছেন,—"মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই।" কিন্তু হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কাব্যাদি পাঠ করিয়া ওরূপ মন্তব্য যে প্রকাশ করা যাইতে পারে, আমাদের বিশ্বাস হয় না।

'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনায় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উপসংহারে আর দুই একটি কথা বলিব।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যেনীতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—"নারী জাতিকে দেখিয়া এই কবির মাতৃত্বের স্বস্থত্বের কথা মনে পড়ে না। নারী জাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার "মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।"—এই প্রবন্ধের নীচে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম স্বাক্ষরিত না থাকিলে ঐ কথার উত্তর দিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু তাঁহার মত লোকের এরূপ ভুলধারণার সংশোধন হওয়াই উচিত মনে করিয়া বলিতেছি যে, তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব," "দেবতার গ্রাস," "কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ" "সতী" "গান্ধারীর আবেদন" প্রভৃতি কবিতা এবং 'কথা' 'কাহিনী' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ পাঠ করেন; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ সমুদায় কবিতাগুলিতে "মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত"র গন্ধমাত্র নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের "কাব্যে নীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়াই আমরা 'চিত্রাঙ্গদা'র এই সমালোচনা করিলাম। অন্যান্য সমালোচকদের সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু বলা আমরা উচিত মনে করি না। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এক এক পক্ষের গোঁড়া। একদল দ্বিজেন্দ্রলালের, এবং অপরদল—রবীন্দ্রনাথের। যেখানে গোঁড়ামি, সেখানে প্রকৃত সমালোচনা হইতেই পারে না। সুতরাং সে সমালোচনা সাধারণের অবজ্ঞেয়।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

রুদ্ধশোকে।

এই মুছিলাম অশ্রু কাঁদিব না আর!
কাঁদিয়া কি ফল হ'বে, আমারেও যেতে হবে
গিয়েছে সে আগে চলে আমি পিছে তার!
বিধাতার লীলা এযে কাঁদিব না আর!
কাঁদাইতে সুখ তার, জানি আমি বিধাতার
রীতি এই, ধর্ম্ম এই দুর্ব্বল পীড়নে!
ব্যথিতে বধিতে চায় বজ্রের বেদনে!
ব্যথিতের হিয়া মাঝে যার নাম সদা রাজে
তারি শিরে সদা বাজ নিক্ষেপ তাহার!
বিধাতার লীলা খেলা—কাঁদিব না আর!
সম্পদে বিপদে যারা তারি নামে আত্মহারা,
তারি বুকে তীক্ষ্ণশেল—একি পরিহাস!
"কর্ম্মফল" শেষ কথা—কাতর নিশ্বাস!
জন্মান্তর কর্ম্মফল! আমার কি দোষ বল!
আমি তো সেধেছি কর্ম্ম যে শিক্ষা তাহার!
তা'তেও করিবে দোষী—করুণা অপার!
আমারে পাঠালে যবে জন্ম নিতে এই ভবে,
আশা ঘোরে বৃথা কেন ধাঁধিল নয়ন!
মরুভূমে মরীচিকা করিয়া সৃজন!
আশার আশ্বাসে লুব্ধ প্রতি পলে হই ক্ষুব্ধ
ফিরিয়া আশার গান তুলিছে ঝঙ্কার!
কাঁদায়ে হাসিতে চায় পিতৃ ব্যবহার!
শঠতা নীচতা ভরা বুঝিয়াছি এই ধরা,
বিধাতা বাসনা পূর্ণ হবে না এবার!
এই মুছিলাম অশ্রু কাঁদিব না আর!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

পুরীতীর্থে।

আমার প্রথম সমুদ্র দর্শনের সহিত আমার জীবনের একটা গুরুতর পরিবর্ত্তনের ইতিহাস জড়িত না থাকিলেও আমি সে উত্তেজনা, সে আনন্দ কখনই বিস্মৃত হইতে পারিতাম না। উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মত আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই প্রগাঢ় অনুরাগ এবং শীঘ্রই সেই গভীর অনুরাগ গভীর প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। আমার সহিত আট জন বন্ধু ছিলেন তাঁহারাও আমারই মত মন প্রাণ দিয়া সেই ভীমদর্শন তরঙ্গায়িত পয়োধিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং গাত্রের পিরিহাণ, কোট চাদরাদি বেলাভূমিতে রাখিয়া আমরা সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিবার মানসে জলে নামিলাম। সাগরের প্রথম চুম্বনটা একেবারেই মিষ্ট লাগিল না, তাহার লবণাক্ত বারি চোখে মুখে কাণে প্রবেশ করিয়া একটু বিরক্ত করিল, কিন্তু আমরা তাহাতে বিশেষ মর্ম্মাহত হইলাম না।

আমরা ৺ জগন্নাথ ক্ষেত্রের সেই সাগর বেলায় দাঁড়াইয়া সমুদ্র স্নানের বিশিষ্ট প্রণালীটা একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছিলাম। যে সকল বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোক একেবারে বালুকার উপর বসিয়া অগ্রগামী সাগর-হিল্লোলে স্নান করিতেছিল তাহাদের বালুকা-স্নান হইতেছিল মাত্র। যাহারা সমুদ্রের মধ্যে অল্প নামিয়া ভয়ে ভয়ে তরঙ্গের সম্মুখীন হইতেছিল তাহারা প্রায়ই ধাক্কা খাইয়া পড়িতেছিল। যাহারা ঠিক তরঙ্গের স্পর্শেই ভূমি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিতেছিল দেখিলাম তাহাদেরই অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তাহারা অধিকদূর অবধি চলিয়া যাইলেও কেবল লাফাইয়া ঢেউ কাটাইয়া বেশ সুখে স্নান করিতেছিল। আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাগর মধ্যে কিয়দ্দূর চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। বহুদূর হইতে আগত প্রকাণ্ড নীল ঢেউগুলা আমাদের ৫।৬ হাত সম্মুখে ভীমনাদে পরস্পরের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে ছিল। অমনি পরস্পরের সংঘর্ষণে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিকলাঙ্গ হইয়া অবশিষ্ট সামান্যমাত্র শক্তি লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল। আমরা সমর-নীতি আয়ত্ব করিয়া লইয়াছিলাম সুতরাং সমুদ্র স্নানটা বেশ সুখে উপভোগ করিতেছিলাম।

আমাদের দক্ষিণে স্বর্গদ্বার ঘাটে বহুসংখ্যক নর নারী স্নান করিতেছিল।

তখন পূজার সময় ক্ষুদ্র পুরী সহরটি নানা দেশীয় যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অগম্য পুরীতীর্থে প্রথম সেই বৎসর রেলপথ খুলিয়াছিল সুতরাং কেহ সমুদ্র দেখিতে, কেহ জগন্নাথ দেবের দর্শন মানসে, কেহবা এক যাত্রায় তীর্থ পর্য্যটনের পুণ্য ও সাগর দর্শনের সুখ অর্জ্জন করিবার বাসনায় শ্রীক্ষেত্রে পূজার ছুটিতে আত্মীয় পরিজন সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল। স্বর্গদ্বার ঘাটে ভীড় দেখিয়া আমরা ঘাটের একটু উত্তর দিকে স্নান করিতেছিলাম।

একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গিয়া শুভ্রশিরে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া আমরা ভূমি ছাড়িয়া লাফাইবার উপক্রম করিতে-ছিলাম। পার্শ্বের ঘাট হইতে বামাকণ্ঠ নিঃসৃত ভীতি-বিহ্বল চীৎকার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া ঠিক সময়ে লাফাইতে পারিলাম না। অমনি ঢেউটা আমার ঘাড় চাপিয়া ধরিল। আমায় ধাক্কা দিয়া বালুকার উপর ফেলিয়া ভীমনাদে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। লবণাম্বু আমার নাকে মুখে প্রবেশ করিয়া বিব্রত করিল। শুধু তাহাই নহে আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া হস্তদ্বারা কোনও কঠিন পদার্থ ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। শেষে এক মনুষ্য দেহ জড়াইয়া ধরিলাম। বুঝিলাম ধাক্কা খাইয়া সে ব্যক্তিও আমার সমবস্থ। তবে আমার জীবন ছিল, এ দেহে জীবনের বড় লক্ষণ বুঝিলাম না।

ঢেউটা চলিয়া গেলে আমি মাথা তুলিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীকেও টানিয়া তুলিলাম। আমরা তখন শুষ্ক বালুকাময় বেলাভূমি হইতে মোটে ১০, ১২ হাত দূরে। যাহাকে টানিয়া তুলিলাম দেখিলাম সে একটী স্ত্রীলোক, ভয়ে অর্দ্ধ সংজ্ঞাশূন্যা। আবার একটা ঢেউ আসিল। আমি রমণীকে ধরিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। ঢেউটা চলিয়া গেল। তাহাকে টানিয়া প্রায় তিন চারি হস্ত তীরের দিকে ছুটিয়া আসিলাম। সেই অবসরে বুঝিলাম আমার সঙ্গিনী যুবতী। আবার ঢেউ আসিল, আমি হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। যুবতীকে বলি-লাম, লাফাও। দুইজনে লাফাইলাম। আবার তীরের দিকে একটু সরিয়া আসিলাম। রমণীকে তখনও ছাড়ি নাই। আমার বামহস্তে তাহার কটীদেশ বেষ্টন করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার হস্ত ধরিয়া ছুটিতেছিলাম। এবার একটু সময় পাইয়া দেখিলাম রমণী বেশ সুন্দরী। আবার ঢেউ আসিল। আবার দুজনে জমি ছাড়িয়া উঠিলাম। তাহার পর তীরে আসিলাম। একটা তরঙ্গের অবশিষ্ট জলরাশি আমাদের দুইজনের পদ ধৌত করিয়া দিল। বালুকার

উপর উঠিয়া সঙ্গিনীর মুখ দেখিলাম। কি আশ্চর্য্য! এ যে নলিনী! নলিনীও আমার মুখের দিকে তাকাইল। চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। আমি ত্রাস্ত হইয়া নলিনীর অঙ্গ ছাড়িয়া দিলাম। নলিনী ব্যস্ত হইয়া আপনার অঙ্গের বস্ত্রাদি বিন্যস্ত করিয়া লইল।

(২)

আহারাদি করিয়া আমরা ক্ষুদ্র বাসাটির বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। পুরীতীর্থের আনন্দবাজারে অন্নব্যঞ্জনাদি কিনিতে পাওয়া যায়। যাহারা স্বয়ং কিনিতে না পারে তাহাদিগকে পাণ্ডারা প্রসাদ আনিয়া দেয়। যাত্রীরা তাহাই আহার করে। আমাদিগের সহিত স্ত্রীলোক ছিল না, আর সকলেই তরুণবয়স্ক; সুতরাং আমরা সঙ্গে করিয়া পাচক লইয়া গিয়াছিলাম এবং ইচ্ছামত মৎস্য মাংসাদি পাক করিয়া আহার করিতাম। শ্রীক্ষেত্রে রন্ধন করিয়া খাইতে নাই—এ আইনটাকে আমরা কুসংস্কার বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। বীরেন্দ্র বলিত সকলই তাঁহার প্রসাদ। সুতরাং গৃহে পাক করিয়া আহার করিলেও তাঁহারই প্রসাদ ভক্ষণ করা হয়।

আমার বড় একটা খেলিবার ইচ্ছা ছিল না। বন্ধুরা পাশার ছক্ বিছাইয়া আমাকে খেলিবার জন্য অনুরোধ করিল।

আমি বলিলাম—আমার আজ বড় নোনা লেগেছে, একটু শুই। তোমরা খেল।

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—সাগর ছেঁচে রত্ন তুলতে গেলে একটু চোখে মুখে নুন ঢোকে।

তাহার কথা শুনিয়া আমার বন্ধুগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম—ছিঃ ছিঃ তোমরা ভদ্রতার বাহিরে যাও কেন? আমি বল্‌ছি যুবতী আমার পরিচিতা।

একজন বন্ধু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—তোমার কোনও বন্ধুর স্ত্রী? যে বুড়া ভদ্রলোকটি তোমায় ধন্যবাদ দিলেন তিনিও তো তোমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল।

আমি বলিলাম—উনি আমার পিতার সহিত একত্র কার্য্য করিতেন। যুবতীকে আমি বাল্যাবধি জানি। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে উহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখি নাই।

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল—উহারই সহিত তোমার বিবাহের কথা হইয়াছিল?

বীরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল—ওঃ বুঝেছি ; এই সেই বালিকা ? ইহারই জন্য আজ ২৩ বৎসর বয়স অবধি হিন্দুর ঘরে তুমি আইবুড়া ?

আমি জোড়হাত করিয়া তাহাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিলাম, যে কথাগুলা অতি বর্ব্বরোচিত হইতেছে। নলিনী এখন অপরের স্ত্রী। তাহাকে বিবাহ করিতে পাই নাই বলিয়াই আমি অনূঢ়, একথাটা যে প্রলাপ তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম। শেষে তাহাদিগকে বলিলাম তোমরাও তো সকলে বিবাহিত। যদি তোমাদের স্ত্রী সম্বন্ধে অপরে এরূপ বিদ্রূপ করে কি মনে হয় বল দেখি ?

বীরেন্দ্র হাসিয়া ক্রোড়স্থিত উপাধান চাপড়াইয়া বলিল, তাহা হইলে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করি। আমার স্ত্রীর যে চেহারা –

একজন বন্ধু বলিল – চুপ্ চুপ্ সেই বুড়া বাবু আসছেন।

আমি শশব্যস্তে উঠিয়া দরজার নিকট গিয়া দেখিলাম নলিনীর পিতা রমেন্দ্রবাবু আসিতেছেন।

ভদ্রলোক আসিয়া আবার আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আমি অতি বিনয় সহকারে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে আমি দৈবাৎ নলিনীকে ধরিতে পারিয়াছিলাম। আমি না ধরিলেও সে আপনি উঠিত।

আমার বন্ধুদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলাম। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শুনিয়া বৃদ্ধ রমেন্দ্রবাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাঁহাদের ভদ্রতায় এবং সৌজন্যতায় তিনি আপ্যায়িত হইয়াছিলেন সে কথাও ব্যক্ত করিতে ভদ্রলোক ভুলিলেন না। আমি মনে মনে বুঝিলাম মানুষের ধারণাগুলা কিরূপ ভ্রান্ত হয়।

কথাপ্রসঙ্গে বীরেন্দ্র বলিল—আপনার জামাতাটি কি করেন ?

রমেন্দ্রবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—জামাতা জীবিত থাকিলে কি দুধের মেয়েকে তীর্থ করতে নিয়ে আসি। আজ বৎসরাবধি নলিনী বিধবা।

কথাটা আমার প্রাণে বড় বিষমভাবে বাজিল। আমি বন্ধুদের মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সকলেই ব্যথিত হইয়াছে।

অনিচ্ছাস্বত্বেও রমেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার বাসায় যাইতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

(৩)

ঠিক জগন্নাথদেবের প্রধান মন্দিরের নিম্নে নামিয়া বিমলা দেবীর মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া মন্দিরের চূড়া দেখিতেছিলাম। দুইশত ফিট উচ্চ বিশাল দেউল

শিখরের উপর জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রাদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি দেখাইয়া একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—মন্দিরের কোনও দিকে এরূপ মূর্ত্তি নাই,এখানে তিন মূর্ত্তির কারণ কি বল দেখি?

পশ্চাৎ হইতে একজন হাসিয়া বলিল—কি হচ্ছে?

সকলে ফিরিয়া দেখিলাম পশ্চাতে রমেন্দ্রবাবু। তাঁহার পশ্চাতে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা আমাদিগকে দেখিতেছেন।

তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহাদিগের নিকট গেলাম।

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিসের তর্ক হ'চ্ছিল?

আমি তাহার দিকে সেরূপ দৃষ্টিতে তাকাইতে পারিলাম না। আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মন্দিরের চূড়ার মূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদের বন্ধুর প্রশ্নটার আবৃত্তি করিলাম।

নলিনী বলিল—পাণ্ডারা বলে দক্ষিণে লঙ্কা থেকে বিভীষণ রাজা দেখিবেন ব'লে নাকি ঐ মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে বিভীষণ রাজার সময়ে যে জগন্নাথের মন্দির বর্ত্তমান ছিল তার তো কোনও প্রমাণ নাই।

আমি হাসিয়া বলিলাম—এখানকার প্রত্যেক জিনিসটার এক একটা ইতিহাস আছে। আমার বন্ধু অক্ষয় ঐ রকম অনেকগুলা ইতিহাস তৈয়ারি ক'রেছেন।

(৪)

অক্ষয়ের নামে পিছনে ফিরিয়া বন্ধুদের দেখিতে গেলাম। দেখিলাম তাঁহারা রমেন্দ্রবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে মন্দিরের পশ্চাৎদিক দিয়া পরিক্রমণের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

আমি রমণী দুইজনকে লইয়া তাঁহাদের দিকে চলিতে লাগিলাম।

নলিনী বলিল—ইতিহাসটা কিসের?

আমি বলিলাম—নানা বিষয়ের; উত্তর দ্বারে কতকগুলা চামচিকির বাসা আছে জানো তো। ও চামচিকিগুলা ওখানে অনেক দিন আছে। সে দিন আমরা ফটকের কাছে বোসেছিলাম। কতকগুলি স্ত্রীলোক আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, এ চামচিকে গুলা শুনেছি বরাবর এখানে বাসা ক'রে আছে। এ গুলাকে তাড়ায় না কেন?

নলিনী বলিল—হ্যাঁ এখানে যাত্রীরাও সকল পদার্থের ইতিহাস চায়।

আমি বলিলাম—অক্ষয় যে ইতিহাসটা বলিল তাহা বড় চিত্তাকর্ষক। সে

বলিল যখন দুর্ব্বৃত্ত কালাপাহাড় জগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণ করিল তখন ভীরু উড়িয়ারা তো পলাইল। ঐ যে পরিখার উপর রন্ধ্র দেখিতেছ উহার প্রত্যেকটির মুখে তখন ভগবান এক একটি চামচিকাকে দৈববলে বলীয়ান করিয়া বসাইয়া দিলেন। মুসলমান সেনা মন্দিরের উপর যেমন তোপ ছুঁড়িতে লাগিল ইহারা অমনি গুলি গুলিকে গিলিতে লাগিল। সেই অবধি জগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদে ইহারা মন্দির মধ্যে স্থান পাইল।

নলিনী প্রত্নতত্ত্ববিধ অক্ষয়ের গবেষণার গল্প শুনিয়া হাসিতে লাগিল। ততক্ষণে আমরা মন্দিরের উত্তর দিকে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রমেন্দ্র-বাবু ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে ও স্ত্রীকে বন্ধন গৃহ দেখাইতে লইয়া যাইতে চাহিল।

নলিনী বলিল—আমরা এখানে দাঁড়াই তোমরা ঘুরে এস। মন্দিরগুলার ভিতর পাণ্ডারা পয়সার জন্যে যে বিরক্ত করে আমার যেতে ইচ্ছা হয় না।

তাঁহারা বন্ধন গৃহের দিকে গেলেন, আমরা উত্তর দ্বারের সিঁড়ির উপর বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম।

নলিনী নিম্নে দৃষ্টি করিয়া অন্য মনে বলিল—এখানে বাজারে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়। তুমি স্ত্রীর জন্য কি কিন্‌লে?

আমি হাসিয়া বলিলাম—কাঁটাল না পাকিলে গোঁফে তেল দিয়া কি হইবে। স্ত্রী হ'লে তখন ফিরে এসে বাজার ক'রে নিয়ে যাব।

নলিনী আমার মুখের দিকে তাকাইল। আবার চক্ষু সরাইয়া লইয়া বলিল—তোমার বিবাহ হয় নাই?

আমি একটু বিচলিত হইলাম। নলিনীর অপরের সহিত বিবাহ হওয়ার সহিত আমার বিবাহ না হওয়ার একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা তাহাকে না বুঝাইয়া কেবল বলিয়া দিলাম যে আমি অনূঢ়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সাহজাহানাবাদ।

একটা সহরের বা দেশের সহিত আপনার নাম সংবদ্ধ রাখিতে রাজা বাদসাহদিগেরও বাসনা হয়। তাই আমরা মোগল সম্রাটদিগের ভিতর এই ইচ্ছা বলবতী দেখিতে পাই। তাজমহাল, ময়ূরসিংহাসন প্রভৃতি গৌরবমণ্ডিত কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়াও সম্রাট সাহজাহান নিজের নামের একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিবার যশোলাভের বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাই তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে তিনি সাহজাহানাবাদ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিতে বাসনা করিয়া নয় বৎসরের মধ্যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

সৌন্দর্য্যস্পৃহা সম্রাট সাহজাহানের স্বাভাবিক বৃত্তি ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুরাতন দিল্লিদুর্গ সম্রাটের সৌন্দর্য্য বৃত্তি সেরূপভাবে চরিতার্থ করিতে পারে নাই। তিনি বাসনা করিলেন এমন একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিবেন যাহার দুর্গের ভিতর দিয়া যমুনার স্রোত প্রবাহিত হইবে এবং প্রত্যেক অট্টালিকা শিখর হইতে প্রবাহমানা যমুনা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই অনুসন্ধানের পর দিল্লির সহরতলী ও নূরগড়ের মধ্যবর্ত্তী যমুনা তীরস্থিত ভূমিখণ্ড সাহজাহানাবাদ সহর প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত হইল। রাজাদেশ মত নক্সা তৈয়ারী হইল এবং জ্যোতিষীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে সম্রাট স্বহস্তে ভিত্তি স্থাপন করিলেন। বলা বাহুল্য, এ শুভ দিন আমোদ প্রমোদে কাটিল।

তাহার পর কর্ম্মচারীবৃন্দ অট্টালিকা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। সাম্রাজ্যের যে স্থলে কৃতী শিল্পনিপুণ কারিগর পাওয়া গেল তাহাদিগকে এই সহর নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। নয় বৎসর তিন মাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর সম্রাটের সাধের ক্ষুদ্র নগরটি ৬০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইল।

আগ্‌রা।

আগরা দুর্গ।

ইতিহাস।—আগ্রায় সর্ব্বপ্রথমে কে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত! ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, আগ্রার অতি প্রাচীনতম হিন্দুদুর্গ দেখিতে পর্ব্বতের ন্যায় ছিল—তাহার প্রাচীরের চূড়া সকল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দৃশ্যমান ছিল। অরাতির ভীষণ আক্রমণে তাহার অঙ্গ হইতে একখানি ইষ্টকও বিচ্যুত হয় নাই, কিম্বা সর্ব্বধ্বংসী কালের দুরন্ত কুঠার তাহার বক্ষে কোন চিহ্ন কিম্বা রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। সময়ে সে দুর্গ মুসলমান শত্রুর হস্তে ভূমিসাৎ হয়। সেরশাহের বংশধর শেলিম শাহ শূর বাদল গড় নামক একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইংরাজি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে জীর্ণ ভগ্ন বাদনগড় দুর্গ সেকেন্দর ও ইব্রাহিমের রণ-সঙ্ঘাতে চূর্ণ হইয়া কালানলে ভস্মীভূত হয়। সম্রাট আকবর সেই স্থানে বর্ত্তমান দুর্গ গঠিত করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর ও শাহ-জাহান ইহার অভ্যন্তরে শিল্প-সৌন্দর্য্যবহুল অনিন্দ্য-সুন্দর হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে ত্রিদিব শোভায় সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই প্রাসাদ-দুর্গে আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ-জাহান এই তিনটি ভুবনবিখ্যাত মোগলসম্রাটের শিল্পপ্রতিভার ত্রিধারায় সৌন্দর্য্যের এক মহাতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান দুর্গ।—রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই আগ্রা দুর্গ। কি সুন্দর বিশাল চিত্র প্রতিম দুর্গ! পাঠক পাঠিকা! আপনারা মনে করিবেন না যে ইহা কেবল সৈন্যগণের নিবাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অভ্যন্তরে অতুলনীয় শিল্প সৌন্দর্য্য বিভূষিত প্রাসাদমালা, মস্‌জীদ, বিরাম মন্দির, প্রমোদ-ভবন, বিলাস কুঞ্জ, স্নানাগার (হামাম) রাজসভা, দেবায়তন, নিকুঞ্জকানন ও উদ্যানমণ্ডপ প্রভৃতি বিবিধ নয়নরঞ্জন সৌধাবলী বিরচিত হইয়াছে। ইহা কেবল দুর্গ নহে —অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সমন্বিত অলকা-সদৃশ মোগল রাজপ্রাসাদ! যে রঙ্গমহালের কথা আপনারা পূর্ব্বতন ভ্রমণকারিগণের গ্রন্থাবলীতে পাঠ করিয়াছেন সেই মণিমাণিক্যখচিত রঙ্গমহাল ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল। যে শিশমহালের কথা আপনারা শুনিয়াছেন সেই অসংখ্য দর্পণ বিমণ্ডিত বরষার ইন্দ্রধনু

তুল্যকান্তি বিশিষ্ট শিশমহাল ইহারই অভ্যন্তরে বিরাজিত। যে দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, মীনাবাজার, নাগিনামস্‌জীদ্‌, সম্মনবুরুজ, খাসমহাল, প্রভৃতি মনোহর সৌধাবলীর বিষয় সদাসর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া থাকেন সেই সকল সৌধাবলী বক্ষে ধারণ করিয়া আগরা দুর্গ আজিও জগতের সমক্ষে বিপুল গৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐহিক সুখ সম্বন্ধে জগতে যাহা কিছু কল্পনা করা যাইতে পারে তাহা সমস্তই এই দুর্গমধ্যে পরিলক্ষিত হইবে।

রাজপথের উভয় পার্শ্বে নাগরিকগণের সৌধশ্রেণী, বিপণিমালা প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আমি দুর্গতোরণে উপনীত হইলাম। কি বিশাল অভ্রভেদী তোরণদ্বার! ইহার নাম দিল্লীগেট। আমরা শকট তোরণের নিকট পৌঁছিবামাত্র চুড়িদার পায়জামা, পঠুর পার্শীকোট, হিন্দুস্থানী জুতা পরিহিত ও মস্তকে সাদা কাপড়ের প্রকাণ্ড পাগড়ী শোভিত এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু দুটি বড় বড়, নাসিকা দীর্ঘ ও আকর্ণ বিশ্রান্ত গুম্ফ। সে আমাকে সেলাম করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিল। সে দুর্গপ্রদর্শকের (guide) কার্য্য করে। নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিল তাহার নাম তুলাসীরাম। দুর্গে প্রবেশাধিকারের জন্য পাশ তাহার নিকট পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত আছে। পাশের ফি ও দুর্গের যাবতীয় দ্রষ্টব্য হর্ম্ম্যাবলী দেখাইবার পারিশ্রমিক প্রভৃতি সর্ব্বসমেত এক টাকা চুক্তি করিয়া তাহার সহিত দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

দিল্লী গেট।—যেমন সুদৃশ্য কেল্লা তদুপযোগী তোরণদ্বার! অভ্রভেদী তোরণশীর্ষ সদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে! যেন কোন পরাক্রান্ত অরাতির গতিবিধি মুহূর্ত্তে নির্ণয় করিয়া লইতেছে! এই দুর্গতোরণের অনুকরণে সম্রাট সাজাহান দিল্লীদুর্গের অনিন্দ্যসুন্দর তোরণ 'লাহোর গেট' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ধন্য মোগল স্থাপত্য কৌশল!—কি রাজপ্রাসাদ, কি প্রমোদনিকেতন! কি দুর্গ, কি সভাস্থল যাহা দেখিতে গমন করি না কেন প্রথমেই তোরণ দৃশ্যে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়! তৎপরে আভ্যন্তরিক শিল্প-সৌন্দর্য্য-সম্পদ হৃদয় বিমোহিত করিয়া জীবন সার্থক করে।

মতি মস্‌জীদ্‌।—ইংরাজিতে ইহাকে Pearl Mosque বলা হয়। তোরণ অতিক্রম করিলে প্রথমেই ইহা পথিকগণের দৃষ্টিগোচর হয়। এমন সুন্দর মস্‌জিদ্‌ পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই! ইহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রভাতের শুক্র তারকার শুভ্র জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে; শ্বেতোজ্জ্বল অমল ধবল

মর্ম্মর প্রস্তরে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে! কোনও স্থানে রঙ্গিণ প্রস্তরের ফুল বা লতাপাতা বিন্যস্ত হয় নাই। যে দিকে ফিরিয়া দেখি কেবলই তুষার-শুভ্র মর্ম্মরকান্তি চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে; যেন শুক্লাম্বরপরিহিতা অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না কোন ত্রিদিবললনা ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। সেই পুণ্য কিরণে যেন দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। একদৃষ্টে একমনে এই ভজনা-মন্দির বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। যে স্থানে শাহজাহান নমাজ পড়িতেন প্রদর্শক আমাকে সেই স্থান দেখাইল।

দেওয়ানী আম।—দেওয়ানী আমে উপস্থিত হইলাম। এখানে সম্রাটগণ প্রকাশ্য দরবার করিতেন। ইহা রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত, কিন্তু অধুনা শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তদুপরে সোণার গিল্টির কার্য্য করা হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০০ ও প্রস্থ ৬০ ফিট। সুদৃশ্য স্তম্ভশ্রেণী পরিশোভিত ও সুন্দর খিলান সংযুক্ত। পশ্চাদ্দিকে উন্মুক্ত গবাক্ষ রহিয়াছে। বেগমেরা সেখান হইতে সময়ে সময়ে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। প্রস্তরময় চন্দ্রাতপযুক্ত সিংহাসন দেওয়ানী আমে সংস্থাপিত।

জাহাঙ্গীর-বাটি। দেওয়ানী আমের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী প্রকাণ্ড গোল প্রস্তরের বাটি রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৫ ফুট, গভীরত্ব ৪ ফুট, এবং পরিধি প্রায় পঁচিশ ফিট হইবে। বাটির গাত্রে অস্পষ্ট পারস্য ভাষায় কি লেখা রহিয়াছে। এই বিচিত্র হৌজ চৌবাচ্চা বা বাটি একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। ভিতরে নামিবার জন্য একটি ছোট সিঁড়িও আছে। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অদ্ভুত। ইহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সখের জিনিস ছিল।

কলভিন-কবর।—নিকটেই জন্ রসল কলভিন সাহেবের সুচারু সমাধি! ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি আগ্রার গবর্ণর ছিলেন। মিউটিনীর সময় দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

নাগিনা-মসজীদ।—ক্ষুদ্র নাগিনামসজীদ্ দেখিতে কি মনোহর! এই ভজনালয় বাদশাহ আরঙ্গজীব অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমললনাগণের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার গঠন সৌন্দর্য্য একখানি মনোহারী চিত্রের ন্যায় আমার চক্ষে প্রতিফলিত হইল। সম্মুখেই গোলাপ জলের ফোয়ারা। ইহার নিকটস্থ একটি কক্ষে শাহজাহান তাজমহলের ত্রিদিব ছবি দেখিতে দেখিতে বন্দীজীবন যাপন করিয়াছিলেন। সুদূর অতীতের খরস্রোতবাহিনী যমুনা নিম্নে মৃদুমন্থরে প্রবাহিত হইতেছে।

মীনাবাজার।—চৌদিকে অলিন্দ-শ্রেণী পরিশোভিত বিশাল প্রাঙ্গন মীনাবাজার নামে অভিহিত। এখানে বাদশাহবর্গের খোশরোজ হইত। নানাবিধ শিল্প-বহুল কারুকার্য্য শোভিত পণ্য লইয়া সুন্দরী মোগল যুবতী ললনা-গণ সখের বাজার বসাইতেন। বাদশাহ ও বেগমেরা রূপের হাটে হাট করিতেন। ফুলের ছড়াছড়ি, উল্লাসের গড়াগড়ি ও কেনাবেচার হুড়াহুড়িতে একদিন এই স্থান মহাহর্ষে ঝঙ্কৃত হইত! হায়! কোথায় সে দিন!

মচ্ছিভবন।—এই মচ্ছিভবন লক্ষ্ণৌ নগরীর যুগল মৎস্যাঙ্কিত সমুচ্চ তোরণ শোভিত বিরাট ইমামবাড়ী মচ্ছিভবন নহে। ইহা সুবিস্তৃত অঙ্গনযুক্ত একটী রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিতল সৌধ। শুনিলাম এই অঙ্গন একটি মৎস্য পরিপূরিত সরোবর ছিল। বেগমেরা ছিপ হস্তে বারান্দায় বসিয়া সখ করিয়া মৎস্য ধরিতেন। একটি শ্বেত মর্ম্মর রচিত সুদৃশ্য মণ্ডপ মচ্ছিভবনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

দেওয়ানী খাস।—দেওয়ানী খাস শ্বেতমর্ম্মর রচিত। এখানে মন্ত্রীগণকে লইয়া বাদসাহ গোপনে পরামর্শ করিতেন। দেওয়ানী খাস একটি দুইপ্রস্থ দালান। দৈর্ঘ্যে ৬৪, ও প্রস্থে ৩৪, ও উচ্চতায় প্রায় পঁচিশ ফুট হইবে। স্তম্ভ-শ্রেণী ও খিলানগুলি সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত। মার্ব্বেল পাথর কুঁদিয়া পুষ্পাধার, পুষ্প প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে। সম্মুখস্থ ছাদের উপর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত একটি আসন রহিয়াছে। বাদসাহ ইহার উপর বসিয়া নিম্নে যমুনাতীরস্থ ভূমিখণ্ডে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হস্তী ও বন্যমহিষ প্রভৃতি জন্তুর লড়াই দেখিতেন। আসনটি ফাটিয়া গিয়াছে। এখানকার লোকে বলে জাঠেরা যখন আগ্রা বিধ্বস্ত করিয়া ইহার উপর পদার্পণ করে তখন ইহা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল।

সম্মন-বুরুজ।—সম্মন-বুরুজে উপনীত হইলাম। কি মনোহর শিল্প শোভা! এটি কি কুবেরের বিলাস কক্ষ! মণিমাণিক্য খচিত এমন অপূর্ব্ব শোভাময় প্রাসাদপ্রকোষ্ঠ আমি আর কখনও দেখি নাই। যমুনাতীরে দুর্গ-প্রাকারের উপর এই ত্রিদিবলাঞ্ছিত অনিন্দ্যসুন্দর ভোগমণ্ডপ সম্রাট সাহজাহান তাঁহার মহিষী আরজমন্দ বাণু বেগম বা মমতাজ মহলের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করেন। কক্ষতলে মর্ম্মর বিনির্ম্মিত গোলাপপুষ্পসদৃশ জলাধার সুরক্ষিত। ইহার সুবাসিত জলে সেই বিশ্ব বিমোহিনী রাজরূপসী তাঁহার হেমঅঙ্গবল্লী বিধৌত করিতেন। প্রাচীর গাত্রে দুইটী তাক দৃষ্ট হয়। স্বর্ণসোপানের দ্বারা উহাতে

আরোহণ করিয়া তিনি অঙ্গের রত্নালঙ্কার সময় সময় উন্মোচন করিয়া রাখিতেন। পূর্ব্বে প্রাচীরগাত্রে যে সকল বহুমূল্য প্রস্তরাদি বিন্যস্ত ছিল দুর্দ্দম জাঠেরা প্রায় সমস্ত উৎপাটিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কৃত্রিম প্রস্তরাদি বসাইয়া দিয়াছে। এই মণ্ডপের শীর্ষদেশে স্বর্ণকীরিট শোভিত অষ্টভুজ শিরোভূষণ (গম্বুজ) ইহার অপূর্ব্ব শ্রী দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে। যখন বেগমেরা ইহার সুরম্য অলিন্দে বিচরণ করিতেন তখন যমুনায় নৌকা যাতায়াত করিতে পারিত না।

পাঁচিশিঘর।—সমন-বুরুজের সম্মুখস্থ ছাদের উপর কৃষ্ণমর্ম্মর বিন্যস্ত পাঁচিশি ঘর। ইহাতে বাদসাহ ও বেগমেরা ছোট ছোট বালিকাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া জীবন্ত গুটিকায় দশপঁচিশ খেলিতেন!

শিশ্ মহাল।—শিশমহালে প্রবেশ করিলাম। এই প্রাচীন বাদসাহী স্নানাগার এককালে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসমন্বিত ছিল। এক্ষণে সে সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল পূর্ব্ব বৈভবের নষ্ট শ্রী বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। শিশমহাল অন্ধকারময়—বাহির হইতে আলোক প্রবেশের পথ নাই। কক্ষের সমস্ত প্রাচীর গাত্র ও আস্তরণ ছোট ছোট অসংখ্য দর্পণ সমষ্টিতে বিমণ্ডিত। মুকুরগুলির সংযোগস্থলে সুন্দর লতার কারুকার্য্য শোভিত। কক্ষের এক প্রান্তে মর্ম্মর নির্ম্মিত জলাধার। প্রাচীরগাত্র হইতে নল সংযুক্ত। ঐ নলের ভিতর দিয়া যমুনাবারি জলাধারে নিপতিত হইত। শিশমহালে পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোয়ারা ছিল। সেই সকল ফোয়ারা হইতে যখন সলিল উচ্ছ্বসিত হইত তখন গৃহমধ্যে প্রজ্বলিত বিবিধ রঙ্গিন বর্ত্তিকালোকে সহস্র সহস্র দর্পণে অসংখ্য ইন্দ্রধনু প্রতিফলিত হইত। এদিকে সদ্যস্নাতা আলুলায়িতকুন্তলা বাসন্তীবসন বিমণ্ডিতা ললাম-ললনাগণের স্বর্গীয় মুখচ্ছবি মুকুরে মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া ত্রিদিব সৌন্দর্য্যকেও পরাস্ত করিত। জলাধারের তলদেশের শিল্প এত মনোহর যে জলপূর্ণ হইলেই অসংখ্য মৎস্যাকারে পরিণত হইত। শিশমহালের এত সৌন্দর্য্য কোথায় গেল!

হামাম।—কতকগুলি কক্ষ-সমষ্টিতে এই অপূর্ব্ব হামাম বা স্নানাগার (Bagnio) বিরচিত। শত শত প্রস্রবণ হইতে সলিল উচ্ছ্বসিত হইয়া কক্ষ হইতে কক্ষাভ্যন্তর স্নিগ্ধশীতল করিয়া দিত। হামাম হইতে দুইটী সুড়ঙ্গ পথ যমুনায় গিয়া মিলিত হইয়াছে। একটী পথ দিয়া বেগমেরা ও সহচরিগণ যমুনার নিকটস্থ হইতেন ও অপরটি জাহাঙ্গীরের হিন্দুপত্নী যোধবাইএর জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। অলিন্দশ্রেণী হইতে যমুনার পরপারস্থিত তাল নিকুঞ্জের

শোভা বড়ই প্রীতিপ্রদ। অর্দ্ধক্রোশ দূরস্থিত তাজসৌধের ধবলছবি স্ফটিকোজ্জ্বল গজদন্তনিভ মুক্তার ন্যায় সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতেছে।

খাস মহাল।—মাধুর্য্যের মনোমোহন ছবি খাসমহাল রাজসুন্দরীগণের খাস্ বৈঠকখানা। এখানে প্রফুল্ল চম্পকদাম সদৃশ যৌবনমদময়ী রূপসীগণ সতত আমোদপ্রমোদে বিভোর থাকিতেন। জাফরিআবৃত গবাক্ষপথ হইতে যমুনার নীল লহরীলীলা সন্দর্শন করিতেন। হাস্যকৌতুকে, রহস্যপরিহাসে, সঙ্গীত-ঝঙ্কারে এই ত্রিদিবকুঞ্জ সতত মুখরিত ছিল। খাসমহালের শিল্পশোভা অতিশয় চিত্তহারী। সৌন্দর্য্যেই সৌন্দর্য্যের মিলন! সমগ্র মহালই মর্ম্মরময়। গৃহচূড়, অলিন্দ, গৃহতল, প্রাচীর, মণ্ডপ, চন্দ্রাতপ, গবাক্ষ, সমস্তই মর্ম্মর মণ্ডিত। মর্ম্মরজাফরির যবনিকার দ্বারা কক্ষগুলি বিভক্ত। আস্তরণের সৌন্দর্য্য এক্ষণে মলিন হইয়াছে। উত্তরপূর্ব্ব কোণে অতি সামান্য অংশের পুনরুদ্ধার করিতে গবর্ণমেণ্টের তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সেকেন্দ্রাতেও কিঞ্চিৎ-মাত্র নষ্টশিল্প পুনরুদ্ধার করিতে পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া যায়। কক্ষআস্তরণ পূর্ব্বে রৌপ্য ও স্বর্ণের কারুকার্য্যে বিমণ্ডিত ছিল।

খাসমহলের সম্মুখেই স্নানের জন্য একটি জলাধার। ইহার চারিদিকে বসিবার নিমিত্ত আসন নির্ম্মিত। প্রত্যেক আসনের পশ্চাত, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে তিনটি ফোয়ারা বক্রভাবে উত্থিত হইয়া মধ্যের দিকে আসিয়াছে। যিনি স্নান করিতে বসিবেন তাঁহার দক্ষিণ, বাম ও পশ্চাত হইতে জলধারা ফোয়ারা হইতে উত্থিত হইয়া মস্তকের উপর মৃদুতেজে বর্ষিত হইবে। বিলাসের কি মধুর কল্পনা!

খাসমহলের বারন্দায় পূর্ব্বে অনেক বাদসাহগণের চিত্রাবলী সন্নিবেশিত ছিল। দুর্দ্ধর্ষ জাঠেরা সমস্ত চিত্রই উৎপাটিত করিয়া ভরতপুরে লইয়া গিয়াছিল। ক্ষত চিহ্ন সমূহ এখনও প্রাচীরে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

অঙ্গুরীবাগ।—খাসমহলের সম্মুখেই শোভন উদ্যান অঙ্গুরীবাগ হরিত শোভায় উচ্ছ্বসিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে গোলাপ, দ্রাক্ষা, নারিঙ্গি, জেস-মিন প্রভৃতি তরুরাজি সন্নিবিষ্ট। চতুর্দ্দিকের গৃহাবলী অন্তঃপুর রূপে ব্যবহৃত হইত। সে গুলি দেখিতে চমৎকার। একদিকে স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত মর্ম্মরমণ্ডপ বিরাজিত। উদ্যান হইতে একটী সঙ্কীর্ণ পথ রাজান্তঃপুর ও শিশমহলের দিকে গিয়াছে।

সোমনাথ গেট।—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া

সেনাপতি পলক (General Pollock) গিজনী হইতে এই তোরণ আনয়ন করেন। লর্ড এলেনবরার (Lord Ellenborough) আদেশে ইহা আগ্রাদুর্গে সুরক্ষিত হয়। ইহা মামুদের সমাধি মন্দিরের প্রবেশদ্বার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ইহা সোমনাথের মন্দিরদ্বার নহে। ইহা উক্ত দ্বারের অনুকৃতি। তাহা চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল, ইহা অন্য কাষ্ঠে নির্ম্মিত। প্রকৃত দ্বার অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়ায় বর্ত্তমান দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ঝড়কা-বুরুজ।—প্রদর্শক ছলাসীরাম যমুনাতীরস্থ একটী কক্ষ দেখাইয়া বলিল, ইহার নাম ঝড়কা বুরুজ; এইখানে সাহাজান তাজ দেখিতে দেখিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এ কথা বিশ্বাস হইলনা; প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-গণ লিখিয়াছেন যে, তিনি সম্মন-বুরুজে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর ও যোধবাই মহল।—রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত জাহাঙ্গীর মহলে প্রবিষ্ট হইলাম। ইহাতে খিলান আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। রক্তপ্রস্তরের শিল্পশোভা দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলাম। মধ্যে মধ্যে মর্ম্মরের শ্বেতশোভা সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করিয়াছে। এই স্থানে দুটি সুবৃহৎ প্রাঙ্গন বিরাজিত। স্তম্ভ শ্রেণীর শিল্প অতীব সুন্দর। আস্তরণ পূর্ব্বে স্বর্ণমণ্ডিত ছিল! পক্ষীযুগলের উপর পদ্মের মনোহারী নাগদণ্ড (Bracket) ও হস্তীর কারুকার্য্য প্রভৃতি—শিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন এই মহলে প্রদর্শিত হইয়াছে। যোধবাই জাহাঙ্গীরের হিন্দুপত্নী ছিলেন। তাঁহার জাতীয় ধর্ম্ম সম্রাট কর্তৃক যথাবিহিত সুরক্ষিত হইয়াছিল। একটী শিবমন্দির আছে। হনুমানজীর মূর্ত্তি আরঙ্গজীব চূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহার যমুনা-স্নানের জন্য স্বতন্ত্র দ্বার ছিল, এক্ষণে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মহলে প্রাচীরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে।

আঁখমচলি।—এই মহলে আঁখমচলি অর্থাৎ লুকোচুরী খেলার স্থান বড়ই বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে।—তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না। যোধবাইএর নাট্যশালাও দেখিবার যোগ্য। সেখানে নর্ত্তকীরা নৃত্য করিত। সেই 'কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা' এক্ষণে ঘোর অন্ধকারময় হইয়া রহিয়াছে! কাল বলবান!

কেতাবখানা।—জাহাঙ্গীরের কেতাবখানায় প্রস্তর নির্ম্মিত পুস্তকাধার দেখিয়া বড়ই কৌতুক অনুভব করিলাম। জাহাঙ্গীর বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পূর্ব্বেকার শিল্পের কিঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার করিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হইয়াছেন।

গর্ভগৃহ।—খাসমহলের দক্ষিণস্থ সোপানশ্রেণীর দ্বারা ভূগর্ভস্থ গৃহে উপনীত হওয়া যায়। ইহা নিম্নস্থ একটী বাউলি বা বিশাল কূপের নিকট গিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে সম্রাট তাঁহার প্রিয়তমা বেগমদিগের সহিত প্রমোদরত হইয়া গ্রীষ্মতাপ দূর করিতেন। জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন ;—

সম্রাট এই যমুনাতীরস্থ গর্ভগৃহে বেগমদিগের সহিত পরম কৌতুকে নৃত্য-গীতে কালক্ষেপ করিতেন। বাউলীর প্রাচীরের পার্শ্বদেশে জলের উপরিভাগে মখমলের উপর সমাসীন রাজললনাগণের প্রমোদপূরিত কলহাস্যে ও উল্লাস ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইত। এদিকে যমুনাবক্ষে নাবিকেরা উর্দ্ধমুখে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সমুচ্চ দুর্গপ্রাকারের দিকে চাহিয়া দেখিত আর ভাবিয়া আকুল হইত কোথা হইতে এই হাস্যরোল কলধ্বনি উত্থিত হইতেছে!

হত্যাগৃহ।—ইহারই অদূরে খাসমহলের নিম্নদেশে অন্ধকারময় ভীষণ হত্যাগৃহ। ৭।৮ ফিট উপরে একটি কড়িকাষ্ঠ রহিয়াছে। রাজান্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভ্রষ্টা বলিয়া বিদিতা হইতেন তাঁহাদিগকে রেশমের রজ্জুদ্বারা এই স্থানে ফাঁসি দেওয়া হইত। পরে শবদেহ দুর্গতলবাহী পথ দ্বারা যমুনানীরে বিসর্জ্জিত হইত! অহো! প্রমোদকুঞ্জের নিম্নতলে কি বিকট ভীষণ স্থান বিরাজিত! আলোকের পশ্চাতে অন্ধকার!

এই সকল দর্শনীয় স্থান দেখিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামার্থ আমি উদ্যানে আসিয়া বসিলাম। হায়, অতীতের শতস্মৃতি হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! ভাবিলাম যাঁহারা এই ইন্দ্রালয়ে মর্ত্ত্যসুখ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কোথায়? সেই অসূর্য্যম্পর্শা রূপসীগণ যাঁহাদের রূপের কিরণে হীরকের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া যাইত, তাঁহারা জলবিম্বের ন্যায় কালসাগরে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন! সেই রাজঐশ্বর্য্য চূর্ণ হইয়া কোথায় ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে! মোগল রাজ-গৌরবের মহাসমাধি আজি মহাসুপ্ত—মহামৌন অবস্থায় বিরাজ করিতেছে!—কেহই নাই, কেবল শূন্যগৃহে মহাশূন্যতা নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে!

আমি স্তব্ধহৃদয়ে অমরসিং-গেট দিয়া প্রাসাদদুর্গ পরিত্যাগ করিলাম। পারিশ্রমিক পাইয়া হুলাসীরাম আমাকে একটি লম্বা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

কবিতা-কুঞ্জ।

শেষ—বেশ।

"বিয়ে কর্লে খাওয়ালে না একি সদানন্দ ?"
"বল্‌ব কি ছাই শদা দাদা কপাল বড় মন্দ ;—
স্ত্রীটি আমার বদ্ধ পাগল।"
"পাচ্চ তবে কষ্ট ?"
"এমন কষ্ট নয়ক কিছু—বলে ফেলি স্পষ্ট
বিয়ের সঙ্গে পেলেম আমি বিষয় শ্বশুরের—"
"ভাল ভাল"
"কিন্তু তাতেই ঘট্‌ল বিপদ ফের
সে বিষয়ের কর্লে দাবী বৈমাত্র সম্বন্ধী ;"
"দুঃখের কথা—কর্লে কিহে ?"—
"শালার সঙ্গে সন্ধি।—
সে নিলে জোৎ জমা আমি পেলেম
ভেড়ারপাল,"
"মন্দের তবু ভাল বটে"—
"হা পোড়া কপাল !
ঘরে আন্‌তেই ভেড়াগুলোর ধর্ল বিষম রোগ
একেবারে মল যে সব—"
"কেবল কর্ম্মভোগ ?"
"কর্ম্মভোগই কেন ? তাতে হয়নি বড় ক্ষতি ;"
"বটে,বটে কেমন করে ? কি কর্লে তার গতি ?
"পশমশুদ্ধ চামড়া বেচে পেলেম কিছু টাকা,
চর্ব্বিগুলো জড় করে হয়েছিল রাখা।"
"বটে, সেত লাভের কথা—"
"মোটেই লাভের নয়"
"কেন কেন—কি ঘট্‌ল আবার ?"
"বলছি সমুদয়—
চর্বি থেকে কর্বে বলে তৈরি মোমের বাতি
কলেজ পড়া ছেলেটা ঐ—"
"দেবাখুড়োর নাতি ?"
"হাঁ—চর্বি গলাতে আগুন সে লাগালে ঘরে"
"কি দুর্ভাগ্য।"
"দুর্ভাগ্য যা বলি কেমন করে ?"
"সে কি ?"
"ঘরের সঙ্গে প্রিয়া—দগ্ধ হলেন মোর
পাগলীর হাত এড়িয়ে গেলেম—"
"খুবত কপাল জোর।"
"শেষ ভালটাই ভাল দাদা—"
"ঘটিও না আর মন্দ—
"এবার বিয়ের সময় খাইয়ে দিও সদানন্দ।"

শ্রীরসময় লাহা।

অন্বেষণ।

জীবন মাহেন্দ্রক্ষণে আকুল পরাণে—
যে দিন করিনু যাত্রা তোমার চরণে—
কত আশা হ'ল হত মথিত মরণে—
কত নিশা হ'ল গত বাথিত স্বপনে !
স্তরে স্তরে ক্ষণে ক্ষণে দহনে সহনে
তমসার মাঝে কভু নিবিড় গহনে—
কি বিশ্বাস অবিশ্বাস দ্বিধা দ্বন্দ্ব সনে
কভু ক্ষুদ্র ক্ষীণ-জ্যোতিঃ বিবেক কিরণে।
এবে উপনীত দেখ ! মন্দির সকাশে—
মনে হয় কত ভ্রান্ত মুগ্ধ মোহপাশে—
নিকটে নিকটে সখা ত্যজিয়া তোমায়—
কি অজ্ঞের পণ্ডশ্রমে খুঁজি উত্তরায়—
আজি ক্লান্তি বিদূরিয়া মানসে চরণ
কি স্নিগ্ধ কৌমুদী আভা করে বিকীরণ !

শ্রীউমাচরণ ধর।

সাহিত্য-সমাচার।

জাহ্নবী।—কার্ত্তিক ১৩১৬। বর্ত্তমান সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য ও পঠিতব্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব। "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব গ্রন্থ" একটি সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বঙ্গানুবাদ; অনুবাদটী সুমিষ্ট হইয়াছে। "ফরাসী-তুলিকায় সেরাজের চিত্র"—শুধু বাজে কথায় পূর্ণ, প্রতিপাদ্য বিষয়টী চর্ব্বিত চর্ব্বণ। "পুরাতন ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা" ইহা একটী আবর্জ্জনা স্তূপমাত্র। জাহ্নবীর অঙ্গ "ভরাট" করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উপরন্তু মাননীয়া সম্পাদিকা লেখকের "ভারী দুরাবস্থা" মোচন করেন নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত। "হর্ষ"—গান—রবীন্দ্র বাবুর নাম স্বাক্ষরিত না থাকিলে ইহা পাঠে আমরা দুঃখিত হইতাম না। "শ্রীলীলাশুক ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় লীলাশুককে দ্রাবিড় দেশীয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন অতএব আমাদের সব দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে। এই শ্রেণীর গম্ভীর (?) গবেষণা আবর্জ্জনায় বঙ্গ-সাহিত্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে, যাহা হউক লেখককে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "শেফালি" করুণ-রসাত্মক কবিতা; মন্দ হয় নাই। "শাখীনামা"—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। "সমাজ সংস্কার"—এই প্রবন্ধে অনেক তর্জ্জন গর্জ্জনের পর একটি মূষিক প্রসব হইয়াছে।

প্রবাসী।—পৌষ, ১৩১৬। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত "রসময়ীর রসিকতা" ক্ষুদ্র গল্পটী বেশ হইয়াছে। প্রভাতবাবুর ভাষা ও বক্তব্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। প্রভাত বাবুর "রমেশচন্দ্র-স্মৃতি" বিষয়গুণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহা একটী ক্ষুদ্র Reminiscence হইলেও ইহাতে আমরা রমেশবাবুর কর্ম্মবহুল জীবনের এবং উদার হৃদয়ের আংশিক আভাস পাই। "আলাউদ্দিন খিলিজির অনুশাসন" এই সংখ্যার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "তপোবন" যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। ইহাতে শকুন্তলা আছে, কুমারসম্ভব আছে, রঘুবংশ আছে, ঋতুসংহার আছে, মেঘদূত আছে, ইহাতে উপনিষদ আছে, টৈগ্রিভি আছে, যেমন-হওয়া-আছে, যেমন-হওয়া-ভালো আছে, ইহাতে সেক্সপিয়র আছে, প্যারাডাইসলষ্ট আছে, আর নাই কি? ইহা ঠিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের "চানাচুর"! বাস্তবিক রবীন্দ্রবাবুর ভাষা দিন দিন "শব পোড়ান" "মড়াদাহ"র মতন এবং রচনাগুলি "কান বেড়িয়া নাক দেখানর" মতন হইতেছে। রবীন্দ্রবাবু কি শপথ করিয়াছেন যে তিনি আর সরল ভাষায় তাহার বক্তব্য বলিবেন না? শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও বর্ত্তমান যুগের আদর্শ" এক অদ্ভুত সমালোচনা। রবীন্দ্রবাবু মনে করিয়াছিলেন যে তিনি 'তপোবনে' সমস্ত কবিরই নাম শেষ করিয়াছেন। না, ব্রাউনিঙের নাম বাদ পড়িয়াছে। অজিতবাবু সদস্ত্রে অমনি পর পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রবাবুকে ব্রাউনিঙের স্কন্ধে বা ব্রাউনিঙকে রবীন্দ্রবাবুর স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন।

জীব-কোষ বস্তু-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য—কত কি বলিয়াছেন। আমরা নিজ মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি তিনিও কি এই সমালোচনার বিন্দুমাত্র বুঝিয়াছেন ? না 'সুবোধ বালকে'র মত যাহা পাইয়াছেন তাহাই ছাপিয়াছেন ? দিন দিন একি হইতেছে ! এতদিন তো পরিচিত বা অপরিচিত, বন্ধু বা শত্রু, গুণগ্রাহী বা দোষগ্রাহী ব্যক্তিরাই সমালোচনা করিতেন। এখন নিজ গৃহ বা নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক—নিজ বাটীর বা অধীনস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা নিজ কাব্যের সমালোচনা—বনাম নিছক স্তাবকতা—প্রকাশ করানই কি পদ্ধতি দাঁড়াইল ? এবং এই সকল সমালোচনার প্রশ্রয় দেওয়া কি সম্পাদকগণের উচিত? আমাদের মনে হয় প্রবাসীর সমালোচক 'মুদ্রারাক্ষস' ইণ্ডিয়া পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত পুস্তকগুলির প্রশংসাবাদে শতমুখ এবং অন্যের লিখিত বা প্রকাশিত পুস্তকের অযথা নিন্দাবাদে বিমুখ নহেন। ইহা সমালোচনার নামে ব্যবসায়—ঘৃণ্য ব্যবসায়।

মানসী।—অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 'মানসী'—কবিতা—কতকগুলি শব্দের সমষ্টিমাত্র—আমাদের ভাল লাগিল না। "রচনা-রীতি"—প্রবন্ধটী চর্ব্বিত চর্ব্বণ। "ভারতে স্থাপত্য-কলা"—প্রবন্ধ—ভাষা সুন্দর এবং সুপাঠ্য হইয়াছে। "স্নেহের জয়"—কবিতা—বেশ হইয়াছে। "ছাত্র"—গল্প—বেশ হইয়াছে, পাঠে পরিতৃপ্তি হয়। "কাব্যে অপহরণ"—শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক "রবীন্দ্রবাবুর পুরাতন অনেক রচনার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রবাবুর আধুনিক রচনার যে সকল "অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য" লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে ৩২টী নমুনা উদ্ধৃত করিয়া 'বিচক্ষণে'র হস্তে সেগুলির বিচার ভার অর্পণ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ৪।৫টী ব্যতীত সমুদায় দৃষ্টান্তগুলি 'দোষ দেখাইব' এই ভাবে জোর করিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের সহিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামের "অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য" ও কেন যে লেখকের অতি সূক্ষ্ম (?) দৃষ্টিতেও পড়ে নাই ইহা ভাবিবার বিষয়। আমরা লেখকের বিদ্যার দৌড় এবং 'বিচক্ষণ' সম্পাদক চতুষ্টয়কে "সুশীল সুবোধ বালকের" পন্থাবলম্বন করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।

৫।১২ সুকীয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ ।]   মাঘ, ১৩১৬ ।   [১২শ সংখ্যা ।
January 1910.

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

সম্পাদক—
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌ ।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[বার্ষিক ২ ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র]   [ডাক মাশুল লাগে না ।

আগরা।

তাজমহল

তাজমহল।—মোগল শিল্প-নিকুঞ্জ কাননের সদ্যঃফুল্ল পারিজাত, সৌধ-সৌন্দর্য্যের তীর্থভূমি, সম্রাট শাহজাহানের অলৌকিক কীর্ত্তি! স্থাপত্য-কৌশলের মহাসৃষ্টি ভুবনবিখ্যাত তাজমহল দেখিতে যাত্রা করিলাম। কৌতূহল ও হর্ষের সংমিশ্রণে আমার হৃদয়ের কম্পিত উচ্ছ্বাস বর্ণনাতীত! অধৈর্য্যে ও উল্লাসে সমস্ত পথ আমার চিত্ত বিলোড়িত হইতে লাগিল! তাজদর্শনের চিন্তায় আমি এতদূর তন্ময়চিত্ত হইয়াছিলাম যে পথের উভয় পার্শ্বের প্রাচীন দৃশ্যাবলী আমার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই।

শীতকাল। বেলা প্রায় ৩টা; অপরাহ্নের স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ নীল নভোমণ্ডলে ঝলমল করিতেছে! আগ্রার ধূলি ধূসরিত রাজপথে ধূলি উড়াইতে উড়াইতে আমার শকট ক্রমে একটী তোরণ অতিক্রম করিয়া তাজের সুবিশাল উর্দ্ধচুম্বী সুরম্য তোরণ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তোরণ অপূর্ব্ব সুন্দর! শিল্পসৌন্দর্য্যে মনোরম!—দ্বিতল; বাহ্যদৃশ্যে অনেকটা সেকেন্দ্রার অনুরূপ। তোরণ শীর্ষ ২৬টি মর্ম্মর নির্ম্মিত শিরোভূষণে অলঙ্কৃত। প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে একটী অষ্টভুজ বিশিষ্ট সুন্দর কারুকার্য্যময় গৃহ। রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত তোরণ গাত্রে শ্বেতপ্রস্তর বিন্যস্ত ও তদুপরে মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ হইতে অসংখ্য শ্লোকাবলী কৃষ্ণ অক্ষরে উদ্ধৃত হইয়া তোরণের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। নিকটেই প্রকাণ্ড পান্থশালা। বাদসাহী আমলে এই পান্থশালা নানাদেশীয় জনসমাগমে সতত পরিপূর্ণ থাকিত।

তাজের ইতিহাস।—সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতষ্পুত্রী, সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্রী মহামতি আসফ খাঁর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী দুহিতা আরজমন্দ বাণুর সহিত শাহজাহানের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় বেগমের বয়স উনবিংশ বৎসরের কিঞ্চিৎ উপর হইয়াছিল। বিবিধ সদ্গুণে সম্রাট এতদূর ইঁহাকে ভালবাসিতেন যে, যখন যেখানে যাইতেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এই রাজ-রূপসী ইতিহাসে মমতাজমহল বা মমতাজ-জমানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে খাঁ জাহান লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া শাহজাহান যখন দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একটী কন্যা প্রসবকালে বরহানপুরে মমতাজের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে রাজমহিষীর ৩৯ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের শীতলসলিলা তরঙ্গময়ী তাপতী নদী তীরে জৈনবাদের উৎসপ্রস্রবণোচ্ছলিত কুসুম-স্তবকবহুল সৌরভিত প্রাসাদশোভিত রাজোদ্যানে প্রথমে শবদেহ সমাহিত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, দাক্ষিণাত্য হইতে স্থানান্তরিত হইয়া মৃতদেহ দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদের সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে অষ্টাদশ বৎসর কাল সুরক্ষিত হইয়াছিল। আগ্রায় সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইলে দিল্লী হইতে শবদেহ আনীত হইয়া সমাহিত করা হয়। তাজমহলই সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী মমতাজমহলের সমাধি। তাঁহারই নামানুসারে ইহার তাজমহল নামকরণ হইয়াছিল।

তাজহর্ম্ম্য অকৃত্রিম প্রেমের জীবন্ত নিদর্শন। প্রকৃত প্রেম না থাকিলে কেহই সহিষ্ণুতা সহকারে দ্বাবিংশ বৎসর ধরিয়া বিপুল অর্থব্যয়ে এমন অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন না। সাত বৎসর কাল আগ্রাদুর্গে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিয়া প্রেম-স্মৃতি-বিহ্বল সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিদ্ সম্রাট শাহজাহান দুর্গ হইতে মৃত্যুকালে অনিমিষ নেত্রে তাজ দেখিতে দেখিতে জীবনলীলা শেষ করিয়াছিলেন। সম্রাট আরঙ্গজীবের আদেশে তাঁহাকে তাজগৃহে প্রিয়তমা পত্নীর পার্শ্বে সমাহিত করা হইয়াছিল।

তোরণ অতিক্রম করিলেই সুন্দর শোভনোদ্যান! ঘনশ্যামল তরুরাজি শ্যাম-শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে! রক্তোজ্জ্বল তোরণসৌধের অব্যবহিত পরেই হরিতোজ্জ্বল রম্য উদ্যানের শোভা বড়ই মনোরম।

সম্মুখেই সমুজ্জ্বল ধবলাগিরির ন্যায় তাজমহলের তুষার-শুভ্র বিরাটমন্দির ভাসমান প্রাসাদের ন্যায় শ্যামল নিকুঞ্জ সাগর হইতে উত্থিত হইয়াছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এক প্রান্তে নভোচুম্বী ত্রিদিব-সুন্দর তোরণহর্ম্ম্য, মধ্যস্থলে কয়েকটী প্রস্রবণ-সমন্বিত নয়নরঞ্জন চির-অভিরাম নন্দন কানন! অপরপ্রান্তে নীল যমুনার উপকূলে রজতধবল বিমানস্পর্শী মহামৌন স্মৃতিমন্দির শিল্পতীর্থ তাজ! অপূর্ব্ব দৃশ্য! এরূপ সৌধদৃশ্য পৃথিবীতে আর কোথাও নাই! মানব ও মানবীজন্ম লইয়া যে না তাজ দেখিল তাহার বৃথায় চক্ষু! বিশেষতঃ যাঁহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের এই সমাধিমন্দির না দেখিলে প্রত্যবায় আছে।

এ স্থলে পাঠক পাঠিকা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই বিশাল ভারতবর্ষে এই মুসলমান কীর্ত্তি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুকীর্ত্তি নাই যাহা তাজের সমকক্ষ হইতে পারে? তাজই কি কেবল একটী পদার্থ যাহা না দেখিলে জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়? এ কথার উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের ভারতবর্ষে অনেক বিস্ময়কর হিন্দুকীর্ত্তি—দেবমন্দির আছে, যাহা দেখিলে হৃদয় বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হয়—বহুক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাক হইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ ভুবনেশ্বরের মন্দির, দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুর, চিদাম্বরাম, তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানের অপূর্ব্ব দেবমন্দির সমূহ; রাজপুতানার আরাবলী পর্ব্বতের আবু-শৈল শিখরে দিলওয়ারা মন্দির; মথুরা-বৃন্দাবনের কৃষ্ণমন্দির সমূহ; বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দির; অমৃতসরে শিখ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বর্ণমন্দির; দিল্লী ও লক্ষ্ণৌএর কারুকার্য্যময় ইমামবাড়ী, মসজীদ ও সমাধিমন্দির প্রভৃতি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব মন্দির সমূহ বিরাজ করিতেছে; তাহাদের বহুল শিল্পসৌন্দর্য্যসমন্বিত বিরাট বিচিত্র গঠন দর্শকের চিত্তে যুগপৎ আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে—এমন কি আত্মহারা না হইয়া থাকা যায় না; কিন্তু তাজের বাহ্যসৌন্দর্য্য এবং আভ্যন্তরিক কারুকার্য্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর—শ্বেত প্রস্তরের উপর রঙ্গিণ প্রস্তরের কার্য্যে স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে! বাস্তবিক তাজের শিল্প-সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

আমার সাধ্য নাই যে আমি তাজমহলের যথাযথ বর্ণনা করি! আমাতে সে শক্তির একান্ত অভাব। চক্ষে না দেখিলে কেহই সেই সমাধিসৌধের সম্যক সৌন্দর্য্য ও গঠন চিত্তে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। চিত্র দেখিলে সেই সৌধ-অবয়ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। গঠনাদর্শ দেখিলে সেই সূক্ষ্মসুন্দর শিল্প-মাধুর্য্য কল্পনার অতীত থাকিয়া যায়। বর্ণনা পাঠ করিলে মানসপটে সে চিত্র অঙ্কিত হয় না। কি শিল্পী, কি চিত্রকর, কি কবি, কি লেখক, কি ভ্রমণকারী কাহারও এমন সাধ্য নাই যে, যে ব্যক্তি কখনও তাজ দেখে নাই তাহাকে তাহার অবিকল প্রতিরূপ কলা-নৈপুণ্য দ্বারা বুঝাইতে পারে। আমি তাজের বহু চিত্র বহু আদর্শ দেখিয়াছি, বহু গ্রন্থে বহু বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও সেই মহান্ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অভিব্যক্তি হয় নাই। আমিও যে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা বলিতে পারি না।

তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়াই সম্মুখেই কয়েকটি প্রস্রবণসমন্বিত মর্ম্মর-

রচিত একটি সুদীর্ঘ জলাধার। উচ্ছ্বসিত জলোচ্ছ্বাস ইন্দ্রধনুলীলা দেখাইতেছে! জলমধ্যে অসংখ্য রঙ্গিণ মৎস্য সন্তরণ করিতেছে। জলাধারের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ বৃক্ষরাজি সুশোভিত! উভয় পার্শ্বে প্রস্তর রচিত পাদপথ! আমি সঙ্গীসহ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম—দেখিলাম রত্নখচিত শুভ্রোজ্জ্বল তাজহর্ম্ম্য চক্ষু ঝলসিত করিয়া হিমাচলের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। পৌর্ণমাসী রজনীর রজতোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে যেন সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত (৯৬৪ × ৩৩০) বেদীকার উপর (৩১৩ × ৩১০) ফিট অপর একটি মর্ম্মরনির্ম্মিত সুন্দর বেদীকার উপর তাজহর্ম্ম্য সংস্থাপিত। মর্ম্মর বেদীকার উচ্চতা ১৮ ফিট। যুগ্ম সোপানশ্রেণীর দ্বারা উপরে উঠিয়া তাজ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গেলাম। অনিমিষ নেত্রে উর্দ্ধমুখে বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে ধীর পদবিক্ষেপে চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। যতই দেখিতে লাগিলাম ততই দর্শনতৃষ্ণার বৃদ্ধি বই হ্রাস হইল না। প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম তবু যেন চিত্ত পরিতৃপ্ত হইল না; মনে হইল অমর হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া এই শিল্পসৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া থাকি! কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ধন্য সাহজাহান! ধন্য তোমার মানবজন্ম!

তাজসৌধ অষ্টভুজবিশিষ্ট; চারিকোণের চারিটি ভুজ পার্শ্বস্থিত ভুজগুলি অপেক্ষা অপ্রশস্ত; কিন্তু দ্বিতল ও সুন্দর খিলান যুক্ত। উত্তর ও দক্ষিণে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে চারিটি বিশাল সমুচ্চ প্রবেশপথ; প্রবেশপথের খিলানগুলি গথিক আকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। খিলানগুলির প্রান্তভাগে বহুমূল্য নানাবিধ রঙ্গিণ প্রস্তর দ্বারা শ্বেত মর্ম্মরে অপূর্ব্ব মাল্যদাম গ্রথিত হইয়াছে। শিরোভাগ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে সুশোভিত। সৌধের শিখরদেশে প্রকাণ্ড মর্ম্মর গম্বুজ স্বর্ণোজ্জ্বল কীরিটে শোভিত হইয়া আকাশ চুম্বন করিতেছে। মর্ম্মর বেদীর চারিকোণে চারিটি মর্ম্মররচিত মিনার শোভা পাইতেছে। এই মিনার চতুষ্টয়ের উচ্চতা উদ্যানের সমতল ভূমি হইতে শিরোচূড়া অবধি ১৬২ ফিট। তাজের উচ্চতা সমতল ভূমি হইতে প্রায় ২৫০ ফিট। অতএব পাঠক পাঠিকা, বিবেচনা করিয়া দেখুন যে দিল্লীর কুতবমিনার বা কলিকাতার অক্টার্লনি মনুমেণ্ট উচ্চতায় তাজসৌধের নিম্নস্তরে স্থান পাইয়া থাকে। তাজের বিরাটত্ব লিখিয়া বুঝান এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

আমরা মিনারেটের উপর উঠিয়া যমুনার ও আগরা নগরীর দৃশ্য দেখিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামভোগ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম।

একণে তাজের ভিতরের শিল্পশোভা সন্দর্শন করিতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

মধ্যস্থিত সমাধিগৃহের ব্যাস ৬০ ফিট হইবে। তাহার চতুর্দ্দিকে আর আটটি অষ্টকোণবিশিষ্ট গৃহ বিরাজিত। সকল গৃহেরই সহিত মধ্যগৃহে যাতায়াতের সংযোগ আছে। সমাধি কক্ষের মধ্যস্থলে সাজাহান ও মমতাজমহলের সমাধিদ্বয় পাশাপাশি অবস্থিত। সমাধিঅঙ্গে অসংখ্য রঙ্গিণ প্রস্তরের পুষ্পরাজি সন্নিবেশিত। মুসলমান রীতি অনুসারে উপরোক্ত সমাধিযুগলের নিম্নদেশে ঘোর অন্ধকারময় প্রদেশে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর প্রকৃত কবর দুইটি সংস্থিত।

উপরিতলের সমাধি দুইটি পরিবেষ্টন করিয়া মর্ম্মর রচিত অপূর্ব্ব শিল্প শোভাযুক্ত যবনিকা (Marble screen) রহিয়াছে। ইহার ছিদ্র সমূহের দ্বারা সমাধিগৃহে আলোক ও বায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই পর্দ্দার রঙ্গিণ প্রস্তরের ফুলের শিল্পকার্য্য যিনি দেখিবেন তিনিই স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন; জীবনে সে শিল্পচাতুর্য্য বিস্মৃত হইবেন না। এক একটি ফুলে ৩৬ রকম রঙ্গিণ প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে ও তাহার জোড় ও কারুকার্য্য এত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর যে, লেখনী ভাষায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। এতদ্ভিন্ন সমাধিগৃহের অন্যান্য স্থানে হরিত প্রস্তর বিন্যস্ত দীর্ঘ পত্রাবলীর কারুকার্য্য বর্ণনাতীত। সাদৃশ্যে অনেকটা রজনীগন্ধার ন্যায় লম্ববান পত্র উল্টাইয়া গিয়াছে, পাতার উভয় দিকের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরের দ্বারা এরূপ চিত্রিত হইয়াছে যে, দেখিলে নির্ম্মাতার অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাজের অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকার্য্যে এতপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্মৃতিমন্দিরে দৃষ্ট হয় না। এই সকল প্রস্তর জয়পুর, নর্ম্মদা, চারথ, চীন, পঞ্জাব, বোগ্দাদ, তিব্বৎ, সিংহল, আরব্য, লোহিত সাগর, পারস্য, তুর্ক, ভারতের সেতারা, বুন্দেলখণ্ড, পান্না, গোয়ালিয়র, যশলমীর, ফতেপুর শিক্রি, ভিনায়েৎ, প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পুষ্প রচনার জন্য বহু প্রকার প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাদের নাম অদ্যাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে।

তাজের একজন মুসলমান প্রদর্শক আমাদিগকে তাজের প্রতিধ্বনি শুনাইল। সেই প্রতিধ্বনি স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিল্লোলে হিল্লোলে মন্দিরাভ্যন্তরে বিলীন হইতে লাগিল। মুসলমান তাহার কণ্ঠের স্বর ওঁ—ওঁ—ওঁ করিয়া এমনি মধুর ভাবে ছাড়িতে লাগিল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি এমনি তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল যে মুহূর্ত্তের জন্য আমি জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলাম। আমার

মনে হইল এ কোথায় আসিলাম, একি ত্রিদিবের কোন স্বরলহরী আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, না অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহানিদ্রা-সমাচ্ছন্ন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর আরও নিদ্রাকর্ষণ করিতেছেন? আমি বিস্ময়ে পরিপূরিত হইয়া সমাধি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

তাজ মসজিদ ও জওয়াব। সমাধিগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাজের একপার্শ্বে তাজ-মসজিদ ও তাহার বিপরীত দিকে তাজের অপর পার্শ্বে তাহার 'জওয়াব' অর্থাৎ অনুকৃতি পরিদর্শন করিলাম। এই দুইটি সৌধের প্রত্যেকটীর উপরে তিনটি করিয়া মর্ম্মর রচিত গম্বুজ বিরাজিত। সৌধ যুগলের আয়তন, শিল্প-সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্ব অতুলনীয়। অন্যত্র হইলে এই দুইটী সৌধ বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে পরিগণিত হইত কিন্তু তাজের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া নিজ গৌরব হারাইয়াছে।

তাজোদ্যান।—এই মনোহর উদ্যান তাজেরই উপযুক্ত। ইহাতে নানাদেশ হইতে সুদুর্ল্লভ বহুবিধ বৃক্ষ লতা আনীত হইয়া রোপিত হইয়াছে। এই উদ্যান তাজশোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। বাস্তবিক এই মর্ত্ত্যলোকে ইন্দ্রের অমরাবতী কিম্বা কুবেরের অলকাপুরী সদৃশ স্থান যদি কোথাও থাকে তাহা এই আগ্রার তাজমহলেই আছে।

এইবার তোরণশীর্ষে আরোহণ করিলাম। কি মনোহর স্বর্গদৃশ্য! স্তবকে স্তবকে হরিত তরুরাজি মৃদুল সমীর স্পর্শে আন্দোলিত হইতেছে। অপর প্রান্তে রত্নখচিত তাজমন্দির মহাশূন্যে ভাসিতেছে; যেন জীবন্ত প্রেমের ও সুখ স্বপ্নের চিরস্মৃতি চির-মিলনে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিশ্বচক্ষে প্রকটিত হইতেছে। উর্দ্ধে—সূর্য্য-কিরণ-স্নাত প্রশান্ত নীলাকাশ, নিম্নে যমুনামেখলামণ্ডিতা শ্যামাধরিত্রী এই উভয়ের সন্ধিস্থলে মর্ত্ত্য-কৌস্তুভ তাজ হইতে কি অপূর্ব্ব দীপ্তিই বিচ্ছুরিত হইতেছে। যেন পৃথিবী হইতে দুঃখস্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে—কেবল এই চির-মাধুর্য্যময় শিল্পপ্রবাহে সমস্ত জগৎ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রালোকে তাজ।—পৌর্ণমাসী রজনীর রজতধবল কৌমুদীকিরণে তাজদর্শন এক বিচিত্র ব্যাপার! শুভ্র-অঙ্গে জ্যোৎস্না মাখিয়া তাজদেহ স্ফীত হইয়া উঠে। দূর হইতে কাননান্তরালে জ্যোৎস্না-মণ্ডিত উজ্জ্বল গজমুকুতাবৎ তাজগম্বুজ সূর্য্য-কিরণ-দীপ্ত পূর্ণচন্দ্রাপেক্ষাও উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। যেন স্ফটিকোজ্জ্বল তাজদেহ রজত কিরণে প্রদীপ্ত হইয়া হীরকের ন্যায় জ্বলিতেছে! আর মর্ম্মরে বিন্যস্ত সূক্ষ্মশিল্প ও কারুকার্য্য যেন স্বর্ণালঙ্কারে খচিত রত্নরাজীর

ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তাজনিতম্ববাহিনী তরঙ্গিণী যমুনা এ স্বর্গ-সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া মৃদু মন্থরে প্রবাহিত হইতেছে। চন্দ্রালোকে তাজদর্শনের ন্যায় অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। বাস্তবিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমস্ত নরনারী সে সময় সত্য সত্যই আত্মহারা হইয়া যান। যাঁহার ভাগ্যে চন্দ্রালোকে তাজদর্শন ঘটিয়াছে তাঁহার সে স্মৃতি মৃত্যুকাল অবধি মানস পটে সমুজ্জ্বল থাকিবে।

তাজ আভরণ। পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির নিমিত্ত আমি সংক্ষেপে তাজ আভরণের উল্লেখ করিলাম।

তাজদ্বার,—তাজদ্বার এক্ষণে পিত্তল বিনির্ম্মিত। সাহাজাহানের সময় উক্ত দ্বারদ্বয় রৌপ্য নির্ম্মিত ছিল। কেবল এই দ্বার নির্ম্মাণ করিতেই প্রায় দেড়লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় বলিতে গেলে, এই "দ্বিরদরদ নির্ম্মিত হৈমদ্বার" আগ্রা বিধ্বস্ত করিয়া দুরন্ত জাঠগণ ভরতপুরে লইয়া যায়। তথায় গিয়া গলাইয়া ফেলে।

বাদশা-নামা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানের সমাধি পরিবেষ্টিত অপূর্ব্ব শিল্প শোভাময় পর্দ্দার পরিবর্ত্তে মণিমাণিক্য খচিত স্বর্ণের যবনিকা ছিল। ভারতীয় শিল্প চাতুর্য্যের নিদর্শন রূপ বহু বৎসর উহা সমাধি পরিবেষ্টন করিয়াছিল। এই স্বর্ণ যবনিকা ওজনে চল্লিশ হাজার তোলা বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্ব সমেত ইহার মূল্য ছয় লক্ষ মুদ্রা ধার্য্য হইয়াছিল।

দস্যু ও তস্করের ভয়ে ইংরাজি ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত রত্নমণ্ডিত হৈম-প্রাচীর অপসৃত করিয়া বর্ত্তমান মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রাচীর গঠিত হইল। বাদশা-নামায় লিখিত আছে যে, পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রাব্যয়ে দশ বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মহিষীর সমাধি আচ্ছাদনের জন্য সাহজাহান কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া একখানি মুক্তাময়ী আবরণ (Sheet of pearls) প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বহুকাল রাজমহিষীর সমাধি আচ্ছাদন করিয়াছিল কিন্তু ইংরাজি ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাহাও সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সমাধি মন্দিরের অভ্যন্তর বহু প্রকারের ও বিবিধ বর্ণের সেজ, বাতিদান, ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতিতে বিভূষিত ছিল। সেগুলির মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা হইবে। তিহারাণ ও রূম হইতে আনীত কারুকার্য্যময় কার্পেট গৃহতলে প্রসারিত ছিল। এই সকল গুলির একত্র শোভায় ভূতলে ত্রিদিবের পরীরাজ্য সৃষ্ট হইয়াছিল।

তাজ নির্ম্মাণের বিবরণ।—তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ স্থাপত্য-বিদ্যা-বিশারদ মুসলমান ইঞ্জিনিয়ারগণ চারি কোটী মুদ্রা ব্যয়ে শিল্পরাজ্যে এই মহাসৃষ্টি করেন। মমতাজের মৃত্যুর এক বৎসর পরে ইংরাজি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরব্ধ হইয়া ইং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ফরাসী রত্নজীবি বিশ্বপরিব্রাজক মহামতি টেভার্ণিয়ার ইহার নির্ম্মাণকার্য্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই মহাকীর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ বিশ-হাজার লোক বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তুরস্ক, আরব, পারস্য, পাঞ্জাব, দিল্লী ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে কারিগরগণ তাজ নির্ম্মাণ করিতে আগ্রায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মাসিক বেতন ১০০ শত মুদ্রা হইতে ১০০০ সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত নানাবিধ হারে ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তিন ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল।

(১) ইসা মহম্মদ; প্রধান ইঞ্জিনিয়ার।

(২) আমানত খাঁ; প্রধান চিত্রকর।

(৩) মহম্মদ হানিফ; প্রধান নির্ম্মাতা।

ইহারা প্রত্যেকেই মাসিক হাজার টাকা বেতন পাইতেন।

কেহ কেহ বলেন তাজের অনেক সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য ইতালীয় স্থপতিদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। টেবার্ণিয়ার ও বার্ণিয়ার ইহার জলন্ত সাক্ষী। তাঁহাদের গ্রন্থে কোন ইয়ুরোপীয় স্থপতির নামগন্ধও নাই। তাজ নির্ম্মাতাগণের নাম অমর অক্ষরে তাজহর্ম্মে খোদিত আছে।

অনেক ইংরাজী গ্রন্থে সহৃদয় ইংরাজ লেখকগণ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দেশীয় স্থপতিগণের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কোনও ইয়ুরোপীয় কারিগরের অস্তিত্ব তাজ নির্ম্মাণের সময় ছিল না।

ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি এই মহাকীর্ত্তি জগতে রাখিয়া গিয়াছেন! সমগ্র সসাগরা পৃথিবীর পর্য্যটকগণ এই অপূর্ব্ব মন্দির দেখিবার নিমিত্ত আগ্রায় আগমন করিয়া থাকেন। যিনি দেখিয়াছেন তিনিই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন! কেহই নিরাশায় ব্যথিত হইয়া প্রত্যাগত হয়েন নাই। ধন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট! এই কীর্ত্তি রক্ষাকল্পে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। গুণীই গুণের সমাদর করেন। আমি বিপুল-পুলকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাজ দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

মৃত্যু-বিভীষিকা।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

আমি বলিলাম, "তুমি সমস্ত ঘটনাই বেশ ব্যাখ্যা করিয়াছ, কিন্তু একটা কথা—সদানন্দ এখানে আসিলে তাহার সে কুকুরটাকে দেখিত কে ?"

গোবিন্দরাম বলিতে লাগিলেন, "আমি এ বিষয়ও বেশ বিবেচনা করিয়াছি, কারণ এটা জানাও নিতান্ত আবশ্যক ছিল, সন্দেহ নাই। ইহা নিশ্চিত যে সদানন্দের একজন কোন না কোন সঙ্গী ও সাহায্যকারী আছে, তবে এটাও নিশ্চয় যে, সদানন্দ কোনমতেই এই লোককে তাহার সমস্ত মতলব জানিতে দেয় নাই ; তাহার ন্যায় চালাক লোক সকল কথা কাহাকে জানিতে দিয়া কখনই তাহার হাতে গিয়া পড়িবে না।

"সদানন্দের একজন পুরাতন চাকর ছিল। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, এই লোকটা বহুকাল হইতে সদানন্দের সঙ্গে আছে, বাঁকুড়াতেও সঙ্গে ছিল, খুব সম্ভব সদানন্দ যখন পশ্চিমে থাকিত, তখনও এই চাকর তাহার সঙ্গে ছিল, সদানন্দের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেও নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস,সে সদানন্দের গুপ্ত-আড্ডায় যাইবার পথ জানিত ; যখন সদানন্দ বাড়ীতে না আসিত, তখন সে মাঠে গিয়া কুকুরটাকে খাবার দিয়া আসিত। তবে সদানন্দ কুকুরটাকে কি উদ্দেশ্যে এভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা সে সম্ভবতঃ জানিত না।

"তাহার পর আমি মণিভূষণের সঙ্গে তোমায় পাঠাইলাম ; তোমরা দুইজনে নন্দনপুরের গড়ে উপস্থিত হইলে। তখন আমি কি করিলাম,তাহা বলা আবশ্যক। বোধ হয়, তোমার মনে পড়ে যে, মণিভূষণ যে পত্রখানা পাইয়াছিলেন, তাহা আমি বিশেষরূপে শুঁকিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাতে এক রকম তেলের গন্ধ পাই, স্ত্রীলোকের মাথার তেলের গন্ধ ; সুতরাং বুঝিলাম, পত্রখানা কোন স্ত্রীলোক লিখিয়াছে, কিন্তু এই স্ত্রীলোক কে ? আমি নলিনাক্ষবাবুর কাছে সদানন্দ ও তাহার ভগিনীর কথা শুনিয়াছিলাম, সুতরাং এই সময় হইতেই আমার মন তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল ; তোমরা রওনা হইবার পূর্ব্বেই আমি কুকুরটার বিষয় স্থির-নিশ্চিত হইয়াছিলাম, আর কে যে চক্রান্ত করিতেছে, তাহাও বেশ সন্দেহ করিয়াছিলাম।

"তখন হইতে আমি এই সদানন্দের উপর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি যদি তোমাদের সঙ্গে যাইতাম, তাহা হইলে সে সাবধান হইয়া যাইত; সেজন্য আমি সকলের চোখেই ধুলা দিলাম—এমন কি তোমায়ও কিছু বলিলাম না, আমি গোপনে নন্দনপুরে উপস্থিত হইয়া মাঠের গহ্বরে আড্ডা লইলাম। তুমি মনে করিয়াছিলে যে, ইহাতে আমার বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে, ছোকরা সঙ্গে ছিল, তাহাকেই দিয়াই আহারাদি সংগ্রহ করিতাম; তবে কষ্ট যে একেবারে হয় নাই, এমন নহে; কিন্তু কষ্টের কথা ভাবিলে কোন অনুসন্ধানই সম্ভব নহে—তাহা হইলে কোন দুর্ব্বৃত্তকেই ধরা যায় না।

"আমি এইরূপে গোপনে সদানন্দের উপর নজর রাখিলাম, ছোকরা তোমার উপরে, মণিভূষণের উপরে নজর রাখিয়া আমাকে সর্ব্বদাই সমস্ত খবর আনিয়া দিত। এইজন্য তোমরা গড়ে বা গড়ের বাহিরে যেখানে যাহা করিতেছিলে, তাহা সমস্তই আমি জানিতে পারিতেছিলাম।

"তোমাকে তো বলিয়াছি যে, তোমার চিঠী কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আমার কাছে যাইত, ছোকরা ডাক ঘর হইতে পত্র লইয়া আমাকে দিত, আমি তাহাতে সমস্তই জানিতে পারিতাম, আমারও কাজের খুব সুবিধা হইত। তোমার পত্রে সদানন্দের বিষয় জানিতে পারিয়াই আমি তাহার পূর্ব্ব-ইতিহাস সংগ্রহের জন্য পত্র লিখি। সেই সকল পত্রের উত্তরেই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সে নিজে কোন্ মহাজন—আর মুঞ্জরী তাহার ভাগিনী নহে—স্ত্রী; যখন আমি এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলাম, তখন বলা বাহুল্য যে, আমার সন্দেহ তখন বিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল।

"তাহার পর একটা গোলযোগ ঘটিল। হারু ডাকাত মাঠে আসিল, তাহার পর তাহার সহিত অনুপের সম্বন্ধ প্রভৃতিতে এই ব্যাপার আরও জটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তবে যাহা হউক, তোমরা নিজেরাই হারু ডাকাত ও অনুপ সম্বন্ধে রহস্য ভেদ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলে, কিন্তু সে সময়ে আমিও এ বিষয় এইরূপই জানিতে পারিয়াছিলাম, যদি মণিভূষণ ও সদানন্দের ব্যাপারে নিযুক্ত না থাকিতাম, আর হারুকে ধরিবার চেষ্টা পাইতাম, তাহা হইলে তাহাকে অনায়াসে ধরিতে পারিতাম। তোমরা একটু সতর্ক হইলে সে রাত্রে তোমরাও তাহাকে ধরিতে পারিতে।

"যখন তুমি আমায় মাঠে ধরিলে, তখন ব্যাপারটা যে কি তাহা আমি সম্পূর্ণই

জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু আদালতে লইয়া যাইবার মত প্রমাণ তখনও আমি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে রাত্রে হারু ডাকাতকে ভুল করিয়া মণিভূষণ ভাবিয়া সদানন্দ কুকুরটা ছাড়িয়া দিয়াছিল, আর যাহাতে হতভাগা হারুর মৃত্যু ঘটিল, সে রাত্রের ঘটনাতেও সদানন্দের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ হইল না, আমরা কেবল কুকুরটার ডাক শুনিয়াছিলাম, কুকুরটাকে দেখিতে পাই নাই, বিশেষতঃ কুকুরটা যে সদানন্দের, তাহারই বা প্রমাণ কি? এই দুর্ব্বৃত্ত এমনই বুদ্ধি বাহির করিয়াছিল যে, তাহার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র কিছু প্রমাণ করিবার উপায় রাখে নাই। সত্যই বলিতেছি, আমি এরূপ পাষণ্ড-বাহাদুরী আর কখনও দেখি নাই।

"সবই জানিতে পারিয়াছি, জানিয়াছি কুকুরের ভয় দেখাইয়া সদানন্দ রাজা অহিভূষণকে খুন করিয়াছিল, জানিয়াছি যে সেই উপায়ে মণিভূষণকেও খুন করিতে চাহে,—সবই জানিয়াছি, অথচ এই সকল প্রমাণ করি কিরূপে? তাহাকে হাতে নাতে না ধরিতে পারিলে তাহার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

"অন্য উপায় আর কিছুই নাই দেখিয়া আমি শেষ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম, এ কাজ করিতে গেলে কতকটা মণিভূষণকে বিপদে ফেলিতে হয়; কিন্তু অন্য আর কোন উপায় নাই। তাহাই ছল করিয়া তোমাকে সঙ্গে লইয়া আসি, মণিভূষণকে রাত্রে সদানন্দের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতে অনুরোধ করি, যাহাতে তাহার বিশ্বাস হয় যে, আমরা যথার্থই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছি, সেইজন্য ছোকরাকে দিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাই। অক্ষয় বাবুকেও ডাকিয়া পাঠাই।

"আমি জানিতাম, আমরা মণিভূষণের নিকটেই থাকিব। সুতরাং সদানন্দ, তাহার কিছুই করিতে পারিবে না, কিন্তু এরূপ ভয়াবহ কুকুর যে বাহির হইবে, তাহা একবারও মনে হয় নাই। যাহা হউক নলিনাক্ষ বাবু বলিয়াছেন যে, মণিভূষণ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন।

"তবে মুঞ্জরীর উপর তাহার যে ঝোঁক হইয়াছিল, সেজন্য এখন যদি কিছু মানসিক কষ্ট হইয়া থাকে, তবে সেজন্য আমি দায়ী নহি।

"এখন মুঞ্জরী এই ব্যাপারে কতটা লিপ্ত ছিল, কেবল তাহাই বলিলে সব শেষ হয়। বলা বাহুল্য নানা উৎপীড়ন করিয়া সদানন্দ তাহার স্ত্রীকে দিয়া নানা কাজ করাইত, তাহার ভয়েই সে এমন কি তাহার ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিতেও স্বীকার করিয়াছিল। তবে সে সদানন্দের মত ছিল না, তাহার মন

তাল ছিল, সে বাধ্য হইয়া সদানন্দের সাহায্য করিত বটে, কিন্তু সুবিধা পাইলেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ছাড়িত না। সে মণিভূষণকে কলিকাতায় পত্র লিখিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল, প্রথম দিন তোমাকে মণিভূষণ ভাবিয়া নিজের বাড়ীর কাছে একবার সাবধান করিয়াছিল।

"সদানন্দ ইচ্ছা করিয়া মুঞ্জরীর সহিত মণিভূষণের পরিচয় করিয়া দিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, তাহার জন্য মধ্যে মধ্যে মণিভূষণ তাহার বাড়ী আসিবেন, তখন একদিন সুবিধামত তাহার মৃত্যু ঘটাইবে। মুঞ্জরী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিল, তাহাই সে প্রাণপণে মণিভূষণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, এমন কি তাহাকে প্রতিবন্ধক দিবার চেষ্টা পাইল, তাহাই সদানন্দ তাহাকে সে রাত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া মণিভূষণকে হত্যা করিবার আয়োজন করিয়াছিল।

"মণিভূষণের মৃত্যু হইলে, তখন সদানন্দ নিজ পরিচয় দিয়া জমিদারী দখল করিত, তাহাকে খুনী বলিয়া কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না। এ অবস্থায় সে তখন মুঞ্জরী সম্বন্ধে কি করিত বলা যায় না, যাহাকে ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহাকে আবার স্ত্রী বলিয়া কিরূপে পরিচয় দিত বলা যায় না। খুব সম্ভব, সে মুঞ্জরীকেও কোন গতিকে হত্যা করিত।

"যাহাই হউক, আমরা মণিভূষণের প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি। আর একটা দুর্দ্দান্ত ভয়ানক দুরাত্মাকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়াছি। ডাক্তার, এ ব্যাপার সম্বন্ধে যতদূর আমার মনে ছিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই তোমায় বলিলাম, আমি বলিতে পারি না যে, এখনও কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা হয় নাই—এমন কিছু আছে কি না. যদি থাকে, আমায় জিজ্ঞাসা কর।"

আমি বলিলাম, "অহিভূষণ বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি ভূতের ভয় করিতেন, সদানন্দ তাহাই কুকুর ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু মণিভূষণ যুবক, সাহসী তাঁহার ভূতের ভয়ে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ছিল না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "মৃত্যু না হইলেও—কি হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াছ, কুকুরটাকে সদানন্দ অনাহারে রাখিয়াছিল, আমরা তাহাকে গুলি না করিলে সে নিশ্চয়ই অজ্ঞান মণিভূষণের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিত। এরূপ হইলেও সদানন্দকে কেহ সন্দেহ করিত না।"

আমি বলিলাম, "এ কথা ঠিক, কিন্তু সে অন্য নাম লইয়া সেখানে বাস করিতেছিল, সে কিরূপে হঠাৎ জমিদারীর দাবী করিত, ইহাতে সকলেই সন্দেহ

করিত, হয় তো তাহার পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্ব-বৃত্তান্তও সব বাহির হইয়া পড়িত, তাহার ন্যায় চালাকচন্দ্র লোক কি এটা ভাবে নাই?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার, এ সম্বন্ধে সে যে কি ভাবিয়াছিল, ভবিষ্যতে সে যে কি করিত, তাহা বলা বড়ই কঠিন। গত বিষয় ও উপস্থিত বিষয় অনুসন্ধান করাই আমার কাজ, ভবিষ্যতে সে কি করিত বা করিবে, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে ইহা বলা সহজ নহে। তবে এ সম্বন্ধেও আমি যে অনুসন্ধান করি নাই, তাহা নহে—আমি এ বিষয় মুঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে তাহার স্বামীকে অনেক সময়ে এ বিষয় আলোচনা করিতে শুনিয়াছে। সে বলে সদানন্দ তিন উপায় স্থির করিয়াছিল, প্রথম উপায়, সে পশ্চিমে চলিয়া যাইবে, তাহার পর সেইখান হইতে জমিদারীর দাবি করিবে, এ দেশে আদৌ আসিবে না। জমিদারী পাইলে বেচিয়া পশ্চিম হইতেই টাকা লইবে, এখানে একজন উকীলকে মোক্তারনামা দিবে।

"দ্বিতীয় উপায়, সে কলিকাতায় গিয়া ছদ্মবেশে থাকিবে, সেইখান হইতে জমিদারীর দাবি করিবে, তাহার পর জমিদারী পাইলে তাহা সুবিধামত বেচিবে বা একজন ভাল ম্যানেজারের উপর ভার দিয়া অন্যত্র গিয়া থাকিবে।

"তৃতীয় উপায়, সে অন্য একজন লোক খাড়া করিয়া তাহাকে প্রমাণের কাগজপত্র দিয়া তাহাকে দিয়াই জমিদারী দখল করিবে, ভিতরে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত থাকিবে, তাহাতে সদানন্দই অধিকাংশ টাকা লইবে, তাহাকে কিছু কিছু দিবে।

"যেরূপেই হউক, সে একটা কোন উপায় নিশ্চয়ই বাহির করিত, তাহার মত লোকের পক্ষে একটা উপায় বাহির করা কঠিন হইত না।

"এখন ডাক্তার, আর কিছু জানিবার নাই, এখন এস যাই, দুজনে একটু বেড়াইয়া আসি।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সমাপ্ত।

গান।

(আমি) সুখের ভরা বহিয়া এনে দুখের ঘরে রাখি
দুঃখ আছে বসিয়া কাছে, সুখেরে তবু ডাকি।
শৈলে, বনে, গগন-পটে,
সাগর-তলে তটিনী-তটে,
সুষমা হেরি কুসুমে যবে ফুটিয়া হাসে শাখী।—
(আমি) শ্বাসের ঝড়ে—ভগ্ন ঘরে,
সে শোভা নিয়ে থাকি।
সুস্বনেতে সমীর ধায়,
মৃদুল কলে ঝরণা গায়,
সুধার ঝরা বহিয়া যায় গাহিলে বনে পাখী ;
(আমি) তীব্র দুখে—তপ্ত বুকে
সে সুধা এনে মাখি।
মধুর স্মৃতি, প্রীতির রাগে
চিত্র করা মেঘেতে জাগে,—
ফুটিয়া ওঠে মানস-পটে মোহন ছবি জাগি ;
(আমি) রোদনে-ভিজে—আঁখির নীচে
সে ছবি ধরে রাখি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

পুরী-তীর্থে।

(৪)

আমার বন্ধুদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই পুরী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমাদের শিক্ষা বিভাগে একমাস ছুটি সুতরাং আমি পিতার নিকট সাত দিনের মধ্যে বাটী ফিরিতে প্রতিশ্রুত থাকিলেও আরও কিছুদিন সমুদ্র স্নান করিবার

ইচ্ছায় পুরীতে বাস করিতে মনস্থ করিলাম। আমার সহিত আরও দুই জন বন্ধু রহিতে স্বীকৃত হইলেন।

সমুদ্র স্নান করিবার জন্য পুরীতে রহিলাম একথা বন্ধুবান্ধব পিতামাতা জানিলেন বটে, কিন্তু আমি যে ঠিক্ সমুদ্র স্নানের জন্য পুরীতে রহিলাম একথা আমি নিজে ষোল আনা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না অর্থাৎ আমার হৃদয়ের অন্তস্তলের একটা বিদ্রোহী স্বর মাঝে মাঝে আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিল —"শ্রীক্ষেত্র বাসের প্রধান কারণটা পিতাকে না জানাইয়া ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছ। আর পিতাকেই বা সে কথা লিখিবে কেমন করিয়া? যে বাসনায় পুরীতে পূজাবসরের অবশিষ্টাংশ কাটাইতে বাসনা করিয়াছ যে বাসনাটার অঙ্গে পাপ নিহিত আছে। তুমি শীঘ্র গৃহে যাও"।

এই কর্কশ বিদ্রোহী চিন্তাটাকে ডুবাইবার জন্য আমি আমার উদ্যমশীল যৌবনের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া সেটার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতাম। আমার পুরীতে বাস করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে সাগর স্নান ব্যতীত অপর কিছু নহে তাহা নিজের কাছে সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যহ প্রাতে সমুদ্র বেলায় যাইতাম এবং বেলা দশটার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিতাম না। শুধু তাহাই নহে, এই সাত দিন একটি বারও রমেন্দ্র বাবুর বাসার দিকে যাই নাই। দুই দিন সমুদ্র কূলে দূর হইতে তাঁহাকে সপরিবারে আসিতে দেখিয়াও অপর দিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। এত সতর্কতা এত সংযত কার্য্যও কি নির্দ্দোষিতার প্রমাণ নহে?

তবে এক একবার আবার সেই বিদ্রোহী ভাব জেরা করিত-'আচ্ছা তবে, পথে ভ্রমণ করিবার সময় কেন সর্ব্বদাই কাহার প্রতীক্ষা কর, সর্ব্বদা কেন সেই হতভাগ্য বিধবার কষ্টময় ভবিষ্যত জীবন ভাবিয়া মর্ম্মযাতনা অনুভব কর?" আমি বুদ্ধিমান অথচ সত্যবাদীর মত উত্তরে বলিতাম—নিজের হৃদয়কে যদি বাস্তবিকই অপরের দুঃখে পীড়িত করিয়া রাখি, সমাজে যাহার প্রতি ভালবাসা দেখাইলে সমাজ আমাকে দুষিবে, সমাজকে না জানিতে দিয়া সকলের দৃষ্টি বা অনুভব শক্তির অন্তরালে থাকিয়া যদি হৃদয়ের স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ভালই বাসি তাহা হইলেই বা দোষ করিলাম কোথা? অবশ্য আমি কাহাকেও ভালবাসি না। যদি বাসি, যদি আমার কঠোর হৃদয়ের সেই দীন বৃত্তিটা বাস্তবিক প্রেমরূপ মহান্ স্বর্গীয় ভাব হয় তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? আমি নিজের কার্য্যের দ্বারা কাহারও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধা দিতেছি কি? আমি অপরের শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছি কি?

কিন্তু হৃদয়াভ্যন্তরীণ এইরূপ বাদানুবাদে প্রাণে বড় একটা সুখ পাইতাম না। আমার সঙ্গী অক্ষয় দত্ত পূর্ব্বেকার মত হাসি তামাসা করিত। পুরীর বাবুবৃন্দ প্রায় সকলেই তাহাকে চিনিয়াছিল। সুতরাং প্রভাতে আমাদিগকে সমুদ্রতীরে দেখিয়া জনকতক ভদ্রলোক ধরিয়া বসিলেন, তাহাদিগকে সেই 'ইন্দ্রতীর্থে' কাহিনীটা শুনাইতে হইবে।

স্মিতমুখে অক্ষয়কুমার সেই বালুকা বেলায় বসিল। তাহাকে ঘিরিয়া আমরা চক্রাকারে দাঁড়াইলাম, সমুদ্র কলাৎ গুড়ুম চড়াৎ প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে আমাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু আমরা যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম বিন্দুমাত্র লবণাম্বু সেস্থলে পঁহুছিতে পারিল না।

অক্ষয় সেই বালুকার উপর পাঁচ অঙ্গুলিযুক্ত হস্ত তালুর দাগ করিয়া তাহার চারিদিকে দিয়াশলায়ের কাটি জ্বালিয়া দিল। তাহার আগ্রহ দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

অক্ষয় আরম্ভ করিল "বাবু মান গো, অবধড়। পুরীর প্রধান তীর্থ ইন্দ্র-তীর্থ অছে।"

অবশ্য উড়িয়া ভাষাটা অক্ষয়ের। সকল বাঙ্গালা শব্দ অকারান্ত হইলে যে উড়িয়া শব্দে পরিণত হয়, এ ব্যাকরণের নিয়ম আমরা আবিষ্কার করিয়া দিন রাত উৎকল ভাষার স্রোত বহাইতাম।

একজন রসিক দর্শক বলিলেন—পণ্ডা ঠাকুর সে কঁড় অছে ?

অক্ষয় বলিল—সে ইন্দ্রতীর্থ আছে। সে স্বরগ পাকে, ইন্দ্রদেব অছন্তি না ? সে ইন্দ্রদেব বাবু মান। সে বজর বাণ নইকিরি যুদ্ধ করিবরে আইথিলা।

একজন বলিলেন—মা নটা বহুবচন জ্ঞাপক বুঝলেন। আর বজর বাণটা ইন্দ্রের বজ্র বুঝিলেন।

যাঁহাকে বুঝান হইল তিনি বলিলেন—হ্যাঁ বুঝিলাম।

অক্ষয় তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল—বুঝি গলা ? সে খণ্ডে বঙ্গাড়ি বড় বুদ্ধিমান।"

যেরূপ ব্যঙ্গভাবে হাত নাড়িয়া অক্ষয় তাহাকে ঐ কথা বলিল তাহাতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

অক্ষয় বলিল—সে ইন্দ্রদেব সমুদ্রক সাথ প্রভু জগন্নাথঙ্ক আদেশে নড়িতে আসিল। সে স্বরগ পাকে প্রভু ভবাখণ্ড পঠায় দরিথলা।"

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিল—"কি হ'ল, কি হ'ল ?"

একজন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, ইন্দ্র স্বর্গে পত্র পাঠাইলেন সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য।"

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অক্ষয় বলিল—"হুঁ। সে ইন্দ্র বজর বাণ নয়িকিড়ি নড়িতে অসিল।"

আমি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম রমেন্দ্রবাবু ভিড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

অক্ষয় বলিল—"বজর বাণ দেখিকিড়ি ডর মালুম করি সমুদ্রদেব পুখুর মাঝে ঘসি গলা।"

একজন বলিল, পুকুর মানে সমুদ্র। সমুদ্রদেব সমুদ্রের মধ্যে পালিয়ে গেল।

অক্ষয় বলিল—"হুঁ। ঘসি গলা। আর ইন্দ্রদেব গোসা করি "হুঁ-উ-উ" করি———

সকলে হাসিয়া উঠিল। অক্ষয় বলিল—"হুঁ করি (সেই হুঙ্কার ও হাসি) বালুর উপর চপেটাঘাত করিল। এই দেখ বাবুমান তার দাগ রহি গলা। এই তীর্থে গুট্টা গুট্টা পয়সা দিঅ।

সকলে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। রমেন্দ্রবাবু আমার দিকে আসিয়া বলিলেন—আর তুমি আমাদের বাসায় যাওনা কেন ?

আমি ইতস্ততঃ করিলাম। দেখিলাম দূরে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে নলিনী ও তাহার মাতা আমাদিগের প্রতি তাকাইয়া আছে।

আমি অক্ষয়কে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইলাম।

(৫)

"আবার দেখা হ'বে, তবে আজ উঠি।"

নলিনী বলিল—তোমার যাহা ইচ্ছা।

আমরা উভয়ে যে কক্ষে কথোপকথন করিতেছিলাম রমেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাহার পার্শ্বের গৃহে বসিয়াছিলেন।

নলিনীর কথাটা আমার প্রাণে বাজিল। কথাটায় একটু অভিমানের সুর ছিল। সুতরাং বাসায় ফিরিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেও একটু ইতস্ততঃ করিলাম। অমনি পার্শ্বের গৃহের কথোপকথন কর্ণে প্রবেশ করিল। রমেন্দ্রবাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছেন—যা হ'ক মেয়েটা পুরীতে এসে তবু মাঝে

মাঝে হেসে খেলে বেড়ায়। রমণীও মাঝে মাঝে আসে আর ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে অন্যমনস্ক হয়।"নলিনীও কথাটা শুনিল। আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম। নলিনী ধীরে ধীরে বলিল—বাস্তবিক।

নলিনীর মাতা একটু মৃদুস্বরে বলিল—কিন্তু একটী স্ত্রীলোক সঙ্গিনী হ'লে ভাল হ'ত। দু'জনেরই বয়স কম, নিন্দা হ'তে পারে।

লজ্জায় আমার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। নলিনী স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। আমি যেন কথাটা শুনি নাই এইরূপ ভান করিয়া নলিনীকে বলিলাম—তবে এখন উঠি।

নলিনী একটু হাসিয়া বলিল—না তা হবে না। নিন্দার ভয়ে নাকি?

আমি যুবতীর মুখের দিকে তাকাইলাম, তাহার মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। নলিনীর মুখে একটা দৃঢ়তার চিহ্ন দৃষ্ট হইল। যেন একটা অনর্থকরী ভাব তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে ক্রীড়া করিতেছিল।

নলিনী আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া বলিল—না, এখন যেওনা। মা এখনি মন্দিরে কীর্ত্তন শুন্‌তে যাবেন। আমরাও যাব।

এই কথা বলিয়া নলিনী বাহিরে গেল। বুঝিলাম পার্শ্বের গৃহে গিয়া মাতাকে মন্দিরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

মাতা বলিলেন—একটু পরে যাব। একটু বোসো না।

নলিনী বলিল—তবে তোমরা পরে এসো। আমরা যাই।

আমার বড় লজ্জা করিতেছিল। ছিঃ ছিঃ নলিনী হঠাৎ আজ এত নির্লজ্জা হইল কেন?

তাহার মাতা বলিলেন—একলা যাবে? একটু বোসো না।

নলিনী বলিল—একেলা কেন? রমণী সঙ্গে যাবে।

দুই চারি মুহূর্ত্তের জন্য সকলে নিস্তব্ধ হইল। বুঝিলাম কন্যার শেষ উত্তরটায় মাতা ঠিক কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারিত করিতে পারিলেন না। পিতা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—আচ্ছা যাও। আমরা এখনি আস্‌ছি। কীর্ত্তন শুনা ভাল।

তাহাদের বাসার সম্মুখেই মন্দির। তবু তাহাকে এইটুকু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াটা যেন একটা মস্ত গুরুভার বলিয়া বোধ হইল। আর তাহার পিতা মাতাই বা কি মনে করিলেন তাহা ভাবিয়াও একটু চিন্তিত হইলাম।

তখনি নলিনী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—চল। চল কীর্ত্তন শুনা ভাল।

আমি বলিলাম—না, আমি যাইব না।

নলিনী বলিল—আমি একেলা যাইব।

স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তিনী হওয়া তাহার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। আমিও তাহার সহিত চলিলাম।

(৬)

ভোগ-মন্দিরে উঠিবার উত্তর দিকের সিড়ির নিকটে বসিয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট গৌরাঙ্গ এক বাঙ্গালী গোস্বামী যুবক বসিয়া নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া শ্রীরাধিকার বিরহ বর্ণনা করিতেছিলেন। প্রভুর সংকীর্ত্তন শুনিবার জন্য তাহাকে ঘিরিয়া কতকগুলি স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। যদিও তাহার অঙ্গ ভঙ্গী নয়নের ঢুলু ঢুলু ভাব আর নলিনীর দিকে ঘন ঘন চাহনি আমার ভাল লাগিতেছিল না তবু নলিনীর পার্শ্ব হইতে চলিয়া যাইতে পারিতেছিলাম না। গায়কের কণ্ঠস্বর মন্দ নয়। সে গাহিল————

ভুবন জিনিয়া যতন করিয়া
আনিনু প্রেমের বীজ
রোপণ করিতে পাপ সে হইল
সাধিল মরণ নিজ।
সই, প্রেম তনু কেন হৈল,
হায় অভাগিনী, দিবস রজনী—
সিচিতে জনম গেল।

পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিনু সখির মুখে
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইনু আপন সুখে।

গরল খাওয়ার মুখ ভঙ্গী দেখিয়া রাগ হইল। খোলটা খুব জোরে বাজিয়া উঠিল। আমি একটু দুরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

লোকটা আবার গাহিল—

সই, পিরীতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা।

কথাগুলা আমার প্রাণে লাগিল। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটু দুরে সরিয়া গিয়া মন্দিরের গাত্র সংলগ্ন কারুকার্য্য দেখিতে লাগিলাম। যখন কীর্ত্তন স্থানে ফিরিলাম তখন গায়ক গাহিতেছে—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

নলিনী উঠিয়া আমার নিকট আসিল, তাহার মুখে বিরক্তির ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"উঠিয়া আসিলে ?"

নলিনী একটু হাসিয়া বলিল—ভাবিলাম তোমার মত রক্ষকের সহিত আসিয়াছি, স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য লোকটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে।

আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কাহাকে ?

নলিনী বলিল—ঐ বে-আদব গোঁসাইটাকে। বড়ই অসভ্যের মত আমার দিকে দেখিতেছিল।

সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের বুজরুকদিগের মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমরা মন্দিরের পশ্চাতের অর্থাৎ পশ্চিমের উঠানের নিকট আসিয়া মন্দিরের পাথরের উপর বসিলাম।

নানা কথার পর নলিনী বলিল—তুমি জগন্নাথের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস কর ?

আমাকে স্বীকার করিতে হইল যে আমি স্থান-মাহাত্ম্য বিশ্বাস করি।

নলিনী একটু স্থির হইয়া রহিয়া বলিল—আমরা মন্দিরের পরিখার মধ্যে বসিয়া আছি এস্থলে মিথ্যা কথা কহা মহাপাতক তাহা স্বীকার কর ?

কথাগুলা খেলার ছলে জিজ্ঞাসা করা হইল না। সুতরাং আমি এরূপ কৌতুকজনক প্রশ্নের তাৎপর্য্য কি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তাহাকে বলিলাম—স্বীকার করি।

নলিনী পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিল—জিজ্ঞাসা করিতেছি, এতদিন বিবাহ কর নাই কেন ?

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। নানা কথা মনোমধ্যে উদিত হইল। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নলিনী বলিল—আমরা মন্দিরের ভিতর, মনে আছে ?

তাহার এবারকার স্বর ততটা গম্ভীর নহে। একটু উৎসাহ পাইয়া বলিলাম—ছিঃ! ওকথা যেতে দাও।

চতুর উকীল জেরার সময় সাক্ষীকে কোণঠাসা করিয়া ধরিতে পারিলে যেরূপ বিব্রত করে, যুবতী আমাকে সেইরূপ বিজয় গর্ব্বিত ভাবে বলিল—না তা হবে না। কথার উত্তর চাই।

আমি বলিলাম—সত্য কথা বলি শুন। যে রমণী রত্ন লাভ করিলে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে, হৃদয় উন্নত হইবে, সে স্ত্রীলোক পাই নাই বলিয়া বিবাহ করি নাই। এজনমে তাহাকে পাইতে পারিব না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া নলিনী বলিল—পাবে না কেন ? চেষ্টা কর। জীবনটাকে চিরকাল মরুভূমি করিয়া কি করিবে!

আমি বলিলাম—চেষ্টার কর্ম্ম নয়। দেশাচার আমার বিরোধী। সে স্ত্রীলোক বিবাহিতা—বিধবা।

নলিনীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে জ্যোতিঃতে যুবতী অনিন্দ্যসুন্দরী বলিয়া প্রতিভাত হইল। দৃঢ়স্বরে নলিনী বলিল—দেশাচার, বিধবা ? হ'লেই বা বিধবা। যদি তাহাকে ভালবাস তবে তাহাকে পাইতে চেষ্টা করিবে না কেন ? যদি তাহাকে ভালবাস তাহা হইলে দেশাচারে তাহাকে নিষ্পেষিত করিবে তুমি দেখিবে কেমন করিয়া ? তুমি তাহাকে ষোল আনা ভালবাসিতে শেখ নাই।

যুবতীর কথায় হাসি আসিল। আমার প্রণয়িনীর প্রতি আমার প্রেমটা কতদূর গভীর তাহা তাহাকে বলিলাম। শেষে বলিলাম—আমি আপনার সুখের জন্য সমাজ নষ্ট করিতে চাহি না। হিন্দুর ঘরে এক বিধবা ভিন্ন পূর্ব্ব গৌরব আছে কি ? শৌর্য্যবীর্য্য জ্ঞানধর্ম্ম হিন্দু সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার আছে কেবল এই বিধবার পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য। আমি নিজের সুখের জন্য বিধবার পবিত্রতা, সমাজের ভূষণ—

আমার কথায় বাধা দিয়া নলিনী বলিল—সমাজের ভূষণ ! বিধবার অঙ্গের ভূষণ কাড়িয়া লইয়া, মালিন্য মণ্ডিত করিয়া, দয়া মায়া স্নেহ সকল ভুলিয়া কঠোরতার নিগড় তাহার পায়ে বাঁধিয়া সমাজ বিধবাকে নিজের ভূষণ করিয়াছে ইহা সমাজের বড়ই অনুগ্রহ। সমাজ তো পুরুষ শাসিত ; সমাজকে সুশোভিত করিতে বিধবা কষ্ট সহিবে ! সমাজ বিধবার জন্য কি করিতেছে ? তাহাদের আমোদ উৎসব সমস্ত বাধা দিয়া ———"

আমি বলিলাম—ছিঃ ছিঃ নলিনী এ সকলের তাৎপর্য্য আছে। ব্রহ্মচর্য্যের জন্য এ সকল আবশ্যক।

নলিনী হাসিয়া বলিল—ব্রহ্মচর্য্য কিসের জন্য আবশ্যক শুনি ? এই দেখ আমার বিবাহের ছয় মাস পরে স্বামী মরিয়াছে। তাহাকে দুইবার মাত্র দেখিয়াছি। আমি মানবী, সেই দুইবার দেখিয়া প্রাণ মন দিয়া নিরাকার স্বামীকে ভাল বাসিতে শিখি নাই। আমাকেও কেহ প্রাণ মন দিয়া ভাল বাসিল না, এ জীবনে উদ্দেশ্য হীনভাবে বাঁচিয়া সমাজের ভূষণ হইয়া লাভ কি ?

আমি পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের মুখে এরূপ কথা শুনি নাই। সেই কোমল নবনীত গঠিত দেহলতার অন্তরে যে এরূপ সমাজদ্রোহী ভাব লুক্কায়িত থাকিতে পারে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার সংযম ভাসিয়া গেল। আমি নিমেষ মধ্যে আমার কর্ত্তব্যপথ ভাবিয়া লইলাম। বাস্তবিকই তো এ সংযম এ ব্রহ্মচর্য্য কিসের জন্য ? যাহাকে ভালবাসি বলিয়া গর্ব্বিত হইলাম তাহাকে যদি প্রকাশ্যে ভাল-বাসিয়া সুখী করিতে না পারিলাম তাহা হইলে আর ভালবাসিলাম কি করিয়া। যাহাকে ভালবাসি তাহার শুষ্ক রুক্ষ হৃদয়ে প্রেমবারি সিঞ্চন করিতে মনস্থ করিলাম।

আমিও তাহার মত দৃঢ়স্বরে বলিলাম—নলিনি ! যদি কেহ তোমাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ভালবাসে, যদি তোমাকে পাইলে কাহারও শুষ্ক হৃদয় পবিত্র হইয়া যায় তাহা হইলে—"

আমি আর বলিতে পারিলাম না। নলিনীও স্থির হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যুবতী বলিল—সে রকম কেহ নাই, থাকিলে—

আমি উন্মত্ততার সহিত বলিলাম—বুঝিতে পার নাই, নলিনি? মন্দিরের ভিতর ছলনা করিও না। আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি আমায় গ্রহণ করিবে নলিনী?

আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার হাত ধরিতে গেলাম। নলিনী সরিয়া গেল।

"নলিনী তোমরা এখানে!"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম তাহার জননী। তাহার জননী আমার দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিলেন তাহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম না।

* * *

আমাদের বিবাহের পর হিন্দুসমাজ আমাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে। অর্থাৎ আমরা তাহাদের অবাধ্য হইয়া পলাইয়া গিয়া রেজিষ্ট্রি করিয়া বিবাহ করিয়াছি এ অপরাধ আমার ও নলিনীর পিতামাতা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের সুখে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আমাদিগের নিকট সুখ প্রকাশ করেন এবং আড়ালে নিন্দা করেন। মাতাপিতা বাড়ীতে নূতন কিছু আহার্য্য প্রস্তুত হইলে আমাদের পাঠাইয়া না দিয়া শান্তি পান না। অথচ প্রকাশ্য ভাবে 'সমাজের' কাজে কর্ম্মে আমাদিগকে বাটিতে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিতেন না। বন্ধুরা নলিনীর হস্ত নির্ম্মিত মিষ্টান্ন ব্যঞ্জনাদি অমৃতবোধে আহার করিয়া যাইতেন কিন্তু 'সমাজে' আমাদের সহিত ভোজন করিতেন না। সকলেই এইরূপে সমাজের বিবেককে সম্মানিত করিতেন। দেহমুক্ত আত্মা যেমন কুতূহলে পরিত্যক্ত মাংস পিণ্ডময় দেহটাকে দেখিয়া রহস্য বোধ করে, আমরাও তেমনি সমাজের ভণ্ডামি দেখিয়া রহস্যবোধ করিতাম। অক্ষয় দত্ত পরিহাস করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিত,—ইন্দ্রদেবকে দেখিয়া সাগরদেব যেমন সমুদ্রমধ্যে ঘসি গলা, তেমনি সমাজকে দেখিলে আমাদের Moral Courage বা সৎসাহস বিস্মৃতি রূপ সাগরমাঝে ঘসি যায়।

শ্রীমান্ ছেঁচড়া।

(পৌরাণিক ও আধুনিক)

ছেঁচড়া দুই প্রকার। খাদ্যে ও মনুষ্য জাতির মধ্যে ইহার অস্তিত্ব। বড় বড় ভোজে শ্রীমান ছেঁচড়া বিরাজ করেন; লুচি, পোলাও, কালিয়া, ক্ষীর ও সন্দেশ প্রভৃতির সঙ্গে ছেঁচড়া মহাশয়ও আসরে একবার অবতীর্ণ হন। তাঁহার উচ্চাভিলাষ ও দারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহাকে কেহই স্পর্শ করিত না। এজন্য তিনি শান্তি ভবনস্থিত ভগবানের "যৎপরোনাস্তি ভজনা করিলেন, কাঁদিয়া আকুল হইলেন, আঁখিদুটী ফুলাইলেন,

গলা ভাঙ্গিলেন ; কাজেই ভগবান তাঁহার ভজনায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মেজাজ সরিফ বলিতে 'আবদুল লতিফ' বলার ন্যায় শ্রীযুৎ ভগবান ভুলক্রমে তাঁহাকে (নাছোড়বান্দা) বলিতে গিয়া শ্রীমান ছেঁচড়া বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতেই ইনি 'ছেঁচড়া' নামে পরিচিত! ইতিপূর্ব্বে যে ইহার কি নাম ছিল তাহা আমরা অবগত নহি। আর অবগত হইবার আবশ্যকও দেখি না। কারণ, যে চটকদার নামের শীলমোহর ইহার বক্ষে, তাহা কাড়িয়া লইবার শক্তি স্বয়ং ভগবানেরও নাই। যাহো'ক শ্রীযুৎ ভগবানের আশীর্ব্বাদে শ্রীমান ছেঁচড়া সেইদিন হইতেই খুব High circleএ moveকরেন। যেখানেই মহাকবিরূপী পোলাও কালিয়া সেইখানেই লেজুড় স্বরূপ ইনি আছেন। ইহাকে একা কেহ চাহেনা, ইনি সংসর্গে বড় তবে ইঁহার নিন্দুকেরা বলেন ইনি খোঁড়াইয়া বড়। কিন্তু নিন্দুকের নিন্দা-বাণীর সহিত আমাদের কোনও সহানুভূতি নাই, অতএব ওঁ শান্তি!!

এইবারে আমরা ছেঁচড়া সম্বন্ধে আর একটু 'আধুনিক গবেষণা' করিব। কারণ প্রত্যেক বঙ্গীয় সাহিত্যিকের পক্ষে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে একটু আধটু গবেষণা করিতেই হইবে ; নতুবা বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদে ইহার মূল্যই হইবে না।

এ জন্য সাহিত্যিকের পক্ষে সেই সনাতন প্রথা লঙ্ঘন না করিয়া আমিও গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম।

স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ই বলুন আর স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্রই বলুন আমরা কিন্তু তাঁহাদের গবেষণায় ভুল দেখিয়াছি। কি ভুল তাহা বলিব না তবে তাঁহারা যে নিভু'ল নহেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। উক্ত মহোদয়দিগের মত (অর্থাৎ তাঁহারা যদি এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেন তবে নিশ্চয়ই বলিতেন) যে ছেঁচড়া অতি প্রাচীন এবং ব্যাপক।

কিন্তু আমরা বলি যে, ইহা প্রাচীনত্বের দাবী করিতেই পারে না, তবে ইহার যে কতকটা ব্যাপকতা আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। আমাদের মতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতেই ছেঁচড়া প্রভুর আবির্ভাব, কারণ ছুটীখাঁর মহাভারতে ইহার কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে ইহার ভক্ত ছিলেন, ইহা (Stewart) এর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, আর চৈতন্য চরিতামৃতেও ইহার উল্লেখ আছে যথা :—

"বাল্যকালে মহাপ্রভু ছেঁচড়ার প্রিয়।"

ডাঃ মিত্র যে ইহার প্রাচীনত্বের বিষয় মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে আংশিক সত্য নিহিত আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, আমাদের বিশ্বাস তিনি ইহাকে মনুষ্যরূপী ছেঁচড়া বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন এবং সে হিসাবে যে ইহার অভিমত নির্ভুল তাহা স্বীকার্য্য। কারণ কুরুসভায় ছেঁচড়া-শকুনির উল্লেখ মহাভারতেও আছে। আহা! ব্যাসদেবও

ছেঁচড়ার মমতা ভুলিতে পারেন নাই সেই জন্যই তাঁহার ভুবনবিখ্যাত মহাকাব্যে ইহার অস্তিত্ব। হায়! ছেঁচড়া তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া তোমার আঁসটে গন্ধে দশদিশি আমোদিত কর! সুখের বিষয় বলিতে কি তোমাকে আমরা বর্ত্তমান যুগেও পাইয়াছি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তোমাকে বহুবার দেখিয়াছি, এখন তোমাকে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র চষিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। স্বাগতঃ।

ইতিপূর্ব্বে এই ছেঁচড়ারা অনেকের কদলীপত্রে বিরাজ করিয়াছিলেন। যাহারা স্ত্রী ভাবাপন্ন পুরুষ তাহারা ইহাদের স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু যাহারা প্রকৃত পুরুষ তাহারা ইহাদের "পাতেও পাড়ে নাই"। কারণ ইহারা সংসর্গে বড় এজন্য ইহাদের দেহ পূতিগন্ধময়। বর্ত্তমান ছেঁচড়ারা ইহাদের বিষম পূতিগন্ধ কাব্য সৌরভে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কবি বলিয়াছেন, 'ঢাকলে ঢাকা থাকবে কত।' অতএব ইহাদের স্বাভাবিক নক্কার জনক গন্ধে বঙ্গসাহিত্য নরকের ন্যায় "গুলজার" হইয়া উঠিয়াছে।

ইংরাজি সাহিত্যও একদিন মেলন্ (Melon) ছেঁচড়ার গুণে জমিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সেক্ষপীয়র—সেক্ষপীয়রই রহিলেন। উক্ত ছেঁচড়াও একদিন হিসাব নিকাশ করিয়া দেখাইয়া ছিলেন যে, কেবলমাত্র ষষ্ঠ হেন্‌রী নাটকে ছয় সহস্র লাইনের মধ্যে চারি সহস্র লাইন সেক্ষপীয়র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তথাপি সেক্ষপীয়রের সেক্ষপীয়রত্ব ঘুচিল না, রহিল কেবল মেলনের ছেঁচড়ামি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গসাহিত্যেও এইরূপ জন দুই তিন ছেঁচড়ার উদয় হইয়াছে। ইহারা বাঙ্গালীটোলার ধাক্কা খাইয়া ফিরিঙ্গীটোলা চৌরঙ্গীর কলাপাতে স্থান পাইয়াছে! ইহারা সন্দেশের মিষ্টতায় মুগ্ধ, তাহারই পার্শ্বে ক্ষীরমোহনের আদর দেখিয়া দারুণ ঈর্ষান্বিত হইয়াছে, এবং প্রথমের মিষ্টতা যে শেষোক্ত অপহরণ করিয়াছে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য ছেঁচড়ামির একশেষ করিতেছে।

যাহা হোক ইহাদের ছেঁচড়ামী দেখিয়া—শুনিতে পাই কোন কোন বঙ্গনারী নাকি বলিতেছেন,

"আপনার পানে চায় না—"প্রভৃতি—

অবশ্য এ জঘন্য ছেঁচড়ার সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমরা আমাদের রসনা কলুষিত করিব না!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

৮ম বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩১৮। [৩য় সংখ্যা

April, 1911.

অৰ্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্।

"অর্চ্চনা কার্য্যালয়"—১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র] [এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

সুরমা

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা মাথাঘোরা মাথাজ্বালা অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৵৹ তের আনা। ৵৹ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

সৌরভ-সার।

বঙ্গমাতা—বাঙ্গালীর "বঙ্গমাতা" সমস্ত বাঙ্গালার গৌরব স্বরূপ।

মল্লিকা।—বেলা-যুথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাটকা বকুল ফুলের মতই অটুট সুন্দর।

দিল্ অব্ রোজ।—ইহার সৌরভ কেমন তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। বস্তুতঃ ইহা একটী অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সামগ্রী।

গোলাপসার।—নামমাত্রেই ইহার গুণে পরিচয় পাওয়া যায়।

খস্‌খস্।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খসের মত এমন আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই।

পারিজাত।—ইহাতে সত্য সত্যই যেন স্বর্গীয় সৌরভ

মস্ক-জেসমিন।—মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ॥৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৵৹ আনা। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ আনা, ডাকমাশুল ।৵৹ সাত আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵৹ পাঁচ আনা। আমাদের অটো-ডি রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব্ খস্‌খস্, অটো-ডি-হেনা অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। ডজন ১০৲ দশ টাকা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

TO ESCAPE ALL DANGERS
MORAL AND PHYSICAL.

শারীরিক এবং মানসিক বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে আমাদের

কাম শাস্ত্র

পাঠ করুন। উহা স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য্য এবং উন্নতির একমাত্র উপায়; বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে বিতরিত হইতেছে।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

ইহা যৌবনসুখ ও চপলতা এবং অত্যধিক ধাতুক্ষয় জনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা স্নায়বিক যন্ত্রগুলিকে সতেজ করে। ইহা শরীরের বল বৃদ্ধি করে, রক্ত বৃদ্ধি এবং পরিষ্কার করে এবং স্বপ্নদোষ নিবারণ করে। ইহা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং মনুষ্য শরীরে যে সব উপাদান অভাব হয়, তাহা দূর করে।

কবিরাজ শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



সকল রকমের উৎকৃষ্ট বাইসাইকেল্
সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ রাখি,
দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।
পত্র লিখিলে মূল্যাদি সক্রান্ত কার্ড পাঠান যায়।

ন্যাশনাল্ সাইকেল এণ্ড্ মোটর কোং লিমিটেড্।

২৯৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী।



স্যান্‌মেট্টো

ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্গঠন করিতে ইহা একটী জবনীশক্তিপ্রদ টনিক।

পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসক ও ঔষধ ব্যবসায়ী এই ঔষধ ব্যবহার করেন। মূত্রযন্ত্রে এবং জননেন্দ্রিয়ের পক্ষে স্যান্‌মেট্টো জীবনীশক্তিদায়ক পুষ্টিবর্দ্ধক মহৌষধি; ইহা মূত্রাধার ও মূত্রাশয়ের সকল প্রকার রোগনাশক। মূত্রকে স্নিগ্ধ ও প্রদাহ বিহীন এবং ইহার জ্বালা যন্ত্রণা দূর করিয়া থাকে। মূত্রাধারের স্কন্ধদেশে যে গ্রন্থি আছে তাহাকে প্রষ্টেটগ্রন্থি বলা হয়—উহা প্রায়ই বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাতে অবাধে প্রস্রাব হয় না, কাজেই দিবারাত্র মূত্রাধার হইতে মূত্র বহির্গত হয়—এইরূপ রোগ সমূহে স্যানমেট্টো সপেক্ষা অধিকতর উপকারপ্রদ মহৌষধ আর নাই। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবের পীড়ায়—প্রস্রাব অধিকবার প্রদাহকারী ও কষ্টপ্রদ হইলে ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায়। শিশুদিগের বিছানায় মূত্রত্যাগ পীড়ায়, মূত্রাধারের প্রদাহিতে এবং প্রস্রাব ত্যাগকালে কষ্টে ইহার আরোগ্যকারিতা বিস্ময়জনক। প্রমেহাদি পীড়ায় এবং সকল প্রকার মূত্রযন্ত্রসম্বন্ধীয় রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। জননেন্দ্রিয়াদির পীড়ায়, ধাতুদৌর্ব্বল্যে, পুরুষত্বহানিতে ইহা ব্যবহৃত হইলে সঞ্জীবনী শক্তির ন্যায় কার্য্যকারী হয়।

আট ঔন্স্‌ শিশিতে স্যান্‌মেট্টো বিক্রয় হয়। প্রতি শিশির মূল্য কোং ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র (অথবা যেমন বাজার দর থাকে)। সর্ব্বত্র ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। যদি স্যান্‌মেট্টো আপনি না পান, নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদিগকে পত্র লিখিলে আমরা আপনার নিকট পাঠাইব। বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে স্যান্‌মেট্টোর নমুনা ও তদ্‌সম্বন্ধীয় কাগজাদি পাঠাই।

ও, ডি, কেমিকেল কোম্পানি,

৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক।

হোলি উৎসবে সাহ আলম।

ভারতবর্ষে প্রথম বসন্ত সমাগমে যখন নবপল্লবিত তরুকুঞ্জ হইতে দিগন্ত ভরিয়া পিককুল তানের লহর ছুটায়, যখন নব কুসুমিত বেলা, চামেলী জুঁইয়ের গন্ধ বহন করিয়া মলয় হিল্লোল দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন আবহমান কাল ধরিয়া বৎসরে বৎসরে হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণের দোললীলার স্মৃতিরক্ষার জন্য হোলী উৎসবে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। খালি আবির কুঙ্কুম রং পিচ্‌কারী লইয়া পরস্পর পরস্পরকে রঞ্জিত করিলেই এ উৎসবের শেষ হয় না। এ সময় মিছিল বাহির হয়, গীত বাদ্যে সমগ্র হিন্দুস্থান ভরিয়া উঠে। এ সকল আমোদ আহ্লাদের সহিত আজিও পশ্চিম ভারতে অনেক কুৎসিৎ ক্রীড়ার অভিনয় হয়, অনেক অশিক্ষিত লোক জঘন্য কুরুচিসম্পন্ন গীত গাহিয়া লজ্জাশীলা গ্রাম্য বধূদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে।

তখন ভারতে মোগলভাগ্য-রবি প্রায় অস্তাচলচূড়ায় পঁহুছিয়াছেন, বাদসাহ সাহ আলম মোগলকুলভাস্কর আকবর ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনে নামে মাত্র বাদসাহ হইয়া বসিয়াছিলেন, এমন কি সাহজাহান-নির্ম্মিত রত্নসিংহাসন তক্তৌসও পারস্যাধিপতি আসিয়া ভারতবর্ষ হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ গৌরব-রবি তখন সবেমাত্র পূর্ব্বগগন আলোকমালায় উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরাক্রান্ত টিপু সুলতান ও নানাফারণাভেসের সহিত সমরে পূর্ণ বল প্রয়োগ করিবার জন্য ইংরাজেরা মাধবজী সিন্ধিয়াকে দিল্লীতে যথেচ্ছা অগ্রসর হইতে দিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাধোজী আপন প্রভু পেশোয়ার সহিত যে খেলা খেলিয়াছিলেন, পেশোয়ার পক্ষ হইতে দিল্লীশ্বরের সহিতও সেই খেলা খেলিলেন। নামে তিনি পেশোয়ার সেনাধ্যক্ষ হইলেও তাঁহারই বিক্রম মহারাট্টা শিবিরে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। শত্রুভয়ভীত লুপ্তগৌরব সাহ আলম বাদসাহকে মুসলমান শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া মাধোজী আপনার প্রভুর জন্য তাঁহার নিকট হইতে ওয়াকীল-ই-মুতালীক নামক উচ্চ খেতাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফলে মোগল সম্রাট হিন্দুবীরের করতলগত হইলেন।

মোগল বাদসাহের নিকট এইরূপ উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া সিন্ধিয়া মহারাজা

কার্য্যগতিকে ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের বসন্তের সময় মোগল রাজধানীর নিকট শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। বাৎসরিক বসন্তোৎসবে হিন্দু শিবিরে সৈনিকগণ মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। আবিরের লাল রঙ্গে পথ ঘাট লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। নৃত্য গীতে চারিদিক ভরিয়া উঠিল। রাজপথে নৃত্য গীতের সহিত নানারূপ মিছিল বাহির হইতে লাগিল।

সিন্ধিয়ার অধীনে আনন্দরাও নর্শী বলিয়া একজন সেনাধ্যক্ষ কর্ম্ম করিত। আনন্দরাওও অপরাপর হিন্দুদিগের মত হোলীতে মাতিল। সে এক অভিনব মিছিল সজ্জিত করিয়া মোগল রাজধানীর প্রকাশ্য রাজপথে বাহির করিল। সেনাধ্যক্ষ কতকগুলা কুলীর মস্তকে এক বৃহৎ কাষ্ঠাসন দিয়া একজন সামান্য লোককে গুম্ফশ্মশ্রু পরাইয়া বাদসাহ সাহ আলম সাজাইয়া বসাইয়া দিল। দিল্লীশ্বর আপনার কুমারী কন্যাটীকে বড় ভাল বাসিতেন। তাই আনন্দরাও একটা বালিকাকে রাজকুমারী সাজাইয়া সেই ছদ্মবেশী সাহ আলমের ক্রোড়ে বসাইয়া দিল। তাহাদের পশ্চাতে কতকগুলা লোককে সভাসদ সাজাইয়া বাহির করিল। তাহাদের সহিত ঢাক ঢোল বাঁশরী বাজাইয়া রাজপথে তাহাদিগকে লইয়া ঘুরাইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সম্রাটের প্রতি এরূপ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার কেহ ছিল না। মহতের নিগ্রহে অনেকেই হর্ষান্বিত হয়। সুতরাং আনন্দরাওয়ের মিছিল ক্রমশ বিকটাকার হইতে লাগিল। লোকে এরূপ অসমসাহসিক ব্যাপার কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই।

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় সম্রাট সাহ আলম অতি মধুরস্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কদাচ মোগল জাতির ঔদ্ধত্য তিনি প্রকাশ করিতেন না। সম্রাট জহান নামা প্রাসাদে বসিয়াছিলেন। সহসা পথে গণ্ডগোল শুনিয়া তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতমুখে সকল কথা শুনিয়া তিনি নকল সাহ আলম ও তদীয় সভাসদগণকে প্রাসাদের মধ্যে ডাকিয়া আনাইলেন।

বলা বাহুল্য, সে সময় মোগল সভাসদগণ মহারাষ্ট্রা-বিদ্বেষে জ্বলিতেছিল। তাহারা এই অশিষ্ট সেনাধ্যক্ষ আনন্দরাওয়ের সমুচিত দণ্ডের জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিতে লাগিল। কোমল প্রকৃতির সাহ আলম হাসিয়া বলিলেন— 'এ সামান্য ব্যাপারে প্রকৃত সম্রাটের গৌরব ম্লান হয় না। বেচারা হোলী উৎসবে আনন্দ করিতেছে করিতে দাও।' কেবল তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াই সম্রাট আপন মহত্বের পরিচয় দিলেন না। তিনি পারিতোষিক স্বরূপ তাহাদিগকে পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করিলেন।

আনন্দরাও নর্শীর শক্র নিজামুদ্দীন সম্রাটের নিকট তাহাকে নিগৃহীত করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া সিন্ধিয়ার নিকট উপস্থিত হইল। সে আনন্দরাওর বে-আদবীর সমস্ত কাহিনী মহারাজের নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বুঝাইল যে বাদসাহ এ ব্যাপারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আপনার সেনাধ্যক্ষের এরূপ আচরণে সিন্ধিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি আজ্ঞা দিলেন—আনন্দরাওকে ধরিয়া সহরের তোপখানার দারোগা রাজ মহম্মদের নিকট প্রেরণ করা হউক, আর তাহার শিবির লুণ্ঠিত হউক।

লুণ্ঠন করিবার আজ্ঞা পালন করিবার লোকের অভাব হইল না। সকলে ছুটিয়া সেনাধ্যক্ষের শিবির লুণ্ঠন করিতে ছুটিল। যে যাহা সম্মুখে পাইল নিজস্ব করিয়া লইল। হতভাগ্য আনন্দরাওকে তোপখানার দারোগা তোপের মুখে দাঁড় করাইল। হোলি উৎসবের হর্ষ এক বিরাট বিষাদে পরিণত হইল।

ইতিমধ্যে এ সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তিনি মহারাজা সিন্ধিয়ার রাজভক্তিতে আনন্দিত হইলেন বটে কিন্তু হতভাগ্য আনন্দরাওয়ের শোকে তাঁহার করুণ হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি দ্রুতগতিতে আপনার খোজাকে মাধবজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দের প্রাণনাশের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে খোজা আসিয়া সিন্ধিয়ার নিকট সম্রাটের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিল। সাহ আলম হতভাগ্য আনন্দকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া শিবির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তাহার যথেষ্ট শাস্তি হইবে।

'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রম'। ভাগ্যবলে আনন্দরাও তোপের মুখ হইতে বাঁচিয়া গেল। তবে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইল। দুই চারি দিন লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া এক রাত্রিতে সে তাহার শিবিরের লুণ্ঠনাবশিষ্ট সম্পত্তি লইয়া উজ্জয়িনীতে পলায়ন করিল। *

* এ ঘটনা ফকীর খয়রুদ্দীন মহম্মদ বর্ণিত ইব্রত-নামা নামক ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। পরে সাহ আলমের গোলাম কাদের কর্ত্তৃক নির্য্যাতনের কাহিনী এ ইতিহাসে অতি মর্ম্মস্পর্শিণী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি স্থাপনে সহায়তা করিয়া লেখক পেন্সন পাইয়াছিলেন।

রাঙ্গা জামা।

(১)

অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে রায়-গৃহিণী বলিলেন—বল কি? পাক কথার কমে যে বিয়ে হয় না।

রায় মহাশয় বলিলেন—বিয়ে আর হ'ল কোথা ছাই। এখনও পাক কথার সবই বাকী।

গৃহিণী অধীর ভাবে বলিল—আর বিয়ের বাকী কি? ঠিক্ ঠিক কি কথা-বার্ত্তা হ'ল আর একবার বলো দেখি।

এরূপ গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর আজ্ঞা উপেক্ষা করিলে পারিবারিক শান্তির নিশ্চয়ই ব্যাঘাত ঘটিবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া রায় মহাশয়কে অগত্যা সে গল্পটি আদ্যোপান্ত পুনরাবৃত্তি করিতে হইল। তিনি বলিলেন—জানই তো আমি বড় একটা কল্‌কাতার ছেলেপিলের কাছে ঘেঁস্‌তে চাইনে। বসন্তকে দেখ্‌লেই আমি একটা কার্য্যান্তরে যাই। আজ সকালে যখন ছোকরা বটতলার কাছে নমস্কার করে দাঁড়ালো, তখন সত্যি কথা বল্‌তে কি, প্রাণটায় একটু ভয় হ'লো।

গৃহিণী বলিল—ওমা! সে আবার কি? ভয় আবার কিসের? তুমি যেন কি এক রকমের লোক! জামাইকে আবার ভয় কি?

গল্পের প্রারম্ভেই স্ত্রীর নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া রায় মহাশয় ক্ষণিক স্তব্ধ হইলেন, শেষে বলিলেন—আঃ! এরি মধ্যে জামাই জামাই ক'রে লাফাচ্চ কেন? যাক্ ভয়টা অপর কিছুর না, ইজ্জতের। আমাকে একবার একটা কল্‌কাতার ছেলে বলেছিল—'কর্ত্তা তোমার পকেটে দেশলাই আছে? দাওনা সিগারেটটা ধরিয়ে নিই'।

গৃহিণী বলিলেন—আঃ! কাজ নেই তোমার গল্পে। কেবল ধান ভান্‌তে শিবের গীত।

কর্ত্তা বলিলেন—যাক্ সে কথা। ছোকরা তো আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বল্‌লে—'ভাল আছেন?' আমি বলিলাম—'হ্যাঁ।' বসন্ত বল্‌লে—'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে'। আমি ভাবলেম বুঝি ও আমার সেই জমিটার কথা বলবে। ছোকরা সে সব দিকে গেল না। আমাকে স্পষ্ট করে বল্‌লে—'মহাশয়ের যে অবিবাহিতা কন্যাটী আছে, আমার সঙ্গে বিবাহ দিলে তাকে যথাসাধ্য সুখে রাখি।'

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—ওমা ! কি বেহায়া জামাই গো। এমন কথা তো কখনও শুনিনি। ওমা ! নিজের বিয়ের কথা নিজে আবার কে কবে বলে ?

রায় মহাশয় বলিলেন—আমি তো কথা শুনে অবাক। এত বয়েস হ'য়েছে। সাত আট নম্বর ফৌজদারী আর ষাট্‌ নম্বর দেওয়ানী মামলার তদ্বির করেছি কিন্তু এমন বেহায়া কথা তো শুনিনি।

এবারে গৃহিণী কুপিতা হইলেন। তিনি বলিলেন—বেহায়া কি ক'রে বলি ? আমি ঢাক ঢাক গুড় গুড় ভালবাসি না। ছেলে মানুষের যদি একটা ইচ্ছাই হ'য়ে থাকে তো মুখ ফুটে বলতে কি ? ও ছেলে তো আর ফেলনা নয়। টাকার পাহাড়ের উপর ব'সে আছে।

রায় দম্পতির দাম্পত্য জীবনের মতভেদজনিত দ্বন্দ্বে একটা বিশেষত্ব ছিল। প্রথমে যুবক বসন্ত কুমারের চাল চলন আপনার নিকট নির্লজ্জতার পরিচায়ক হইলেও তাহার সম্বন্ধে স্বামীর অভিমত পাইয়াই গৃহিণীকে মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইয়াছিল। স্বামীও ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন—অত বড়লোক বলেই তো ভয়। এখন হয় তো খেয়ালের ওপর একটা কাজ করছে। শেষে—

বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন—শেষে আবার কি হ'বে ? আমার মেয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আহা ! বসন্তে গৌরীতে বেশ মানাবে, যেন রাম আর সীতা।

ধনবান নিঃসন্তান মাতুলের বিষয় পাইয়া বসন্তকুমার খর্জুরী গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিল। মাতুলের জীবদ্দশায় বসন্তের পিতার সহিত মাতুলের আদৌ সদ্ভাব ছিল না। সুতরাং এ গ্রামের সহিত বসন্তের বিশেষ পরিচয় ছিল না। তাহার মাতুলের মৃত্যুর পরে একে একে তাহার স্নেহময়ী জননী ও গর্ব্বিত পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কলিকাতার শূন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া শিক্ষিত বসন্তকুমার মাতুলের গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিল। তাহার আগমনে যেন যাদুবলে তাহার মাতুলের সুবৃহৎ অট্টালিকা সৌন্দর্য্য-পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার বাসগৃহ সংলগ্ন ক্ষুদ্র উপবনটিকে প্রভূত পরিশ্রমে সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছিল। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কাহারও সহিত বসন্তকুমার সখ্য স্থাপন করে নাই ; তবে তাহার মাতুলের পরিচিত কোনও প্রবীণ লোক তাহার নিকট আসিয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া যায় নাই। দূর হইতে লোকে তাহাকে অবিনয়ী বলিয়া সন্দেহ করিত।

বসন্তকুমার রায় মহাশয়কে বলিয়াছিল, দুই তিন দিনের মধ্যে সে তাঁহার

কন্যাটিকে দেখিতে আসিবে। তাহাকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিলে সে তাহার প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবে, এ সম্বন্ধে রায় দম্পতির মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল। শেষে বহরমপুর সহর হইতে রায় মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা মুকুন্দরাম আসিলে রায় পরিবারে শান্তি সংস্থাপিত হইল।

(২)

জ্ঞাতি ভ্রাতা হইলেও রায় মহাশয়ের সুখে দুঃখে, আমোদে উৎসবে মুকুন্দরাম তাঁহার প্রধান সহচর। মুকুন্দরামের সহোদর ভ্রাতার সহিত রায় মহাশয় এক বিঘা জমি লইয়া হাইকোর্ট অবধি মামলা লড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও মুকুন্দরাম রায় মহাশয়কে ছাড়িয়া ভ্রাতার সহায়তা করেন নাই। এই সকল কারণে নিত্যানন্দ রায়ের পরিবারে মুকুন্দরায়ের অত্যধিক প্রতিপত্তি ছিল। গম্ভীর ভাবে বসন্তকুমার সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া মুকুন্দরাম বলিলেন—বেশ।

রায় গৃহিণী বলিলেন—ও কি কথা ঠাকুর পো ? জামায়ের কথা শুনে তুমি কোথায় আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌বে না গম্ভীর ভাবে বল্‌লে বেশ্‌। মনে কি আছে স্পষ্ট করে বলো।

বৌঠাকুরাণীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুকুন্দরাম মনের কথা বলিল। সে পাড়াগেঁয়ে লোক কলিকাতার যুবকদের কথা কিছু জানে না সুতরাং কিছু বলিতে পারে না। তবে তাহার মতে অসমান সম্পর্কে সুখ হয় না। সে যে পাত্রটিকে স্থির করিয়াছে তাহার সহিত বিবাহ হইলে উভয় পক্ষ পরস্পরকে বুঝিতে পারিবে, এই অবধি সে বলিতে পারে।

সে একটি পাত্র স্থির করিয়াছে শুনিয়া রায় দম্পতি অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। মুকুন্দ যে রায় মহাশয়ের সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা অধিক আপনার তাহাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন।

রায় গৃহিণী বলিলেন—ওমা ! সে কি কথা গো। আমি দুই জামাই নিয়ে কি করব গো। কাকে ছাড়ি কাকে রাখি গো।

গৃহিণীকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া রায় মহাশয় ভ্রাতার নিকট পাত্রের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। পাত্রটি তাহাদের পরিচিত জমীদার উপেন্দ্র বাবুর পুত্র যোগেশ। যোগেশকে রায় মহাশয় বোধ হয় একবার দেখিয়াছিলেন—যুবক দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। সুতরাং তিনজনে বড় সমস্যায় পড়িলেন।

বহু তর্কের পর গৃহিণী বলিলেন—যতই তোমরা বল, মেয়ে আমার। আমি যা ইচ্ছা করব। নিজের গ্রামে বসন্তের অমন সোণার অট্টালিকা ছেড়ে মেয়ে আমার ভিন্ন দেশে যাবে তা দেখতে পারবো না।

কথাটা মুকুন্দের নিকট একটু রূঢ় বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং সেও একটা কড়া জবাব দিল। গৃহিণীও ছাড়িবার পাত্রী নন। শেষে যখন মুকুন্দ রাগ করিয়া উঠিল তখন নিত্যানন্দ বলিলেন—আহা! বসন্ত যে মেয়ে পছন্দ করবে এমন তো কোনও কথা নাই। এখন দু'পক্ষই হাতে থাক্। যদি বসন্ত গৌরীকে পছন্দ না করে, তখন উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা কর্‌লেই হ'বে।

এ কথায় কাহারও কিছু বলিবার রহিল না। গৃহিণী এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

(৩)

প্রভাতে উঠিয়া আপন সুসজ্জিত উদ্যান ছাড়িয়া যুবক বসন্তকুমার কেন আপনার প্রাসাদ শিখরে পদচারণা করিতেছিল, তাহার ভৃত্য গোমস্থা প্রভৃতি কেহ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পায় নাই; এমন কি, স্বয়ং বসন্তকুমারও তাহার কার্য্যের ঠিক কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ছাদের প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইয়া বসন্তকুমার নিম্নে অবলোকন করিয়া মনে মনে বলিল—'এ শোভা নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায় না'। তাহার অট্টালিকার বহির্ব্বাটীতে উঠিবার বিস্তৃত সোপান শ্রেণীর নিম্নের লাল রাস্তার অপর পার্শ্বের দুর্ব্বাশোভিত প্রাঙ্গণটি যেন বহুমূল্য হরিৎবর্ণের মখমলাবরিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার মাতুলের সময় এস্থলে এক বৃহৎ চালা ঘরে কাছারি বসিত। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে রাস্তার ধারে পূর্ব্ব পশ্চিম দুই সারি নবরোপিত সুপারি বৃক্ষ এবং দক্ষিণে তাহার মাতুলের সময়ের দেবদারুর সারি এক সুন্দর শোভা সম্পাদন করিতেছিল। ঠিক প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি পুষ্পবীথিকা নানা বর্ণের সুবাসিত কুসুমে সজ্জিত হইয়া সমস্ত স্থলটির শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। বিস্তৃত সোপান শ্রেণীর প্রত্যেক সোপানের উভয় প্রান্তে এক একটি অপ্সরী মূর্ত্তির হস্তে দীপ। মনে মনে বসন্তকুমার এ সকল দৃশ্যের সুখ্যাতি করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিল। তাহার প্রাসাদশিখরে আরোহণের এ শোভাদর্শনেচ্ছাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও এ শোভা অধিকক্ষণ তাহার ভাল লাগিল না। সে ভাবিল তাহার উদ্যান গ্রামের অপরাপর উদ্যানের সহিত তুলনায় কিরূপ দেখাইতেছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। সুতরাং অপর উদ্যান দেখিবার জন্য সে রায় মহাশয়ের বাগানের দিকে চাহিল। সে স্থল তাহার প্রথমে ভাল লাগিল না। তাহার পর আমগাছের নিম্নে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন এবার সে বুঝিল। এবার সে মনে মনে বলিল—'আমি মনকে যতই বুঝাই না

কেন, আমি এই লোভে ছাদের উপর উঠি। যাহা হ'ক কাল প্রাতে নিশ্চয় নিকট হইতে দেখিব বালিকার সরলতাটা স্বাভাবিক কি না'।

বসন্তকুমার বহুক্ষণ সে দিকে তাকাইয়া রহিল। কিশোরী গৌরী আপন মনে একটা ছাগী দোহন করিতেছিল। কোমরে অঞ্চল জড়াইয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশরাশি আশে পাশে ছড়াইয়া আমগাছের তলায় বসিয়া গৌরী ছাগীর দুগ্ধ সংগ্রহ করিতেছিল। আপনার শিশুকে খাওয়াইয়া ছাগী যে তৃপ্তি পায় গৌরীকে সেইরূপ তৃপ্তি ও সন্তোষের সহিত ছাগী দুগ্ধ দিতেছিল। একটা দেশী কুকুর শুইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া এক দৃষ্টে সেই কিশোরীর লাবণ্যমণ্ডিত প্রফুল্ল মুখের প্রতি তাকাইয়াছিল। গৌরীর পার্শ্বে তাহার ছোট ভ্রাতা দাঁড়াইয়াছিল।

গৌরী ভ্রাতার হস্তে দুগ্ধ পাত্র দিয়া চামেলির ঝোঁপের নিকট গেল। চামেলি বৃক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা পল্লবে সে স্থলটিকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছিল। আপনার অঞ্চল ভরিয়া গৌরী ফুল তুলিল। তখনও কুকুরটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। তাহার পর গৌরী গৃহাভিমুখে চলিল। বসন্তকুমার একটু অধীর হইল। চঞ্চল পদে নামিয়া আসিয়া তিনি পত্র লিখিলেন—

"মান্যবরেষু—

কাল আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম সেই উদ্দেশে কাল প্রাতে আপনার বাটিতে যাইব। নমস্কার জানিবেন।

বশম্বদ

শ্রীবসন্তকুমার সেন।"

ভৃত্য হস্তে পত্র খানি রায় মহাশয়ের বাটিতে পাঠাইয়া দিয়া বসন্তকুমার বিষয় কর্ম্ম দেখিবার জন্য কাছারি গৃহে প্রস্থান করিল।

(৪)

গৃহিণী বলিল—তুমি বোঝ না। যে যেমনটি চায় তাকে তেমনটি দিতে হয়। তা না হ'লে আমাদের পাড়াগেঁয়ে চালচলন দেখে জামাই বিগ্‌ড়ে যাবে। শেষে সব মাটি হ'বে।

কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিল—তুমি পাগল। তোমার ওসব কথা আমি শুন্‌তে পারি না।

কথাটা অপর কিছু না। রায় গৃহিণী লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন যে বসন্ত-কুমার উৎকলবাসীদিগের মত কেশ ধারণ করে। মস্তকের মধ্যভাগের কেশ বড় রাখিয়া সিঁথি কাটা এবং চারিদিকের চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা যে

আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ, এ শিক্ষা নিত্যানন্দ ঘরণীর আজিও হয় নাই। বসন্তকুমারের উক্ত প্রকারের কেশ-ধারণ-পদ্ধতি উৎকল জাতির প্রতি তাহার পক্ষপাতিতার নিদর্শন বলিয়া তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাই তিনি ঘোষালদের উড়ে মালিকে ডাকিয়া আপনার শিশু পুত্রগুলির ঐরূপ চুল কাটিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ স্ত্রীর বাধ্য হইলেও নিত্যানন্দ রায় এ বিষয়ে শেষ অবধি লড়িয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

পুত্র কন্যা ও আপনাদের সভ্যজনোচিত পোষাক পরিচ্ছদ লইয়াও তাহাদের মধ্যে এ দুইদিন নানাপ্রকার কলহ হইয়াছিল। বসন্তকুমারের জন্যই গৃহে এইরূপ অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে এবং তাহার জন্যই তাহাকে নানাপ্রকার সাজ সজ্জা করিতে হইতেছে ইহা ভাবিয়া কুমারী গৌরী বসন্তের উপর মনে মনে বড় রাগ করিল। সেই বা কেন তাহাকে বিবাহ করিতে আসিতেছে, বিবাহ করিলেই বা তাহাকে পিতামাতা ছাড়িয়া কেন বসন্তের বাটীতে বাস করিতে হইবে, গৌরী এ সকল প্রশ্নের মনে মনে কিছু উত্তর পাইল না। বসন্তের পুষ্পবীথিকা এবং তাহার সুসজ্জিত প্রমোদোদ্যানের কথা স্মরণ করিয়া কিশোরী বড় আনন্দ অনুভব করিল। তাহার পর সে বসন্তের মুখখানা ভাবিতে চেষ্টা করিল। তাহাতেও সে নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্ন দেখে নাই। তবে কেন তাহার জন্য সাজসজ্জা করিতে তাহার পিতামাতা তাহার উপর এত উৎপীড়ন করিতেছে, সে এ সমস্যার উত্তর পাইল না।

গৃহে বসিয়া রায় দম্পতি দেখিল বসন্ত তাহাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। তাহাদের পুরাতন ভৃত্য মধুসূদনকে তাহারা যুবককে সেলাম করিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। মধু বসন্তকে দেখিয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়া এমন কি তাহাকে নমস্কার করিতেও ভুলিয়া গেল। গৃহিণী মনে মনে বড় চটিলেন। বসন্তকুমার আসিয়া রায়েদের বড় ঘরে বসিল। কর্ত্তার অনভ্যস্ত গাত্রে পিরাণটা ঠিক হইয়া বসিতেছিল না বলিয়া ঠিক সময়ে বাহির হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না।

বহা বাহুল্য, নিত্যানন্দ রায় এরূপ কার্য্যবিশৃঙ্খলতার জন্য গৃহিণীর নিকট যেরূপে তিরস্কৃত হইল তাহার প্রত্যেক কথা গুলা বসন্তকুমারের কাণে পঁহুছিল। গৃহের সাধারণ সরঞ্জমের সরলতা ঢাকিয়া উচ্চ রকমে গৃহসজ্জা করিতে গিয়া রায় পরিবার আপনাদিগের বহির্ব্বাটীর গৃহটিকে যেরূপে সজ্জিত করিয়াছিল তাহাতে সৌন্দর্য্যপ্রিয় বসন্তকুমারের হৃদয়ে মোটেই প্রীতিবর্দ্ধন হয় নাই। সে গ্রাম্য পরিবারে সরলতা দেখিবার জন্য কলিকাতার অনেক সুমার্জ্জিতা সুন্দরী ছাড়িয়া এস্থলে

বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। শেষে যখন সাদা চাদরাবৃত্ত-দেহ নিত্যানন্দ রায় তাড়াতাড়িতে এক বোতাম-বিহীন সার্ট পরিধান করিয়া বসন্তকুমারের নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে মনে মনে রায় মহাশয়ের মস্তিষ্কের নিরাময়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইল। বসন্তকুমার রায়পরিবারের যে দুইটি শিশুর নধর নবনীত দেহের প্রত্যহ সুখ্যাতি করিত, তাহাদিগকে দেহ অপেক্ষা বৃহৎ রাঙ্গা কোট পরিধান করিতে দেখিয়া সে বড় বিস্মিত হইল। ভদ্রতার খাতিরে সে এমন বিসদৃশ দৃশ্যেও হাসি চাপিয়া রহিল।

রায় মহাশয়কে নীরব দেখিয়া বসন্তকুমার স্বয়ং প্রথম কথা কহিল। তাঁহার কথার উত্তর কোনটাই তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। গৃহিণী দরজার অন্তরাল হইতে সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। স্বামীর কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। আর অধিকক্ষণ দরজার অন্তরালে থাকিলে "জামাই" হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া তিনি স্বয়ং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাকে বসন্ত পূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছিল। সুতরাং আজ অকস্মাৎ তাঁহাকে এক লাল মেরিনোর জামা পরিহিতা দেখিয়া বসন্তের বিস্ময় বাড়িল। সে বুঝিল যে মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সে সরলা গ্রাম্য ললনার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছিল সে মোহ সমগ্র জগতের ললনাকুলকে ঘেরিয়া আছে। এস্থলেও সহরের বিলাসস্পৃহা ও ভোগলালসা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল, ছিল না কেবল সহরের সৌষ্ঠব ও কমনীয়তা। সে তাহার স্বপ্নের ভ্রমটুকু ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল।

গৃহিণী বলিল—তুমি বাবা ঘরের ছেলে, তোমার কাছে বেরুতে দোষ কি? আমার বাবা মেয়ে ছেলেদের ঘরের ভেতর বন্ধ করে রাখা মোটেই ভাল বাসতেন না।

অবশ্য তাঁহার এরূপ প্রকাশে বসন্তকুমারের বিশেষ কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু গৃহিণী যখন হাস্যোদ্দীপক পোষাক পরিয়া অনর্গল স্রোতে বাক্যালাপ করিতে লাগিল, তখন বসন্ত তাঁহাকে বড় একটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিল না। সে যে একটা মস্ত ভ্রম করিয়াছে তাহা ধীরে ধীরে তাহার মনে উদয় হইল। শেষে যখন সভায় কুমারী গৌরীবালা আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তাহার সমস্ত মোহ কাটিয়া গেল। সে স্পষ্ট বুঝিল যে সে ভুল বুঝিয়া এ কয় দিন বৃথা নষ্ট করিয়াছে।

গৌরীর সে সরলতা-মণ্ডিত মুখশ্রী, সে কমনীয় দেহলতা, সেই বনদেবীর

মত সরল স্বচ্ছন্দতার ভাব তাহার মাতার আগ্রহাতিশয্যে একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তাহার কাঁচাসোণার বর্ণের গণ্ডে এবং ওষ্ঠে রায়-গৃহিণী কতকটা অলক্ত রস মাখাইয়া দিয়া তাহার মুখের স্বাভাবিক সরলতাটি একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম মুক্তাবস্থায় যে সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিত, কবরীবদ্ধ হইয়া সুন্দরীর অলকাগুচ্ছের আর সে শোভা ছিল না। তাহার উপর গৌরীর অনভ্যস্ত পদযুগল আকারে ছোট চর্ম্মপাদুকার উৎপীড়নে বালিকাকে বড়ই কাতরা করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাহার গাত্রে সেই হাস্যোদ্দীপক লাল জামা, তাহার পরিধানে তাহার মাতার হরিৎবর্ণ রেশমী বস্ত্র, তাহার অঙ্গে তাহার মাতার বিপুল শরীরের স্বর্ণালঙ্কার সুন্দরীর শ্রীটুকু একেবারে হরণ করিয়াছিল বলিয়া যুবকের মনে হইল। তাহার জন্য আজ গৌরীবালাকে এইরূপ ভাবে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল বলিয়া সেও মনে মনে বসন্তের উপর বড় কুপিতা হইয়াছিল। সুতরাং বসন্ত যখন তাহার কথা শুনিবার জন্য প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং তাহার মাতা তাহাকে ভদ্রভাবে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন, তখন মুখ ফিরাইয়া কাঁদিয়া কুমারী সভাস্থল পরিত্যাগ করিল। তাহার এরূপ আচরণে কেবল বসন্তকুমারের স্বপ্ন ভাঙ্গিল এরূপ নহে। তাহার সহিত গৃহিণীরও লক্ষপতি জামাতা পাইবার উচ্চাশা, পিতৃমাতৃহীন জামাতার গৃহে আধিপত্য করিবার বাসনা, গ্রামের ললনাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবার সুখ-কল্পনা গঠিত আকাশ-কুসুম সকলই ভূমিসাৎ হইল।

(৫)

গর্ব্বিত মুকুন্দরাম বিজয়ী বীরের মত বলিল—আর কেন আমাকে কষ্ট দাও, আমি ও সব কথায় থাক্‌তে পারবো না।

গৃহিণী বলিল—সে কি কথা! আমি এখন নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। বাবা! যাদের সঙ্গে মিলবে না তাদের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি?

কর্ত্তা বলিলেন—যা ব'লেছ, জোর করে সভ্য সাজতে গিয়ে মিছে ক'টা দিন ব্যস্ত হ'য়ে ম'লাম আর এক রাশ টাকা খরচ করে ফেললাম।

অগত্যা মুকুন্দরাম উপেন্দ্রবাবুর পুত্রের সহিত পাকাপাকি করিবার সংকল্প করিয়া পত্র লিখিয়া দিল। নকদী দিয়া পত্রখানা বহরমপুরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য নিত্যানন্দ বাহিরে গেলেন।

মুকুন্দ বলিল— শেষে কি বল্‌লে?

গৃহিণী বলিলেন—শেষে যখন বসন্ত বুঝিয়ে দিলে যে তাহার সহিত সম্পর্ক হইলে কোন পক্ষই সুখী হইবে না তখন আমি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম। শেষে বল্লেম—'বাবা তুমি ঘরের ছেলের মত আমাদের বাড়িতে এসো যেও।' তাতে সে সম্মত হ'লো। আমাদেরও তার বাড়ীতে যাবার জন্যে অনুরোধ করলে। যা হ'ক এই ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল, সেটা মন্দ কথা না।

ঠিক এই সময় বসন্তকুমার গ্রাম্যপথে বায়ুসেবন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রায়েদের বাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এ দুই দিন ধরিয়া তাহার মনে একটা বড় বিষম সমস্যা উঠিয়াছিল, তাহার কোন্ ধারণাটা ভুল। সে রায়েদের ভুল দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোন্ ভাবটা প্রকৃত এবং কোন্ ভাবটা ভ্রমমূলক তাহা সে নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। রায়েদের দরজার নিকট আসিয়া আর একবার তাহাদের দেখিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইল। বাগানে প্রবেশ করিয়াই যুবক দেখিল সামান্য একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া এক হাতে গৌরী অতি সস্নেহে একটি পক্ষী-শাবককে বসাইয়া রাখিয়াছে এবং অপর হস্তে একটা নিমগাছের শাখা দিয়া তাহার সেই দেশী কুকুরটাকে প্রহার করিতেছে। গৌরীর এ মূর্ত্তি দেখিয়া আবার তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইল, আবার সে তাহার স্বপ্নের বনদেবীকে দেখিতে পাইল। সে ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বলিল—'দিব্য দোয়েলের বাচ্ছাটি তো'। উত্তেজনায় গৌরী তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া উত্তর করিল—'আহা বেচারা বড় ভয় পেয়েছে। হতভাগা গ্যাঁদা একে তাড়া ক'রে একেবারে মেরে ফেলেছিল'।

সুন্দরী পক্ষীটিকে মুখের কাছে তুলিয়া বারম্বার তাহার পক্ষ চুম্বন করিল। তাহার স্নেহোদ্ভাসিত সুন্দর মুখখানি যুবক বসন্তকে একেবারে উন্মাদ করিয়া তুলিল। সে ধীরে ধীরে হস্ত প্রসার করিয়া বলিল—দেখি তোমার পাখিটি?

এবার সুন্দরী মুখ তুলিয়া বসন্তকুমারকে চিনিল। লজ্জায় তাহার মুখটি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে সহসা পলাইতে পারিল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া সে নতমুখী হইয়া রহিল।

বসন্ত বলিল—তুমি ফুল ভালবাস? আমার বাগানে অজস্র ফুল আছে। তুমি পাখী ভালবাস আমি তোমার জন্য কলিকাতা হইতে শত শত পাখী আনিয়া দিব। আমি ভুল করিয়াছি। আমায় ক্ষমা করিও।

সেই সময় নকদীর হস্তে কন্যার বিবাহের প্রতিশ্রুতি-পত্র পাঠাইয়া দিয়া

নিত্যানন্দ রায় সে স্থলে আসিয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বড় বিস্মিত হইল।

(৬)

গৃহিণী বলিল—ওমা! সে কি কথা গো? কি পাগলা ছেলে গো।

মুকুন্দ নীরবে সকল কথা শুনিল, কিছু উত্তর দিল না।

কর্ত্তা বলিল—দু'জনকে একত্রে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমায় কি বল্‌ব। তোমার রাঙ্গা জামাগুলা দেখে বসন্ত বিগড়ে ছিল। আবার আমাদের সরল সাদাসিদে দেখে তার পূর্ব্বের ইচ্ছা জেগে উঠ্‌লো। আমার কাছে সে আন্তরিক মাপ চেয়েছে।

গৃহিণী বলিল—ওমা! এ কি সর্ব্বনাশ। আমি দুই জামাই নিয়ে কি করব? এতক্ষণে যে সে চিঠি পৌঁছে গেল।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে পত্রবাহক গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া তিন জনে মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

নকদী বলিল—হুজুর মাপ করুন, আমার কোন দোষ নাই।

বিমর্ষ ভাবে নিত্যানন্দ বলিলেন—তোর আর দোষ কি বেটা, কপালের দোষ। একটা কথার খেলাপ হবে বড় লজ্জার কথা।

মুকুন্দরাম বলিল—তুই এর মধ্যে নয় ক্রোশ পথ গেলি এলি কি ক'রে?

নকদী বলিল—নয় ক্রোশ আর গেলাম এলাম কোথা বাবু।

মুকুন্দরাম বলিল—চিঠি কোথায় দিয়ে এলি তবে?

নকদী বলিল—হুজুর সে কথা আর কি বলব? খেয়ার নৌকা যেমনি টলল, অমনি আমার হাতের চিঠিখানা জলে টব্ করে পড়ে গেল।

নিত্যানন্দ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—তবে চিঠি পৌঁছায় নাই?

ভীত পেয়াদা তাহার পদধারণ করিয়া বলিল—আঁজ্ঞে না। এমন ভুল আর হ'বে না! আমি ফের যাচ্চি বাবু, এখনি চিঠি লিখে দিন।

রায় পরিবারের নিকট তিরস্কারের পরিবর্ত্তে এক টাকা বখসিস্ পাইয়া পেয়াদাপ্রবর বড়ই বিস্মিত হইল।

পার্শ্বের গৃহে বসিয়া গৌরী সকল কথা শুনিতেছিল। সে যখন শুনিল বসন্তের সহিত তাহার বিবাহ হইবে তখন সে আপনা আপনি অন্য মনে বলিল—বাগানে অনেক ফুল আছে, কলকাতা থেকে অনেক পাখি এনে দেবে—কথা গুলি বেশ মিষ্টি—দিব্য চেহারা—নামটিও—

এমন সময় তাহার মাতা আসিয়া তাহাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিল। তাহার পর রায়-গৃহিণী সেই রাঙ্গা জামাগুলা এবং গৌরীর জন্য আনীত জুতা জোড়া পুঁটুলী বাঁধিয়া খিড়কীর পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল। কার্য্যের পরিণাম সন্দেহ না করিয়া পুঁটুলী বাঁধিবার সময় গৌরী তাহার মাতার সহায়তা করিয়াছিল।

প্রাচীন ঋষিপত্তন ও বৌদ্ধধর্ম্ম

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে মেজর কানিংহাম সারনাথ খনন করেন। তাহার পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মার্কহাম কিটো সাহেব কর্ত্তৃক সারনাথ খনিত হয়। মিঃ ই টমাস (বেনারসের ভূতপূর্ব্ব জজ) এবং ডাঃ এফ হল প্রভৃতি অনেকেই সারনাথে গিয়া বহুবিধ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে, এখানে যে সকল শিল্পাবশেষ খনিত ও উত্তোলিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে এবং অধিকাংশ সারনাথের নব-প্রতিষ্ঠিত দর্শনাগারে স্থাপিত হইয়াছে। সারনাথের খননকার্য্য সম্প্রতি বন্ধ।

কানিংহাম সাহেব বলেন :—

"সারনাথের ধ্বংসাবশেষমধ্যে এইগুলি প্রধান :—

১। ধামেক নামক প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ স্তূপ। ২। জগৎসিংহ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বৃহৎ ইষ্টক স্তূপ। ৩। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মৎকর্ত্তৃক খনিত স্থানগুলি। ৪। ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে মেজর কিটোকর্ত্তৃক খনিত স্থানগুলি। ৫। চৌখণ্ডী নামক উচ্চ ইষ্টকস্তূপ।

---

* আমি এই সুযোগে, গতসংখ্যার প্রবন্ধে দুটী বিষম ভ্রমের কথা স্বীকার করিতেছি। প্রথম, "মহাবংশ" ও "Dathadhatawanso," দু'খানি একই পুস্তক। দ্বিতীয়, আমি লিখিয়াছিলাম, বারাণসী হইতে গয়ায় গিয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন। এরূপ উক্তি, আমার অমনোযোগিতার ফল। কারণ, বুদ্ধদেবের মৃত্যুস্থান, একজনের মতে বারাণসী ও পাটনার মধ্যবর্ত্তী কুশীনগর; অপরের মতে, আসামের মধ্যবর্ত্তী কুশীগ্রাম,—কিন্তু গয়া নয়। ভরসা করি, পাঠক আমার এই ভ্রম ও ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।—লেখক।

চৌখণ্ডী স্তূপ ধামেক হইতে কিছু কম অর্দ্ধমাইল দূরে। এই চৌখণ্ডী স্তূপ ভিন্ন, আর সকলগুলিই অর্দ্ধমাইল দীর্ঘ ও প্রায় সিকি মাইল প্রস্থ একটী বৃহৎ পোস্তার উপরে স্থাপিত।

* * * *

সারনাথের ভিতরে, ধামেক স্তূপটাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মিঃ ফারগুসান বলিয়াছেন, মিঃ প্রিন্সেপের তত্ত্বাবধানে ইহা মেজর কানিংহাম কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছে। (১) একথা সত্য নয়। প্রথমে, আমি একাকীই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তবে স্তূপখননের ব্যয়ভার আমি একাকী বহন করি নাই বটে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খননকার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সমাপ্ত হয় এবং তাহাতে ব্যয় হইয়াছিল প্রায় ৫১৭৷৴১০। এই ব্যয়ভার, জেম্‌স্ প্রিন্সেপ, কাপ্তেন থর্‌স্‌বি, মেজর গ্রাণ্ট ও আমি,—সকলে মিলিয়া বহন করিয়াছিলাম।

ধামেক স্তূপটী নিরেট ও মণ্ডলাকার। ইহার বনিয়াদের বিস্তার ৯৩ ফিট দৈর্ঘ্য—ধ্বংস-ভগ্ন উচ্চভূমি হইতে ১১০ ফিট। কিন্তু সমতলভূমি হইতে ইহার উচ্চতা ১২৮ ফিট। ইহার বনিয়াদ খুব বড় বড় ইষ্টকে প্রস্তুত এবং উচ্চভূমির ভিতরে ২৮ ফিট গভীর। কিন্তু তাহার দশফিট পরিমিত অংশমাত্র সমতলভূমির মধ্যে প্রবিষ্ট। স্তূপের নিম্নার্দ্ধভাগ—৪৩ ফিট পরিমিত অংশ প্রস্তরের এবং উপরার্দ্ধ ইষ্টকের।

স্তূপের চারিদিকে প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিবার জন্ম অনেকগুলি পুত্তলাধার আছে। কিন্তু মূর্ত্তিগুলি বহুদিন অদৃশ্য হইয়াছে। পুত্তলাধার বা কুলঙ্গীগুলির দীর্ঘতা একফুট করিয়া।" (২)

আমি যখন সারনাথে গিয়াছিলাম, তখনও এই স্তূপের প্রায় পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থা। স্তূপগাত্রে, প্রস্তরের উপরে কারুকার্য্য। একাজ সকল স্থানেই নাই—কয়েকদিক কারুকার্য্যমাত্র শূন্য। ইহা বরাবর অসম্পূর্ণ ছিল, কিংবা বর্ত্তমান অবস্থা কালপ্রভাবে অথবা দর্শকগণের অপার করুণামাহাত্ম্যে হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা দায়।

কিন্তু ফারগুসান সাহেব বলেন :—

"The carvings round the niches on the projections have been left so unfinished—in some instances only outlined. * * The upper part of the tower seems never to have been finished at all." (৩)

কারুকার্য্য, কোথাও জ্যামেতিকরেখাপ্রতিম, কোথাও পুষ্পলতাসমাকীর্ণ, কোথাও বা সমচতুরস্র ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষোদিত। তাহার শিল্পকৌশল এমনই

(১) Handbook of Architecture. Vol. I. P. 15.

(২) Cunningham's 'Archaelogical Survey of India.' 1862—63—64—65. Vol. I. P. P. 106—8.

(৩) Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture. P. 67.

চমৎকার এবং এমন সযত্ননিপুণতার সহিত তাহা প্রস্তরাঙ্গে উৎকীর্ণ, যে দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। আমি প্রাচ্য শিল্পিগণের অনেক কার্য্য দেখিয়াছি; কিন্তু এমন সম্পূর্ণ কাজ, এমন অভিনিবেশ-সহকৃত অভ্রান্ত পরিমাপের ক্ষোদন, খুব অল্প স্থানেই আমার চোখে পড়িয়াছে। এই শিল্প-রম্য প্রস্তরগুলি স্থানে স্থানে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। তাই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কতকগুলি লোক, চুণারের প্রস্তর দিয়া সেগুলির পতনবেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, আনন্দিত হইলাম।

কানিংহাম সাহেব বলেন :—

"এই স্তূপের নাম কেন যে 'ধামেক' হইল এবং উক্ত নামের অর্থ কি, তাহা স্থানীয় লোকেরা বলিতে পারে না। এখানে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব, আমি এইরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারি, যে 'ধামেক' শব্দটী, সংস্কৃত 'ধর্ম্মোপদেশক' শব্দেরই অপভ্রংশমাত্র।

* * * *

আগ্রার তাজমহল ভিন্ন, আর কোন ভারতীয় স্থাপত্য, সারনাথের বিরাট স্তূপের মত এত সচরাচর জনমুখে উল্লিখিত হয় না। তথাপি, আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ইহার পরিমাপ লইয়া অনেকেই অনেকবার গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন। অথচ, কত সহজে ইহা মাপিয়া লইতে পারা যায়! একগাছা ভ্রমণযষ্টি বা হস্তদ্বারা কয়েক মিনিটের ভিতরেই ইহার পরিমাপকার্য্য শেষ করা যাইতে পারে। উইলফোর্ডের মত তুলিয়া এইচ এইচ উইলসন বলিয়াছেন, 'সারনাথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ ফিট—পরিধিও ঐরূপ।' মিস এম্যা রবার্টস বলিয়াছেন, 'ইহার উচ্চতা ১০০ শত ফিটের উপরে ও পরিধি প্রায় ১৫০ ফিট। ফারগুসান বলেন, 'ইহার ব্যাস ৫০।৬০ ফিটের ভিতরে এবং উচ্চতা ১১০ ফিট।' শেষ মতটীতে উচ্চতার পরিমাপ নির্ভুল হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরিধি ২৯২ ফিট এবং ব্যাস ৯৩ ফিট,—শেষ-লিখিত মতের প্রায় দ্বিগুণ!"

আমিও এ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে অনেকের ভ্রম দেখিয়াছিলাম। একজন লিখিয়াছেন :—

"এখানকার ধ্বংসাবশেষ, দশ বার একর স্থানব্যাপ্ত ইষ্টকের বাঁধের উপরে স্থাপিত। সম্প্রতি তাহা খনিত হইয়াছে। এখানকার মণ্ডলাকার প্রাসাদটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য। ইহার ব্যাস প্রায় ৭০ ফিট এবং উচ্চতাও ৭০ ফিট। ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত। মধ্যস্থ অংশ ইষ্টকপূর্ণ। উপরের প্রস্তরবেষ্টনী ১২ ফিট পুরু। বহির্ভাগে জ্যামেতিক রেখা, পুষ্পলতা ও অন্যান্য আদর্শের পরিকল্পনা উৎকীর্ণ।" (১)

উদ্ধৃত অংশের বর্ণনা পাঠ করিলে, বেশ বোঝা যায়, যে উল্লিখিত স্তূপটীই

(১) The Tourist's Guide. P. P. 55 –56.

ধামেক। কিন্তু লেখক, ধামেকের উচ্চতা-গৌরব যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে খর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়!

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খননকালে, কানিংহাম এখান হইতে একটী প্রস্তর-তোরণের ভগ্নাংশ প্রাপ্ত হন। তাহার কারুকার্য্য খুব চমৎকার। সম্প্রতি তাহা কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই ভগ্নাংশের দু'দিকে দুটী মন্দিরের ক্ষোদিন-চিত্র এবং দীপঙ্কর বুদ্ধ আর মলয়গিরি হস্তী ও বুদ্ধের কাহিনী-সূচক আলেখ্য। মধ্যে আর একটী মন্দির,—তাহাতে মহাপরিনির্ব্বাণের চিত্র। মন্দিরের নিম্নে ও পার্শ্বে নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি। যম, কেতু, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শ্মশ্রুধারী শিব, গণেশ, কার্ত্তিক, বরুণ ও ইন্দ্র,—কেহই বাদ পড়িয়া যান নাই। কানিংহামের বর্ণনা :—

"ধামেক স্তূপ হইতে ৫২০ ফিট দূরে, পশ্চিমদিকে একটী ৫০ ফিট পরিমিত গহ্বর আছে,—তাহার চারিদিকে ইষ্টকপ্রাচীর। ইহা একটী বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপের ভগ্নাবশেষ। রাজা চেৎসিংহের দেওয়ান বাবু জগৎসিংহকর্ত্তৃক, জগৎগঞ্জ প্রতিষ্ঠার জন্য ইষ্টকসংগ্রহার্থ ইহা খনিত হইয়াছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ দেখিল, যে ২৭ ফিট নিম্নে দু'টী প্রকাণ্ড বাক্স রহিয়াছে। বাক্স দুটীর একটী সাধারণ প্রস্তরের ও অপরটী মার্ব্বলের এবং তাহার একটী অন্যটীর ভিতরে ছিল। জোনাথন ডানক্যান সাহেব বলেন, ভিতরের বাক্সটীর মধ্যে কতকগুলি মানুষের হাড় ও নানারূপ রত্নাদি ছিল। (১)

সেই সময়েই, পাত্রগুলির সহিত একটী বুদ্ধমূর্ত্তিও বাহির হইয়াছিল। তাহার উপরে একটী লিপি ছিল—তাহা ১০৮৩ সংবৎ বা ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের। * * মেজর কিটো, এই মূর্ত্তিটীর জন্য জগৎগঞ্জে প্রেরিত প্রস্তররাশির মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ফলে, সেখানে ইহা ভগ্নাবস্থায় পাওয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, লিপিটী তখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। মেজর কিটো, লিপিটীর মর্ম্ম, আধুনিক নাগরী ভাষায় অনুবাদ করিয়া, আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। তদ্বিষয়ে আলোচনাকালে আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, যে কিটোর সহকারী, বেনারসের পণ্ডিতপ্রবরগণের গবেষণার ফলে, লিপিটীর ভাষা 'ব্রাহ্মণীকৃত' হইয়া গিয়াছে। (২)

---

(১) Asiatic Researches: Vol. V. 1798. ১৩১ পৃষ্ঠায় জোনাথন ডানক্যানের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল, আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :—"In the Innermost of these case (which were discovered after digging to the depths of eighteen hands or cubits under the surface) were found a few human bones, that were committed to the Ganges, and some decayed pearls, gold leaves, and other jewels of no value."

(২) বুদ্ধমূর্ত্তিসংলগ্ন লিপির ইংরাজী অনুবাদ :—"Mahi Pala, Raja of Gauda, having worshipped the lotus-like foot of Sri Dhamarasi (heaps of light? Buddha) grown in the lake of Varanasi, and having for its moss the hair of prosperous kings, caused to be erected in Kasi hundreds

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, আমি যখন ধামেক স্তূপটী লইয়া ব্যস্ত ছিলাম,—সেই সময়েই জগৎসিংহের স্তূপে পূর্ব্ববর্ণিত পাথরের বাক্সটীর জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। স্থানীয় সকল লোকেই এই বাক্সের কথা শুনিয়াছিল, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না, যে বাক্স এখন কোথায় আছে। পরিশেষে, 'শঙ্কর' নামে এক বৃদ্ধ, আমার কাছে আসিয়া বলিল, যে যখন সে বালক, তখন জগৎসিংহকর্ত্তৃক সে খননকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং সে পূর্ব্বোক্ত রত্নাদি আবিষ্কারের কথা সমস্তই জানে। সে আরও বলিল, মার্ব্বেলের বাক্সটী বড়সাহেব (জোনাথন ডানক্যান) লইয়া গিয়াছেন; কিন্তু পাথরের বাক্সটী সেই মুক্তস্থানেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। লোকটার কথা সত্য কি না জানিবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাক্সটা কোনস্থানে পড়িয়াছিল, তাহা সে দেখাইয়া দিতে পারে কি? সে তৎক্ষণাৎ একটী স্থান দেখাইয়া দিল এবং আমিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই জায়গাটা খননের জন্য নিযুক্ত করিলাম। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই, সে ১২ ফিট গভীর করিয়া জায়গাটা খুঁড়িয়া ফেলিল,—এবং বাক্সটা বাহির করিল। বাক্সটা, সাধারণ চূণার পাথরে নির্ম্মিত এবং তাহার ভিতরে ষষ্টিসংখ্যক প্রস্তরমূরত ছিল। আমি বাক্স ও মূর্ত্তিগুলি বেঙ্গল এসিয়াটীক সোসাইটীতে উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। সম্প্রতি সেগুলি যাদুঘরে আছে। সেই জায়গাটা আরও খনন করিয়া, আমি সেখানেও একটী ছোটখাটো ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ আবিষ্কার করিয়াছিলাম।

অষ্টাদশ বৎসর পরে, মেজর কিটো ও মিঃ টমাসের খনন ফলে, এই স্তূপের সমস্তটাই বাহির হইয়াছিল। তখন জানা গিয়াছিল, যে এই স্তূপের ব্যাস ৪৯ ফিট ৬ ইঞ্চ। স্তূপটী ধ্বংসভগ্ন হইয়াছিল বলিয়া, ইহার অসম্পূর্ণ ভাগ সম্পূর্ণ করিয়া পরিমাপ হইয়াছিল প্রস্থে ৮২ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে ৫০ ফিট।"

সর্ব্বশেষ খননের ফলে জগৎসিংহের স্তূপের কাছে একটী মন্দিরের ভিত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পরিমাপ ৯৫ × ৯৫ ফিট। পূর্ব্ব-দ্বারী। দ্বারনিম্নে

of Isana and Chitraghanta. Sri Sthira Pala and his younger brother, Sri Vasanta Pala, having restored religion, raised the tower with an inner chamber and eight large inches."—ইহাই কানিংহামকৃত অনুবাদ। বিশেষজ্ঞের জন্য, আমরা এখানে মূল সংস্কৃতটীও উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"বারাণসী সরস্যাং গুরবঃ শ্রীবামরাশিপাদাব্জং।
আরাধ্য নামত ভূপতি শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশম্॥
ঈশানচিত্রঘণ্টাদি কীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপাল কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ ॥১॥
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং॥
কৃতবন্তৌ চ নবীনাং অষ্টমহাস্থান শৈলগন্ধ কুটীং।
এতাং শ্রীস্থিরপালঃ বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্ ॥২॥
সংবৎ ১০৮৩ পৌষদিনে ১১।৩।

তিনটী সোপান। কতকগুলি পাথরের উপরে বুদ্ধ, ধর্ম্মচক্র ও শিষ্যবৃন্দের ক্ষোদনচিত্র।

ইলোরা গিরিমন্দিরের দ্বিতলেও বুদ্ধের একটী প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধ একখানি সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট,—তাহার মধ্যস্থলে একটী ধর্ম্ম-চক্র। সম্মুখে দুটী কারুকর্ত্তিত মৃগ শায়িত। ফারগুসান বলেন, এই ক্ষোদন চিত্রের বিষয়, বারাণসীর মৃগদাবমঠে বুদ্ধদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন। (১)

জগৎসিংহের স্তূপের এই নবাবিষ্কৃত মন্দিরভিত্তির প্রস্তরগুলি চতুরস্র। দ্বারের পর প্রাঙ্গণ,—চওড়ায় ২৩ ফিট ও দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফিট। প্রাঙ্গণের দু'দিকে ঘর। মন্দিরের অধিকাংশই ইষ্টকগ্রথিত। যে সকল স্থানে ইট নাই—সেই সেই স্থান চিত্রিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। পাথরের উপরে কোথাও হাঁসের সারি, কোথাও বুদ্ধমূরত এবং কোথাও কমলদল।

সারনাথের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে, আরও নানাবিধ আদর্শের অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-লিখিত বর্ণনাপাঠে, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, যে সেখানে কেবল বৌদ্ধমূর্ত্তিই নাই। পরন্তু বহুসংখ্যক হিন্দুদেবদেবীরও মূর্ত্তি আছে। সেগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ, এখানে দেওয়া অসম্ভব। একখানি সাতভাগে বিভক্ত প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। তাহার উপরে, শাক্যমুনির জীবনকালে তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কয়েকটী প্রধান ঘটনার ক্ষোদন-চিত্র আছে। বুদ্ধদেবের জন্মদৃশ্যসূচক পরিকল্পনার ভিতরে ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ এবং গন্ধর্ব্ব দলেরাও আপনাদের স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন। কোন ছবিতে দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের ছত্রধারী হইয়া পরমানন্দে বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ যুক্তজানু হইয়া উপবিষ্ট। ইহার কারণ বুঝিতে গেলে অধিক ভাবিতে হয় না। বুদ্ধদেবের সহিত দৈন্যসূচক ভঙ্গীতে হিন্দুদেবতার মূর্ত্তিসমাবেশ করিয়া, বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, যে বুদ্ধদেবের কাছে হিন্দুদেবতারা কিছুই নন—তাঁহার সযত্ন-পরিচর্য্যাই তাঁহাদের কার্য্য। যতদিন বুদ্ধ বিদ্যমান ছিলেন, ততদিন তাঁহার ধর্ম্ম উদার ছিল। কোনরূপ সম্প্রদায়ী ভাব,—কোনরূপ বিভেদ-মন্ত্র—কোনরূপ নীচতা,—তাহার ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে, তদীয় শিষ্যবর্গ এইরূপ কূপমণ্ডূকবৎ আচরণের দ্বারা, স্বহস্তেই আপনাদের বিনাশবীজ রোপণ করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মের পরিপন্থিক হইয়া,তাঁহারা

(১) The Cave-Temples of India : By James Fergusson and James Burgess.

পরিশেষে আপনারাই আশ্রয়হীন এবং নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা এখানে বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই দুর্ব্বলতাই ভারতে ব্রহ্মণ্য-শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কারণ। হিন্দুরা দেখিলেন বৈষম্যে আপনারই সর্ব্বনাশ—সাম্য এবং মৈত্রীই আত্মরক্ষার সোপান! তাঁহারা অমনি চতুর্দ্দিকে পরি-প্রচার করিয়া দিলেন, বুদ্ধদেব দশমাবতারের অন্যতম। সূক্ষ্মানুভূতিশূন্য জনসাধারণ বুঝিল, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম অভিন্ন। ধর্ম্ম যখন এক,—বৃথা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়া লাভ? এই পরিজ্ঞানই, হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ হইল। উৎকলেও এই চতুরতার অভিনয় হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের দন্ত-পূজার বেদীর উপরে জগন্নাথ আসিয়া বসিলেন, বৌদ্ধগণের দন্তযাত্রার অনুকরণে, নির্দ্দিষ্ট দিবসে তিনিও রথ-যাত্রার উৎসব অনুষ্ঠান করিলেন এবং আপনার অধিকারে বৌদ্ধগণের জাতিভেদের নিষেধবিধি প্রচার করিয়া দিলেন। (১) ইতিহাস আরও বলে, উৎকলের ত্রিমূর্ত্তি, বৌদ্ধ ত্রিরত্নেরই অনুকরণ!

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথের খননকার্য্য আবার আরম্ভ হয়। এবারকার খননকর্ত্তা, মিঃ ওয়েরটেল্। খননের ব্যয়স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট ১০০০ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন। ক্ষোদন-ফলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ বুদ্ধ প্রভৃতির মূর্ত্তি, অশোক-স্তম্ভ, একটী মন্দির ও একটী সঙ্ঘারামের ভিত্তি এবং দু'একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূর্ত্তিগুলির ভিতরে, মহারাজ কণিষ্কের সময়ের একটী প্রকাণ্ড বোধিসত্ত্বের মূরতই উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটীর পূর্ব্বদশা আর নাই। তাহার দক্ষিণহস্ত ভগ্নচূর্ণে পরিণত এবং দেহের অন্যান্য স্থানও, কোথাও ক্ষয়প্রাপ্ত,—কোথাও বা চূর্ণিত হইয়াছে। (২) এই মূর্ত্তিটীর আধুনিক অবস্থা দেখিয়া, তাহার বিলুপ্ত সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিবার উপায় নাই। তবে, ইহার ক্ষোদনশিল্প, এককালে যে মনোরম ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মূর্ত্তির সহিত একটী প্রস্তরছত্র এবং স্তম্ভাদিও পাওয়া গিয়াছে। (৩) বৌদ্ধ-

(১) Antiquities of Orissa. By Dr. Rajendra Lall Mitra. L.L.D.

(২) সম্রাট কণিষ্ক যে একজন শিল্পানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে যে নিপুণ শিল্পকর্ম্মার অভাব ছিল না, উদ্ধৃত অংশে তাহা বোঝা যায়:—"Huen Thsang, the Buddhist Pilgrim from China. * * says that the artists from Baktria were employed to paint the Buddha monasteries during the time of Kaniska, king of Gandhara about the first century of our era, and that the comment of Serika was famous for its murial paintings." Indian Sculptures and Paintings. By E. B. Havell. P. 155.

(৩) কণিষ্কের স্তম্ভে নিম্ন-উদ্ধৃত লিপি পাওয়া গিয়াছে:—

১। মহারাজস্য কণিষ্কস্য সং৩ হে৩দি ২২

২। এতয়ে পূর্ব্বয়ে ভিক্ষুস্য পুষ্য বুদ্ধিস্য সর্দ্ধ্যবি

গণের রাজ-সুহৃদের মধ্যে অশোক এবং কণিষ্কই প্রধান। ইঁহারা উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কণিষ্ক প্রথম শতাব্দীর লোক। য়ুয়ন্ চুয়াঙ্, তাঁহাকে গান্ধাররাজ নামে অভিহিত করিতেন। (১) তিনি মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা-মন্ত্র তিনি কখনও উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ, চিরজীবন তিনি যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই মত্ত ছিলেন। এই বিষম রণপ্রিয়তার জন্য, কথিত আছে, তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ বিরক্ত হইয়া, শ্বাসরোধ করিয়া তাঁহার হত্যাসাধন করিয়াছিলেন। (২) কণিষ্ক অসভ্য জাতীয় সম্রাট ছিলেন। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকেই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার শিল্পকীর্ত্তি, শিলালিপি ও মুদ্রাদি বিদ্যমান রহিয়া, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে।

৩। হারিস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য

৪। ব্যেধিসত্ত্ব ছত্রং যষ্টি প্রতি স্থাপিত

৫। বারাণসিয়ে ভগবতো চংকমে সহামাত

৬। হিতি হিসন (?) যন্ধয়চ (?) হিসন্ধবিহারি

৭। হি নিবসিক......সহা বুদ্ধ মিত্রয়ে ত্রেপিটিক

৮। য়ে মহা ক্ষত্রপেন বনস্পয়েন খরপল্ল

৯। নেনচ সহচ পরিষ হি (?) সর্ব্ব সত্বনং

১০। হিত সুখাথ

"ইহা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ কণিষ্কের ৩য় সংবৎসরে হেমন্তের ৩য় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক ও পুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক বুদ্ধিমিত্র নামক ব্যক্তির সাহায্যে খরপল্লন ও বনস্পর নামক ক্ষত্রপদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এই মূর্ত্তি, ছত্র ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। * * * কণিষ্কের স্তম্ভের সহিত আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির পদতলে ও পশ্চাদ্‌ভাগে আরও দুইটী খোদিত লিপি আছে। * * *

১। ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকসা বোধিসত্ত্বো প্রতিস্থাপিতো

২। মহাক্ষত্রপেন খরপল্লনেন সহাক্ষত্রপেন বনস্পরেন

"ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বারাণসী কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একজন মহাক্ষত্রপের অধীনে একজন ক্ষত্রপ বারাণসী শাসন করিতেন।"

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩১২। ৪র্থ সংখ্যা। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৌদ্ধ বারাণসী" নামধেয় প্রবন্ধ দেখ।

(১) Beal's Buddhist Records of the Western World.

(২) Indian Antiquary. Vol. XXXII. P. 388. Philipp's Translation of Levi's Notes Surless Indo-Scythes.

এবারকার খনন-ফলে যে অশোক স্তম্ভটী পাওয়া গিয়াছে, অতঃপর সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই স্তম্ভ অনুশাসন, অশোকের একটী প্রধান কীর্ত্তি। ভারতবর্ষের বহু স্থানেই অশোকের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সাঞ্চী, সারনাথ, এলাহাবাদ, দিল্লী, মজঃফরপুর ও ছাপরা প্রভৃতি স্থানের স্তম্ভগুলিই প্রসিদ্ধ। (১)

সাঞ্চীর স্তম্ভ সম্বন্ধে, কানিংহাম সাহেব যাহা বলিয়াছেন, পাদটীকায় তাহা উদ্ধৃত হইল। (২)

বিশেষতঃ, অশোকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এইরূপ স্তম্ভ অনুশাসন আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। ইহাতে ঐতিহাসিকগণের কি কম সুবিধা হইয়াছে? প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম, রাজনীতি এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ তথ্য, আমরা এই সকল অনুশাসন হইতে জানিতে পারি। (৩) সারনাথের স্তম্ভেও একটী ক্ষোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। (৪)

অশোকস্তম্ভের উত্তোলিত ভগ্নাংশটীর উচ্চতা আট ফিট। আর একটী অংশ মাটীর উপরে পড়িয়া আছে, তাহার উচ্চতা ২০ ফিট এবং যে অংশ এখনও গর্ত্তের ভিতরে আছে, তাহার পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১২ ফিট, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অবস্থায়

---

(১) "There are also six pillar inscriptions, * * * On time of the pillars are inscribed the six edicts promulgated in the year 236 B, C., * * *" The History of the Alphabet : Isaac Taylor.

(২) সিংহস্তম্ভের শীর্ষস্থ সিংহগুলির সম্বন্ধে কানিংহাম বলেন :—"The heads are all broken ; but the limbs, which are still perfect, are so boldly sculptured, and muscles and claws are so accurately represented, that they might well be placed in comparison with many specimens of Grecian Art." Bhilsa Topes : P. 195.

(৩) "Aside from their interest as historical documents, these inscriptions of Asoka had the greatest importance in giving an insight into the literature of India ; for it was through them that the Indian alphabet was interpreted by princeps. * * It will be evident then, that classical literature and monumental remains give but brief glimpses of the actual history of early India." See "The Historian's History of the World.—History of Ancient India." P. 475.

(৪) শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, অশোক-লিপির বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়াছেন :

১। সংঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ।

২। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘ ভোজন করিবেন, ইহাদের নিমিত্ত শুক্লবস্ত্র স্থাপন বা আস্তরণের আদেশ হইল।

ইহার উচ্চতা ছিল ৪০ ফিট। স্তম্ভের উপরে চারিটী সিংহমূর্ত্তি, তাহাদের সম্মুখভাগ পরস্পরবিযুক্ত, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ সংযুক্ত। স্তম্ভের অন্যান্য অংশ খনিত স্থানেই পড়িয়া আছে। কেবল তাহার সিংহ-চতুষ্টয়-শোভিত চূড়াটী, সারনাথের নবনির্ম্মিত মিউজিয়মে, একখানি শকটের উপরে রক্ষিত আছে।

এই সিংহ স্তম্ভটীর নৈপুণ্য, আমি ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিব না। কবির ভাষায় বলিতে গেলে তাহা অপ্সরীর স্বপ্নের মত বিচিত্র, কুসুমের মত সুন্দর, শরীরিণী জ্যোৎস্নার মত নেত্ররঞ্জন। প্রথমতঃ, তাহার প্রস্তর। এমন মূল্যবান প্রস্তরের স্তম্ভ, আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাপুষ্ট রাজধানীতেও দেখিতে পাই না। কি তাহার মসৃণতা—হাত দিলে হাত পিছলাইয়া যায়। চৈনিক ভ্রমণকারীর ভাষায় অত্যুক্তির আভাসমাত্র নাই,—সত্যই তাহা দর্পণের মত স্বচ্ছ !

এই স্তম্ভের উপর দিয়া দ্বিসহস্রাধিক বৎসরকাল ধরিয়া কালের অত্যাচার বহিয়া গিয়াছে। তাহার পর আর কাহার অত্যাচারে জানি না, ইহা খণ্ড-

---

৩। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের সমীপে যাঁহারা বিনয় বা শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিবেন, তাঁহাদের আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল।

৪। দেবানাং প্রিয় এইরূপ বলেন—ঈদৃশী এই লিপি আপনাদের সমীপে আপনাদের স্মরণার্থ উৎকীর্ণ থাকিল।

৫। এই লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল। সেই উপাসকগণও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন।

৬। সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও প্রতিপালনকার্য্যের নিশ্চয়তা সম্পাদনের জন্য এক একটী মহাপাত্র নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য এই শাসন (প্রচারিত হইল)।

৭। (সাধারণের নিকট) বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য এবং আপনাদের আহার ও রক্ষা বা আশ্রয়ের জন্য এই শাসন নির্দ্দিষ্ট হইল।

৮। সর্ব্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশ গমন করুন।

৯। এইরূপ কোট বিশপেরা বিজ্ঞাপন পত্রসহ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন।

"এই অনুশাসনে কয়েকটী নূতন শব্দ পাওয়া গিয়াছে। যথাঃ সংসলনসি, আবতকে, কোট বিস বেসু, আজানিতবে ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন, কোট বিসবেসু রাজকর্ম্মচারিবিশেষের নাম। কিন্তু দেবদত্ত রামচন্দ্র ভাণ্ডারকর Assistant Archaeological Surveyor, Bombay Circle বলেন, যে ইহা স্থানবিশেষের নাম এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহা কোট বিসবেসু আকার ধারণ করে।" ১৩১২ সালের, ৪র্থ সংখ্যা, পরিষৎ পত্রিকায় ১৭০—৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বিখণ্ড হইয়া, গণনাতীতকাল মৃত্তিকাগুপ্ত ছিল। তথাপি, আজ কতদিন পরেও স্তম্ভটীকে এমনি নূতন বলিয়া বোধ হয়, যে যেন কেহ এইমাত্র ইহাকে ভগ্ন-দশাপন্ন করিয়াছে। আমার একজন মাননীয় সঙ্গী সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এটা কখন এতদিনের পুরাণো নয়। নিশ্চয় কেউ নতুন তৈরি ক'রে, এটা এখানে বসিয়ে রেখে গেছে!"

স্তম্ভশীর্ষে শিল্পিগণ যে সিংহগুলি ক্ষোদন করিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে, প্রাচ্যশিল্পের একান্ত বিদ্বেষীকেও ইহাদের সজীবতা ও স্বভাবানুকারিতার জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হইবে। সিংহগুলির পায়ের উপরে শিরা-উপশিরার প্রাকৃতিক অবস্থানও যথাযথরূপে ক্ষোদিত হইয়াছে। প্রাচ্যশিল্পিগণ যে প্রাকৃতিক মূর্ত্তিগঠনে অক্ষম ছিলেন না (অন্যত্র, যেখানে তাঁহারা স্বভাবানুগামিতার পরিচয় প্রদান করেন নাই, তাহা যে তাঁহাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়—পরন্তু তাহা যে তাঁহাদের ভিন্ন আদর্শাবলম্বিতার জন্য) এই স্তম্ভই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। (১) জানিনা, সারনাথে এমন শিল্প আরও কত ছিল! আজ কালের তামসী যবনিকায় সকলই অদৃশ্য,—যাহা আছে, তাহাও সম্পূর্ণ নয়,—তাহার মসৃণতা গিয়াছে,—তাহার চারুগঠন গিয়াছে—তাহার কারুশিল্প গিয়াছে—অহৃদয়িক মানব তাহাকে অবহেলা করিয়াছে—কেবল মৃত্তিকা তাহাকে আপন নিভৃত হৃদয়ের অন্তরালে আশ্রয় দিয়াছে,—এত দুর্দ্দশার পরেও তাহাদের যে মনোরমা মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে,—তাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে এবং জানাইয়া দিতেছে, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল বালির ঘরই বাঁধেন নাই,—নিরাধার গগনে কেবল পুষ্পোদ্যান রচনার স্বপ্ন দেখেন নাই; পরন্তু শিল্পের আনন্ত্য তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার ভিতরে প্রাণ-সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। তাই পূর্ব্বগৌরববিচ্যুত হইলেও, তাঁহারা আপনাদের মানসীর পাদ-পদ্মে যে নিরবদ্য নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, অদ্যাও তাহা জনমনোমোহকর।

ধামেকের দক্ষিণদিকে, দুই হাজার পাঁচশত ফিট দূরে, আর একটী প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ইহার শীর্ষে একটী অষ্টকৌণিক ভবন আছে। দূর হইতে দেখিলে, স্তূপটীকে সহজেই পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়।

(১) আর্য্যশিল্পীয় প্রাকৃতিকতা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা আমি ভিন্ন প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছি। ১৩১৬ সালের 'ভারতী'র ৪র্থ ও ষষ্ঠ সংখ্যায় মৎলিখিত "ভারতীয় চিত্রকলা" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইহার প্রাচীন নাম, চৌখণ্ডী। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা ইহাকে "লোরি-কি-খুদন" বলিয়া ডাকে। জনপ্রবাদ বলে, এখানে লোরিক নামে এক আহীর ছিল,—সে এই স্তূপের উপর হইতে অন্য স্তূপে (সম্ভবতঃ ধামেকে) লাফাইয়া যাইত। (১)

কিন্তু আর একজন বলেন, লোরিক নামে একব্যক্তি, ইহার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল, এবং সেই হইতে এই স্তূপটী পূর্ব্বোক্ত নামে বিখ্যাত। (২)

কানিংহাম বলেন,—

"আমি যখন আগে বেনারসে থাকিতাম, তখন সকলে ইহাকে 'চৌখণ্ডী' নামেই জানিত। তাহার পর, আমি আবার যখন এখানে আসিলাম, দেখিলাম, ইহার পুরাতন নাম, সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। এখন ইহাকে সকলে "লূরিকা-খোদন" নামে জানে।" (৩)

স্তূপের অংশটী ৭৪ ফিট উচ্চ। তাহার উপরে যে অষ্টকৌণিক বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উচ্চতা ২৩ ফিট আট ইঞ্চ। অতএব, স্তূপের ভূমিসংলগ্ন মূল হইতে গৃহ-বলভিকা অবধি উচ্চতায় ৯৭ ফিট আট ইঞ্চ। দ্বারের উপরে একটী লিপি আছে, তাহাতে উল্লিখিত, সম্রাট হুমায়ুনের স্তূপারোহণ স্মরণীয় করিবার জন্য, এই বাটীটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

য়ুয়ন্-চুয়াঙের বর্ণনা হইতে জানা যায়, যে এখানে আগে অনেকগুলি স্তূপ বা প্রাসাদ ছিল। এখন তাহার মধ্যে কয়েকটী মাত্র দেখা যায়। য়ুয়ন্-চুয়াঙ, সারনাথের প্রধান স্তূপ হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে আর একটী স্তূপ দেখিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ, এই চৌখণ্ডী স্তূপকেই তাঁহার বর্ণিত স্তূপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু য়ুয়ন্-চুয়াঙ লিখিয়াছিলেন, এই স্তূপটীর উচ্চতা ৩০০ শত ফিট। সম্ভবতঃ, কালপ্রভাবে, এই স্তূপের উচ্চতা-গৌরব খর্ব্ব হইয়াছে। (৪) য়ুয়ন্-চুয়াঙ বলিয়াছেন, এই স্তূপটী নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বস্তুর দ্বারা মণ্ডিত ছিল। কিন্তু এখন তাহাদের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

উপরের অষ্টকৌণিক ভবনটীর ছাদে উঠিবার জন্য সোপান আছে।

(১) Benares Guide book. By an Old Resident. P. 93.

(২) The Sacred City of the Hindus. By Rev. M. A. Sherring M.A., L.L.B.

(৩) Cunningham's Archaeological Survey of India. 1862—63—64—65. Vol. I. P. 117.

(৪) Cyclopaedia of India. By Balfour. P. 538.

ভিতরের কামরায় গবাক্ষেরও অভাব নাই। কুট্টিমতল বিদীর্ণ করিয়া একটী গহ্বর বহুতলনিম্নে চলিয়া গিয়াছে। গর্ত্তের উপরটা নিরাপদ করিবার জন্য রেলিং দিয়া ঘেরা। গর্ত্তের ভিতরটা ভয়ানক অন্ধকার—দিবাভাগেও কিছু দেখা যায় না। স্তূপের একাংশে খিলানের মত একটী অতিবৃহৎ গহ্বর—সম্ভবতঃ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক খনিত। তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না।

আগামীবারে সারনাথ ও বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আলোচনা করিব।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আহ্বান।

(টেনিসনের মড্ হইতে অনূদিত)

পায় পায় পায় রজনী পলায়,
লুটায় তিমির আঁচল খানি,
এস প্রিয়া এস কুসুম কাননে
এখনো ঘুমায় প্রকৃতি-রাণী,—
কুলায়ে ক্বচিৎ জাগিছে বিহগ,
এখনো ফোটেনি' কাহারো বাণী!

২

এস এস মোর রূপসী প্রেয়সী,
রয়েছি বসিয়া সরসী-তীরে,
দূর নীলিমায় মলিন তারকা
একে একে একে নিবিছে ধীরে,
নিশা অবসানে বিরহে কুমুদ
বিষাদে পড়িছে ঢলিয়া নীরে!

ধবল বরণ মেঘের লহরে
আলোক ঈষৎ পড়িছে লুটি,
ঝুরু ঝুরু বহে মেদুর সমীর,
শুকতারা আছে এখনো ফুটি,
কত সুখ তার তরুণ অরুণে—
প্রেমের আবেশে যেতেছে টুটি!

৪

এস প্রিয়া ত্যজি মুরজ মুরলী,
সরস সেতার, বিরহ গান;
তোমারি লাগিয়া সারাটা যামিনী
আকুল হৃদয় কাতর প্রাণ;
গহনে বিহগ সাধিতেছে সুর,
ঝরণায় ঝরে মধুর তান!

৫

দেখ এস প্রিয়া নলিন নয়না
যেথায় ভ্রমিতে প্রমোদ ছলে,
মধু বরষায় কি শীত শরতে
লাবণি লহরী উছলি চলে;
এই উপবন তোমার মিলনে
অমরা আছিল অবনী তলে!

৬

ঘুমের আলসে শিথিল ব্রততী,
এখনো নিঝুম বিটপী দল,
অদূরে বহিছে স্বপন মাখান
গিরি তটিনীর স্ফটিক জল;
জেগেছে কামিনী কুসুমে সুরভি
আমোদিত করি কানন তল!

৭

ফুলবন দ্বারে দিল পথ ছাড়ি,
হেলিয়া দুলিয়া লতিকা রাজি,
আসিতেছে মোর প্রেমের প্রতিমা,
সোণার করেতে ফুলের সাজি;
চাহিছে শেফালী নিঃশ্বসি তাই,
বেলা বলে বেলা হয়েছে আজি।

৮

আসিছে তরুণী ফুলবীথি দিয়া
মলয়া যেমন শ্যামল বনে;
চকিত জীবন প্রিয়া সমাগম
পেরেছে বুঝিতে আপন মনে।
শত যুগ যদি রহিতাম মৃত
তবুও হৃদয় কাঁপিয়া উঠি,
অশোকের রাঙ্গা প্রসূন হইয়া
ও প্রেম পরশে উঠিত ফুটি!

শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ।

বর্ণশিক্ষা ও যোজনা।

সংস্কৃত ও বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণমালা পাইয়াও বাঙ্গলার বর্ণমালা অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য ভাষার শব্দ শিক্ষা করিতে যেরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হয়, সংস্কৃত বা তৎসম বা তদ্ভব ভাষা শিখিতে তাদৃশ পরিশ্রমের কোন প্রয়োজনই ঘটে না। তথাপি আমরা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধির দোষে আমাদের শব্দ শিক্ষা প্রণালীটাকে অতীব কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিয়াছি। যাঁহারা প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে বর্ণমালা ও বর্ণযোজনা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, এমন সরল বর্ণমালা পাইয়াও আমরা তাহাদের শিক্ষা ব্যাপারটা কিরূপ ভীষণ করিয়া তুলিয়াছি। যেখানে কেবল 'উ' বলিলে চলে, সেখানে 'হ্রস্ব উ' বলাইব। 'উট' পড়াইতে 'হ্রস্ব উ আর ট উট' এইরূপ পড়াই। ছেলেরা বুঝিতে পারে

না 'হ্রস্ব উ'র 'হ্রস্ব' টা গেল কোথায়? তাই তাহাদের প্রতিপদেই সন্দেহে পড়িতে হয় এবং শিক্ষাটাও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না। 'দন্ত ন আর খ' মিলিয়া 'দন্ত নখ' হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া কেবল 'নখ' হয় কিরূপ করিয়া, তাহা ভাবিয়া উঠা বাঙ্গালী বালকের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'ঈষৎ' 'শয়ন' প্রভৃতি শব্দ শিক্ষা আরও কষ্টকর।

আমরা প্রতি নিয়তই এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর দোষ দেখিতে পাইতেছি, তথাপি তাহার সংস্কার করা আদৌ প্রয়োজন মনে করি না, অথবা তাহা উপেক্ষা করাই আমাদের স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা-প্রণালীটাকে যদি সহজ করিয়া তোলা যায়, তবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই বহু পরিশ্রম ও সময় বাঁচিয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস, একটু যত্ন করিলেই শিক্ষা-প্রণালীটা আশানুরূপ সহজ করিতে পারা যায়।

স্বরবর্ণ শিখাইবার সময় আমরা হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ প্রভৃতি ভাবে না পড়াইয়া উভয় বর্ণের উচ্চারণ ভেদ শিখাইলেই গোল মিটিয়া যায়। সেইরূপ বর্গীয় জ, অন্তঃস্থ য, মূর্দ্ধণ্য ণ, দন্ত ন, বর্গীয় ব, অন্তঃস্থ ব, তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য ষ ও দন্ত স প্রভৃতি ভাবে না পড়াইয়া প্রত্যেকের যথার্থ উচ্চারণ শিখান প্রয়োজন।

এইরূপ ভাবে প্রত্যেক বর্ণের যথার্থ উচ্চারণ জানিলে বর্ণযোজনা শিক্ষা করা আর কঠিন ব্যাপার থাকে না। শিক্ষার্থীরা তখন অতি সহজেই তাহা শিখিয়া ফেলে। তাহাতে তাহাদের পরিশ্রম ও সময় যে কত বাঁচিয়া যায়, তাহা বলিবার নহে, আবার তৎসঙ্গে তাহাদের আনন্দও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

'জল' পড়িতে যাইয়া 'বর্গীয় জ আর ল' না পড়িয়া যদি পড়ে 'জ আর ল', 'দশ' পড়িতে 'দ আর তালব্য শ' না পড়িয়া যদি 'দ আর শ' পড়ে, তবে শিক্ষা ব্যাপারটা কেমন সহজ ও আমোদজনক হইয়া উঠে! অলস, আসন, ইতর, ঈষৎ, অবশ, সরল, দশন, শয়ন, শরণ, চরণ, বসন, অনশন প্রভৃতির বর্ণযোজনা তাহারা এখনকার অপেক্ষা কত সহজে ও আমোদের সহিত শিখিয়া ফেলে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

'কাক' পড়িতে 'ক এ আকার ক কাক' না পড়িয়া, সেইরূপ 'তিল' পড়িতে 'ত এ হ্রস্ব ই ল তিল' না পড়িয়া, যদি ছেলেরা অগ্রে 'ক এ আ কা', 'খ এ আ খা', 'ক এ ই কি' 'খ এ ই খি' এইরূপ স্বর যোজনা শিখিয়া 'কা আর ক কাক' এইরূপে পড়ে, তবে কাক, কাপাস, তাড়না, যাতনা, তিল, চিনি, নিধি, কীট, ধীর, ধনী, শশী, গভীর, অধীন, সুখ, কৃত, ঘৃত, তৃণ, মেষ, শেষ, নৈশ, শৈষ,

ভোজন, অশোক, কৌশল, রাশী, সীমা প্রভৃতি শক্ত বানান-যুক্ত শব্দ শিক্ষার জন্য বেগ পাইতে হয় না। যেমন সহজে অজ, আম, ঘট শিখিবে, তেমনি সহজে ঐগুলিও শিখিয়া ফেলিবে। এখন যেখানে পাঁচ দিন সময় লাগে, তখন সেখানে অনধিক একদিন সময়ই যথেষ্ট হইবে। কেবল গোড়াটা ঠিক্ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। বর্ণের উচ্চারণ ঠিক্ করিয়া স্বর যোজনা শিক্ষা করিলেই অতি অল্পকাল মধ্যে 'বর্ণপরিচয়ের' প্রথমভাগ শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

বাঙ্গলা ভাষার স্বরবর্ণ সম্বন্ধে আর একটা কথা বিশেষ ভাবে বিচার করা আমাদের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেদের '৯' কার শিখান হয়, অথচ বাঙ্গলায় ৯ কারের কোন ব্যবহার নাই। ইহার শিক্ষা উঠাইয়া দিলে দোষ কি? 'এক' উচ্চারণ করিতে আমরা 'এ' কারকে যেরূপ বিকৃত করি, সেরূপ বিকৃত 'এ' কারের একটা ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করিয়া লইতে আপত্তি কি? আজকাল কেহ কেহ 'দেখা' না লিখিয়া 'দ্যাখা' লেখেন—উচ্চারণ ঠিক্ রাখিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাহাতেও কি উচ্চারণ ঠিক্ থাকে? ঠিক্ ভাবে উচ্চারণ করিলে 'দ্যাখা' অনেকটা 'দিয়াখা' হইয়া উঠে। বিকৃত 'এ' কারের কোন ভিন্ন রূপ না থাকায়, কি গোল হইয়াছে দেখুন—'হ' এ য ফলা দিয়া বাঙ্গলায় হ্য (ঝ্) করা হয় (যদিও তাহা প্রকৃত উচ্চারণ নহে)। হেলি সাহেবের ধূমকেতু লিখিবার সময় অনেকেই তাহা ভুলিয়া যাইয়া 'হে' স্থলে 'হ্যা' করিয়াছেন। সুতরাং 'হেলির' স্থলে হ্যালি (ঝেলি) হইয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ হেরিসন, হেক্স্‌লি, হ্যারিসন, হ্যাক্স্‌লি হইয়াছেন। সুতরাং বৈদেশিক শব্দ বাঙ্গলায় লিখিবার জন্য বিকৃত 'এ'কারের একটা বিভিন্ন রূপের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। 'এ' কারের পেট কাটিয়া দিয়া (এ) কিংবা তাহার নীচে একটা সমরেখা (এ̱) টানিয়া বিকৃত 'এ'কারের রূপ সৃষ্টি করিলে ক্ষতি কি?

বাঙ্গলায় এমন কতকগুলি যুক্তবর্ণ আছে, যাহাদের রূপভেদ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে। 'ক্র' ও 'ক্রু', 'স্তু', 'স্তু' ও 'স্ত' ভুল অনেক সময়েই হইয়া থাকে—অবশ্য ছাপায়। যে সকল যুক্ত বর্ণে এইরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে, সেইগুলির একটু সামান্য রূপান্তর করিলে দোষ কি? সেটা কি নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার?

বাঙ্গলায় বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব এর কোনরূপ রূপভেদ নাই। যদি রূপভেদ করা যায়, তবে বৈদেশিক ও হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি শব্দ ঠিক্ ভাবে লিখিবার পক্ষে বড় সুবিধা হয়। অন্যথা অন্তঃস্থ ব এর স্থলে 'ওয়া' লিখিতে হয়। যেমন

পার্সী 'বাজিদ্' বাঙ্গলায় 'ওয়াজিদ্', গুরুমুখী 'বাহি' বাঙ্গলায় 'ওয়াহি', 'মুখ-বাল' বাঙ্গলায় 'মুখওয়াল' হিন্দী 'গবালীয়র' বাঙ্গলায় 'গোয়ালীয়র' না লিখিলে উচ্চারণের দোষ ঘটে। এরূপ স্থলে প্রকৃত বানান রক্ষা করা বাঙ্গলায় সম্ভব হইয়া উঠে না। এজন্য বাঙ্গলায় অন্তঃস্থ 'ব' এর একটা ভিন্ন রূপ থাকা প্রয়োজন। দেবনাগরীর অন্তঃস্থ ব যদি আমরা ধার করিয়া লই, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু আছে কি?

ছাপাতে বাঙ্গলা 'ঘ' যেরূপ ভাবে লিখিত হয়, তাহা হাতে লেখা বড়ই আয়াস ও সময়সাধ্য; ছেলেরা ত প্রথমে লিখিতেই পারে না, তাহাদের সুবিধার জন্য তাহার কোনরূপ বিকৃতি (যেমন, W) সম্পাদন করিতে হয়। আর বয়ঃস্থেরা ত' প্রকৃত রূপ লেখেন না; তাঁহাদের লিখিত রূপ অনেকটা হিন্দী ঘ (ঘ) এর মত। যখন অবস্থা এইরূপ, তখন বাঙ্গলা ছাপা পুস্তকে সহজ-লিখন-সাধ্য হিন্দী ঘ এর নবরূপ প্রবর্ত্তনা করিলে দোষ কি? এই নবরূপ ছেলেরা অল্পায়াসেই লিখিতে পারে।

বাঙ্গলা ভাষা শিখাইবার আর একটা দোষ এই দাঁড়াইয়াছে যে, অগ্রে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের নাম শিখাইয়া ও তাহাদের রূপ দৃষ্টিসাহায্যে চিনাইয়া একেবারে বর্ণযোজনা শিখান হয়। বর্ণযোজনা শিখিবার সময়, ছেলেরা একটু একটু করিয়া বর্ণগুলি লিখিতে শিখে। ইহাতে দ্বিগুণ পরিশ্রম স্বীকার করান হয়। এইরূপ না করিয়া যদি রূপ লিখাইয়া চেনান হয়—কেবল দেখাইয়া নহে, তবে তাহা অতি সহজেই আয়ত্ত হয়, এবং ভুল হইবারও আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এইরূপে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি লিখিতে-লিখিতে শিখিয়া ফেলিবে। এইরূপ ভাবে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ শিক্ষা শেষ হইলে একেবারে স্বরে ব্যঞ্জনে বা ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে যোজনা না শিখাইয়া (যেমন অজ, কর, খল, ঘট), ব্যঞ্জনের সহিত স্বর যোজনা করিলে যেরূপ হয়, তাহা শিখান প্রয়োজন। যেমন,

ক+আ=কা	খ+আ=খা
ক+ই=কি	খ+ই=খি
ইত্যাদি।	ইত্যাদি।

এই ব্যঞ্জন-স্বরের যোজনা শিক্ষা হইলে পর স্বরে ব্যঞ্জনে বা ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে যোজনা শিখাইতে হইবে। যেমন,

অ+জ=অজ।	তি+ল=তিল।
ক+র=কর।	বৌ+মা=বৌমা
আ+ক=আক।	দৈ+ব=দৈব।

প্রথমে দুই বর্ণের সংযোগ শিখাইয়া, শেষে তিন বর্ণের ও পরে ক্রমশঃ বহুতর বর্ণের সংযোগ শিখাইলে ভাল হয়। যেমন, অ+জ=অজ, মা+মা= মামা, চি+নি=চিনি প্রভৃতি শিখিয়া, দশ+ম=দশম, কাপা+স=কাপাস প্রভৃতি শিখিবে। তৎপরে অনশ+ন=অনশন, জলচ+র=জলচর, অনুপা+য়=অনুপায়, শিখিবে। এইরূপে ক্রমে অবিবেচনা, পারলৌকিক, পরিবেদনা প্রভৃতি বড় বড় শব্দ শিখিবে।

এখানে মা+মা=মামা পড়িবার সময় 'ম এ আকার মা আর ম এ আকার মা মামা' রূপে পড়িবে না। ম এ আকার দিলে যে মা হয়, তাহা আগেই শিখান হইয়াছে। এখন একেবারে 'মা আর মা মামা' পড়িবে। সেইরূপ 'চ এ ই কার চি, আর ন এ ই কার নি চিনি' পড়িবে না। দশম পড়িবার সময় 'দ আর শ দশ আর ম দশম' এরূপ পড়িবে না। 'দ আর শ' দিলে যে দশ হয়, তাহা আগেই শিখিয়াছে। এখন 'দশ আর ম দশম' এইরূপ পড়িবে। এইরূপে একেবারে 'জলচ' আর 'র' জলচর পড়িবে। বলা বাহুল্য, এরূপ স্থলে দন্ত ন, মূর্দ্ধণ্য ণ, তালব্য শ, দন্ত স, হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ই প্রভৃতি বলিতে দেওয়া হইবে না, কেবল ণ, ন, শ, স, ই, ঈ, বলিবে। আর একটা কথা, শব্দ শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিখিয়া মুখস্থ করিবে, কেবল মুখে মুখে নহে।

এখন যেরূপ ভাবে পড়ান হয়, তাহাতে ছেলেদের শব্দ শিখিতে যেমন কষ্ট, বাক্যাংশ ও বাক্য শিখিতে তদপেক্ষা আরও কষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক শব্দের বানান করিয়া পড়িতে পড়িতে শিশুরা পূর্ব্বের শব্দগুলি ভুলিয়া যায় ও একেবারে বাক্যটা পড়িতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না। 'রাম আমাদের বাড়ী যাইবে' এই কথা মুখে বলিবামাত্র সব শিশুই সহজে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহাকে পড়িতে দিলেই সে 'র এ আকার ম রাম, আ+ম এ আকার মা আমা, দ এ একার দে আমাদে আর র আমাদের' এরূপ ভাবে পড়িয়া যাইবে, কাজেই বাক্যটার অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অনেকবার ঐরূপ পাঠের পর বাক্যটা মুখস্থ হইয়া যাইলে, তবে উহার অর্থ বুঝা তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু নবপ্রণালীতে পড়াইলে তাহারা দৃষ্টিমাত্রেই পড়িবে 'রাম—আমাদের—বাড়ী—যাইবে' একবারও বানান করিতে যাইবে না, এবং অল্পায়াসেই বাক্যটি পড়িতে পারিবে। ইহাতে সময় ও আয়াসের সংক্ষেপ যথেষ্টই হইবে।

আমাদের বিশ্বাস, যদি এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীদের শব্দ শিখাইবার বন্দোবস্ত

করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের আমোদ যেমনই বৃদ্ধি পাইবে, তাহাদের শিক্ষা তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সরল হইয়া উঠিবে। এখনকার কালে শব্দ শিক্ষা ব্যাপারটা তাহাদের 'উৎপীড়ন'-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য আমরা কি এইটুকু সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইব না? বর্ণ লিখিতে ও চিনিতে যে সময় যাইবে, সেটুকু আপাতঃ দীর্ঘ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা দীর্ঘ নহে। কারণ, ইহাতে এক সঙ্গেই বর্ণ চেনা ও লেখা উভয়ই শিক্ষা হইবে। একবার চিনিয়া পরে আবার লিখিতে শিখিতে হইবে না। তারপর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শিক্ষা শেষ হইলেই তাহাদের যোজনা শিক্ষা এখনকার অপেক্ষা বহুতর গুণে দ্রুত হইবে। সে যোজনা শিক্ষায় সময় সংক্ষেপ ত' বটেই, যথেষ্ট আমোদও জন্মিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের উপেক্ষার ভাব ও জড়তা দূর করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মতৎপর করিয়া তুলুন, আমরা অন্যান্য সৎকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের শিক্ষা ব্যাপারটাও আমোদজনক ও সহজ করিয়া তুলি।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর।

প্রাচীন জাতি মাত্রেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। সে হিসাবে মিশরবাসী ও হিন্দু আর্য্য উভয় জাতিই সঙ্গীত ভাল বাসিত। মিশরে সঙ্গীতের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। তবে মিশরের মন্দির প্রাচীর খোদিত চিত্রাবলীতে বীণার মত যন্ত্র হস্তে গায়কগণের চিত্র পাওয়া যায়। প্রতি উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথিগণের চিত্তবিনোদনের জন্য গৃহস্বামী তাহাদিগকে ফুলমাল্য, মিশরের শ্রেষ্ঠ ফুল প্রভৃতি প্রদান করিয়া, প্রত্যেক আমন্ত্রিতকে অর্পণ করিতেন এবং সকলকে গীতবাদ্যে পরিতুষ্ট করিতেন। তবে ভারতে কলাবিদ্যার প্রসারের সহিত যে সকল বিদ্যার অনুশীলন হইয়াছিল তাহা মিশরে হয় নাই।

হিন্দুগণ আপনাদের শাস্ত্রে সঙ্গীত-বিদ্যাকে যেরূপ উচ্চস্থান দিয়াছে সেরূপ উচ্চস্থান এ বিদ্যা কোনও দেশে পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সমগ্র বেদগাথা প্রাচীন ঋষিগণ গান করিয়া আপনাদিগের জাতির জীবন স্রোত উচ্চদিকে প্রবাহিত

করিবার প্রয়াস করিতেন। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা হস্তে বীণা লইয়া গান করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেবও এ সঙ্গীতের রোলে বিষ্ণুত্বের সাধনা করেন। স্বর্গপতি ইন্দ্রদেবের উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমার সঙ্গীতের পরিচয় দিবার জন্য কত হিন্দুকবি সুললিত কবিতা রচনা করিয়া এ মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। মহামুনি বাল্মীকি অমৃতময় রামায়ণই প্রথমে কুশীলবের গীতরূপে রচনা করিয়াছিলেন। এমন কি বঙ্গদেশের গৌরব, প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম গান করিয়া পাপমলিন বাঙ্গালী জাতিকে অনু-প্রাণিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

অবশ্য ঠিক সঙ্গীতের বিষয়ীভূত বা সঙ্গীত হইতে উৎপন্ন না হইলেও নাটকাভিনয়ের সহিত কলাবিদ্যার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রাচীন ভারতের নাট্যাবলী চিরতরে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। যে দেশে যে জাতির মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকার জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি ধন্য। এ বিষয়ে প্রাচীন মিশরের গর্ব্ব করিবার কিছু নাই, এ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক জাতির নিকট সকল প্রাচীন জাতিকে নতশির হইতে হইবে।

গ্রীকজাতি মিশরের নিকট বহু বিষয়ে ঋণী ছিল তাহা তাহারা মুক্তকণ্ঠে [illegible]র করিয়াছে। কিন্তু মিশরবাসীর নিকট হইতে তাহারা কাব্য-রচনা করিতে শিখিয়াছিল বা নাটকাভিনয় করিতে শিখিয়াছিল, এ কথা তাহারা বলে নাই। মিশরে কাব্য বা নাটকের কোনও প্রকার অনুশীলন হইয়াছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণও নাই।

মিশরের সাহিত্য-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আধুনিক সাহিত্যানুরাগীর নিকট প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত; মিশর-তত্ত্ববিদ্‌দিগের বহুল আয়াসেও কিন্তু মিশরের লুপ্ত সাহিত্য উদ্ধার হয় নাই। তবে মিশরের মনীষীদিগের রচনাশক্তি বিচার করিবার উপযোগী যথেষ্ট উপকরণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন মিশরের সাহিত্য পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের বা গ্রীসের মত লিখন-ভঙ্গী তাহাদের মোটেই ছিল না। আর্য্য মনীষীদিগের যুগ যুগান্তর চেষ্টায় তাঁহারা তাঁহাদের আদরের দেবভাষা সংস্কৃতকে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ যেরূপ কঠোর নিয়মে দেবভাষার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল, সেই রূপ ধরিয়া সেই

ভাষায় সংখ্যাতীত প্রখ্যাতনামা অমর কবি যেরূপ সুললিত কণ্ঠে গীত গাহিয়া গিয়াছেন, রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক ঋষি জগতের নানাদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকল বিষয়ে যেরূপ প্রচুর জ্ঞানলাভ করিয়া জগতকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিয়া উঠে। ঠিক ঐ মাত্রায় সাহিত্য-বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিয়া না গেলেও প্রাচীন গ্রীক জাতিও সাহিত্য-জগতে এখনও বরণীয়। গ্রীক ভাষাও এত দিন ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর হর্ষের কারণ হইয়াছে। ভারতবর্ষে বীণাপাণির আশীর্ব্বাদে অনুপ্রাণিত হইয়া নবীন বিদ্যানুরাগী যেমন সংস্কৃত কাব্যকাননে মধু অন্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ইউরোপে আজিও তেমনই শত শত ছাত্র গ্রীক-সাহিত্য-মদিরায় বিভোর হইয়া আনন্দলাভ করে।

মিশরের সাহিত্যে উন্মাদক মদিরা মোটেই নাই। মিশরের সাহিত্যের সহিত গ্রীক ও আর্য্য সাহিত্যের তুলনাই হইতে পারে না। মিশরের ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতেও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কবিতা, ইতিহাস, ধর্ম্মগ্রন্থ, নীতিগ্রন্থ প্রভৃতি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগর বা ইশপের গল্পের বহির মত গল্পপুস্তকও মিশরের চিত্রলিপি-সাহায্যে রচিত হইয়াছিল। যেসকল পুস্তক আধুনিক জগতের হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে "মৃতের গ্রন্থ" * নামক গ্রন্থই মিশরের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে প্রধান। এ পুস্তকে অনেক প্রার্থনার একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ঐ সকল মন্ত্র হইতেই আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মবিশ্বাসসম্বন্ধে মতামত জানিতে পারিয়াছেন। নাইল নদী ও রাহারমচিস্‌ দেবতার উদ্দেশে লিখিত আবাহন-গীতিতে পণ্ডিতগণ একটু উচ্চ অঙ্গের কবিতার আভাস পাইয়াছেন। নীতিসম্বন্ধীয় পুস্তকগুলিরও ভাষা ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা হইতে একটু অধিক উচ্চ অঙ্গের। ইতিহাসগুলির দুই রকম ভাষা। যেগুলি রাজাদেশে লিখিত তাহা কর্তৃপক্ষদিগের স্তবস্তুতি গুণপনায় পূর্ণ। অপরগুলি সরল হইলেও তাহাদিগের মধ্যে সুপ্রণালীর অভাব। উপন্যাসগুলির মধ্যে "শেতনাওয়ের" গল্প নামক উপন্যাসে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রসের আস্বাদন পাইয়াছেন। সমস্ত মিশরের সাহিত্যের পরিচয় দিয়া একজন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—

"মিশরের সাহিত্যের একেবারে গুণ নাই এরূপ নহে। যেসকল জাতি অনেক লিখিয়াছে তাহাদের সাহিত্যে যেমন ভাবের উচ্চতা ও মনোহারিত্ব পরিলক্ষিত হয়, মিশরের সাহিত্য সেরূপ উচ্চভাব-সমন্বিত ও মনোহারী নহে।

* "Book of the Dead"

তাহাদের শিল্পবিদ্যার পারদর্শিতা বিবেচনা করিলে, মিশরবাসিগণ যে বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ে হিন্দুদিগেরও কৃতিত্ব অসাধারণ। তবে কোন্ জাতি অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মিশরবাসিগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের মন্দির ও পিরামিড প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কুশলতা দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহারা জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্রের অনেক সত্য করায়ত্ত করিয়াছিল। ঐ সকল বিশাল সৌধ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণেও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার আবশ্যক। বোধ হয় প্রাচীন মিশরবাসিগণ তাহাও শিক্ষা করিত। তবে তাহারা যে চিকিৎসাশাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিল সে বিষয়ে গ্রীক লেখকগণ ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের চিকিৎসাশাস্ত্র উৎকৃষ্ট তাহা আজিও নিত্য সপ্রমাণ হইতেছে। আজিও চরক, শুশ্রুত, ভাবদত্ত, বাগভট প্রভৃতি মনীষীর অনুগ্রহে সহস্র সহস্র ভারতবাসী উৎকট পীড়ায় শান্তিলাভ করিতেছে, অকালমৃত্যুর করাল কবল হইতে কতকটা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোনও জাতির ধর্ম্মমত বাহির হইতে বুঝিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আধুনিক জগতের চারিটি প্রধান ধর্ম্মের মতামত আমরা পরস্পর বুঝিয়া উঠিতে পারি না। খৃষ্টানের ট্রান্‌সাবষ্টান্‌সিয়েসনের মাহাত্ম্য খৃষ্টোপাসক যেমন বুঝে, মুসলমান তেমন বুঝে না। আবার মুসলমানের অজু বা নেমাজের মর্ম্ম তাহার এক পল্লীবাসী হিন্দু বা খৃষ্টান ঠিক তাহার মত বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হিন্দুর 'পুতুল পূজা' লইয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা কত পরিহাস করে, অথচ আমরা জানি কত ভক্ত প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের ভাবে গদগদ হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছেন। বৌদ্ধের নির্ব্বাণ অপরের নিকট এক প্রকার দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং আমরা সামান্য উপকরণ লইয়া একটা লুপ্তজাতির ধর্ম্মজ্ঞানের সমালোচনা করা বড় সহজ বলিয়া মনে করি না।

পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের ও মিশরের ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার ও উপাসনা প্রথায় অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা এস্থলে প্রখ্যাতনামা গ্রীক লেখক হেরোডোটাসের বর্ণনার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার বর্ণিত মিশরের অনেক রীতি আমাদের নিজেদের উপাসনা-রীতির বর্ণনা বলিয়া ভ্রম হয়। হেরোডোটাস বলেন—

অপর দেশের যাজকগণ লম্বা কেশ ধারণ করে, মিশরের পুরোহিতগণ চুল ছোট করিয়া কাটে। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকচিহ্নস্বরূপ চুল কাটিয়া ফেলা অপর দেশের পদ্ধতি; মিশরবাসীরা অপর সময় মস্তক মুণ্ডিত করে কিন্তু শোকের সময় কেশ ধারণ করে। অপর জাতি তাহাদের আবাস-স্থলে জন্তু আসিতে দেয় না; কিন্তু মিশরবাসীরা তাহাদের সহিত একত্র বাস করে…। যেসকল দেশে মিশরের পদ্ধতি প্রবেশ করিয়াছে, সে সকল প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র ভগবান বালকদিগকে যেরূপ গঠন করিয়াছেন তাহাদিগকে সেইরূপ থাকিতে দেওয়া হয়; ইজিপ্টিয়েরা কিন্তু তাহাদিগকে সুন্নত (circumcise) করিয়া দেয়।…তাহাদের দুই প্রকার বর্ণমালা আছে—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথার জন্য একপ্রকার ও অপরাপর বিষয়ের একপ্রকার (hieroglyphic এবং hieratic লিপি)।

তাহাদের দেবদেবীর উপর তাহাদের ভক্তি অতীব কুসংস্কার বিজড়িত। পিতলের পাত্রে পান করা এবং ঐ পাত্র প্রত্যহ পরিষ্কার করা তাহাদের একটা রীতি। তাহারা এত পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে যে, তাহারা কেবল নবধৌত সুতার কাপড় ভিন্ন পরিধান করে না। ……যাহারা দেবসেবায় নিযুক্ত থাকিবে পাছে তাহাদের গাত্রে কোনরূপ ময়লা বা কৃমি থাকে, এই ভয়ে তাহাদের পুরোহিতেরা দুইদিন অন্তর সর্ব্বাঙ্গ মুণ্ডন করিয়া লয়। আর যাজক শ্রেণীর কেবল এক প্রকারের পরিচ্ছদ দৃষ্ট হয়। তাহারা একটি মাত্র সুতার জামা পরিধান করে ও বিবলাস পত্রের পাদুকা ব্যবহার করে। তাহারা দিনে দুইবার ও রাত্রে দুইবার শীতল জলে স্নান করে। তাহাদের ধর্ম্মের রীতির পরিচয় দেওয়া বাস্তবিকই দুরূহ। তাহারা কুসংস্কারের সহিত অতি বিশদভাবে প্রত্যেক রীতিটির অনুষ্ঠান করে। এই সকলের জন্য পুরোহিতগণ অনেক সুবিধা পাইয়া থাকে। তাহাদিগকে গৃহের অন্ন খাইতে হয় না। তাহারা প্রত্যহই তৈয়ারী খাদ্য পাইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত তাহারা প্রত্যহ গোমাংস, হংসমাংস ও মদ্য পায়; তবে তাহাদিগকে সুরাপান করিতে দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক দেবতার সেবার জন্য অনেকগুলি করিয়া যাজক থাকে এবং তাহাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ একজন সকলের উপর নেতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। কেহ মরিলে তাহার পুত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়।

এপাকিসের নিকটে বৃষকে তাহারা পবিত্র বলিয়া মনে করে। বলি দিবার পূর্ব্বে তাহারা ষণ্ডকে অতি সাবধানে পরীক্ষা করে। যদি তাহার শরীরে একগাছি কাল চুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সে ষাঁড়টিকে অপবিত্র মনে করে।……এইরূপ পরীক্ষার পর যদি সেই ষণ্ডটি নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে পুরোহিত তাহার শৃঙ্গে বিবলাস-বল্কল বাঁধিয়া দেয়। তাহার পর তাহারা মৃত্তিকা দ্বারা উহার গাত্রে মোহরাঙ্কিত করিয়া দেয়। এই মোহরাঙ্কন এত আবশ্যক, যে ইহা ব্যতীত কোনও জীবকে হত্যা করিলে নরহত্যার সমান পাপ হয়।

এইরূপে নির্ব্বাচিত জন্তুকে বেদীর নিকট লইয়া গিয়া তাহারা এক অগ্নি প্রজ্বলিত করে। বেদীর উপর সুরা ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর দেবতাকে আরাধনা করিয়া তাহারা জন্তুটিকে হত্যা করে এবং উহার মস্তক কাটিয়া দেহ হইতে ছাল ছাড়াইয়া লয়। ঐ মস্তকটিকে

অভিশপ্ত করিয়া—যাহাদের নিকটে বাজার আছে তাহারা ঐ খণ্ডিত শিরটিকে বাজারে লইয়া গিয়া গ্রীক ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করে। যাহাদের এ সুবিধা নাই তাহারা মস্তকটি নদীর জলে ফেলিয়া দেয়। যাহারা বলি দেয় তাহাদের বা মিশরের সাধারণতঃ সমস্ত অমঙ্গল ঐ খণ্ডিত পশুশিরের উপর দিয়া কাটিয়া যায়, ইহাই তাহাদের ধারণা।......কোনও মিশরবাসী কোনও জন্তুর মস্তক ভক্ষণ করে না।

যে দেবীকে তাহারা সর্ব্বাধিক অধিক ভক্তি করে এবং যাঁহার সম্মানার্থ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উৎসব হইয়া থাকে তাহার এক্ষণে বিবরণ দিব। প্রথমে প্রার্থনাদি করিয়া তাহারা একটি ষাঁড় বলিদান করে। তাহারা তাহার ছাল ছাড়াইয়া, নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া লয়। পরে উহার পদ, স্কন্ধ, গ্রীবা এবং কোমরের অগ্রভাগ প্রভৃতি কাটিয়া ফেলে। অবশিষ্ট দেহে ভাল রুটি, মধু, কিচমিচ, ডুমুর, কুন্দর এবং নানাপ্রকার মশলা ভর্ত্তি করিয়া অগ্নিসংযুক্ত করে এবং উহার উপর তৈল প্রদান করে। দর্শকবৃন্দ সমস্তদিন অনশনে থাকিয়া ঐ পাককর্ম্মের সময় আপনাদিগকে বেত্রাঘাত করে।

তাহার পর তাহারা সেই বৃষ মাংস ভক্ষণ করে। বৃষ ও বৎস এইরূপে বলি দেয়। গাভী আইসিস দেবীর পবিত্র বলিয়া তাহারা গাভী বলিদান করে না। এই দেবী গ্রীকদিগের আয়োর মত অঙ্কিত হয়। ইহার মস্তকে দুইটি শৃঙ্গ আছে। সেই জন্ত সকল তৃণজীবী পশুর মধ্যে ইজিপ্তিয়গণ গাভীকে পূজা করে। ...এই পশু মরিলে তাহারা গাভীগুলিকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করে এবং বৃষগুলিকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখে এবং চিহ্নস্বরূপ তাহার শৃঙ্গ দুইটি জমির উপরে বাহির করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া দেয়।...

থীববাসীগণ এবং থীবের জুপিটরের উপাসকগণ ছাগ বলিদান করে, কিন্তু মেষের মাংস খায় না। ...মেণ্ডিসের মন্দিরে এবং সেই প্রদেশে ছাগ রক্ষিত হয় মেষ বলি হয়।

মিশরবাসিগণ শূকরকে অপবিত্র বিবেচনা করে। যদি তাহারা দৈবাৎ কোনও শূকরকে স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহারা বস্ত্রাদি সহিত নদীতে অবগাহন স্নান করে। ...বেকাস এবং লুনার মন্দিরে তাহারা শূকর বলি দেয়।

ক্রমশঃ

কেন হাহাকার?

কেন হাহাকার?
কেন আঁখি ছল ছল, বাঁধিতে পার না বল,
বুঝেছ কি জীবনের রহস্ত অপার?

এই হাসি অশ্রুমাখা, ইন্দ্রধনু রঙ্গে আঁকা,
নন্দন স্বপনে ঢাকা সোণার সংসার,
শেষ এই—সার এই, নেই নেই—কিছু নেই—
এ জগতে আর কিছু নাহি জুড়াবার ?
আসি এ স্বপন-পুরে, সাধ যদি নাহি পূরে
এ জীবন-অমানিশি সব অন্ধকার !
বজ্রশিখা টেনে আনি, প্রাণে শত শেল হানি'
দুঃখ গড়িতেছে মরু চির যন্ত্রণার ?
এই কথা সার ?

মিথ্যা এ কল্পনা !
ওযে পাগলের কথা, বৃথা মর্ম্ম-ব্যাকুলতা
শিশুর রোদন শুধু হারায়ে খেলনা।
সংসার সমরে যুঝি, মাণিক দেখনি খুঁজি
ধরেছ মণির লোভে ফণিণীর ফণা !
ফেলিয়া সোণার কাঠি, হাতে লয়ে ধূলামাটী
করেছিলে শিশুসম স্বপন-রচনা।
সে স্বপ্ন হয়েছে শেষ, তাই দুঃখ তাই ক্লেশ
তাই অভিমান ভরে আত্ম-প্রবঞ্চনা ?
অতৃপ্তি অনল জ্বালি, শ্মশান গড়েছ খালি,
বোঝনি এ জগতের দুঃখ কি সাধনা !
মুগ্ধ আনমনা !

চাও ফিরে চাও,
দেখ ক্ষুদ্র বিন্দুমাঝে, কি অনন্ত সিন্ধু রাজে,
কি মহা সঙ্গীত বাজে যাও ডুবে যাও,
ওই বজ্রশিখা ধরি, দেখ পাতি পাতি করি,
নিখিল দুর্লভ নিধি পাও কি না পাও।
চিরকাল কূলে পড়ি কুড়ালে ঝিনুক কড়ি
খুঁজিলে না বুঝিলে না কি মাণিক চাও ;

আত্মার অতল তলে, কত না কৌস্তুভ জ্বলে,
পারিজাত সুধাফলে, —যতনে কুড়াও।
কেন দুঃখ কেন ভয়, এ বিশ্ব আনন্দময়
মোহের ছলনে কেন আপনা হারাও
যাও ডুবে যাও।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সৃষ্টি রহস্য—শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৲। Eastern Publishing Co. প্রকাশিত। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভ হইতেই অনেক বিদুষী বঙ্গ-কুললনা সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা সাধারণতঃ কাব্য, কবিতা এবং উপন্যাসেই বিকসিত হইয়াছে। দুর্ব্বোধ্য দর্শনরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালা দর্শন সাহিত্যে সাম্রাজ্ঞী হইবার উচ্চাশা কোনও লেখিকা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইদানীং শ্রীমতী ফুলকুমারীই এ সাধনায় প্রথম ব্রতী হইয়াছেন। এই প্রথম উদ্যমেই অতি সহজে তিনি এ বিভাগে কেবল তাঁহার ভগ্নীদিগের মধ্যে কেন তাঁহার পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যেও অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার "সৃষ্টি রহস্য" শাখ্য, পাতঞ্জল বা মনুসংহিতার টীকা নহে, ইহাতে পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত বা ইংরাজী কোটেসান নাই, ইহাতে পরস্পর বিরোধী পাঁচ মতের নির্ঘণ্ট দিয়া শেষে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির জজীয়তী নাই। পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় লেখিকা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র অতি গভীর ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন; এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তড়িত প্রবাহ প্রভৃতির গুণাবলীর সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া তিনি নিজের ভাষায় মন্দাকিনীর স্রোতের মত তর তর গতিতে সৃষ্টি-রহস্য বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনা পাঠে তাঁহার উপর এত অধিক শ্রদ্ধা হয়। কেবল হিব্রুজাতি বর্ণিত আদম ও হবা নায়ক নায়িকা সংযুক্ত সৃষ্টি রহস্য অভিজ্ঞাত শিক্ষিত যুবকগণ এ অমূল্য গ্রন্থে অতি অল্প পরিশ্রমে বিজ্ঞান-মূলক আর্য্যঋষিগণ বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। পুরাণোক্ত ব্রহ্মের কন্যা উপগমন, চন্দ্রের সমুদ্র হইতে জন্ম প্রভৃতি গল্পেরও লেখিকা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এরূপ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক বঙ্গনারীর গৌরবকেতন। লেখিকার বঙ্গদেশীয়া সকল ভগ্নী তাঁহার প্রতিভার জন্য আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা মনে করিতে পারেন।

আমাদের বোধ হয় পুস্তকখানি আর একটু প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। এরূপ দার্শনিক পুস্তক অতিশয় সরল হইতে পারে না তাহা বুঝি। কিন্তু একটু কলেবর বাড়াইলে পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুখবোধ্য হইত। আমাদের অনুরোধ লেখিকা যেন দ্বিতীয় সংস্করণে

ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া রচনাটিকে প্রাঞ্জল করিবার প্রয়াস করেন। তাহা হইলে পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে অধিক আদৃত হইবে।

কিরণশশী—৺রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা। ৪৫।৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে ওরিয়েণ্ট্যাল ষ্টোর্সে প্রাপ্তব্য।

নাটকখানি প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৩০৭ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। সে সময় উহা বিখ্যাত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। তখনও অভিনয় দর্শনপ্রয়াসী বাঙ্গালী প্রকৃত সরস নাটকের অভিনয় দেখিয়া হাসিতে কাঁদিতে ভালবাসিত, রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালী সমাজে নিত্যশ্রুত করুণ মর্ম্মস্পর্শী বিলাপগীতির প্রতিধ্বনি শুনিতে চাহিত, অত্যাচার অবিচারের দৃশ্য দেখিয়া ধীরে ধীরে সমাজের অত্যাচারী নররাক্ষসদিগকে উপহাস করিয়া সামাজিক নীতির স্রোত ফিরাইতে প্রয়াস করিত। তাই তখন কিরণশশীর মত সামাজিক নাটকের আদর ছিল, নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী শ্রমজীবী জগতে একটা বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিল। সহৃদয় বৃটিস গবর্ণমেণ্টের দণ্ডপ্রভাবে এবং শিক্ষা বিস্তারের সহিত ক্রমে অত্যাচারী জমীদারের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, সমাজে সাম্যভাবের প্রসার হইতে লাগিল, নানা কারণে দর্শকের রুচি পরিবর্ত্তিত হইল। ফলে সামাজিক নাটকের আদর কমিয়া আসিল। পিশাচ প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সুতরাং নাট্যশালার অধিস্বামিগণ কর্ত্তৃক নানা বর্ণে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দর্শকগণকে 'হাসির হর্‌রা, গানের গর্‌রা, নাচের নায়েগ্রা, মজাদারী বোল' প্রভৃতির প্রলোভনে প্রলোভিত করিতে লাগিল, সমস্তদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর লোকে আর কিরণশশীর অভিনয় দেখিয়া কাঁদিতে চাহিল না, বিশুদ্ধ হাস্যরসে আর তাহাদের হাসির উদ্রেক হইল না, তাই জঘন্য উচ্চ ভাবহীন ললিতভাষা-বিবর্জ্জিত কুরুচিসম্পন্ন গীতিনাট্য ও প্রহসন গুলার দেশে আদর বাড়িল।

'কিরণশশী' নাটক অভিনয় না হইলে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে না। তবে এ পুস্তক খানি সাহিত্যমধ্যে থাকিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। ইহার গল্পাংশ মনোরম, ইহার হাস্যরসের অবতারণা বিমল, এবং ইহার শিক্ষা মহৎ। নাটকখানি পড়িলে বুঝা যায় লেখক বহুদর্শী ছিলেন। ইহাতে ভাব ও ভাষায় লাঠালাঠি নাই, তাজমহলের গুম্বজ কাটিয়া পর্ণকুটীরের উপর বসান হয় নাই। যে ব্যক্তির মুখে যে ভাষা শোভা পায় সরল স্পষ্টভাবে তাহার মুখে সেই ভাষা শুনিতে পাওয়া যায়। চরিত্র অঙ্কনেও অতিরঞ্জনের দোষ নাই। ইহাতে অধর্ম্মের ক্ষণিক বিজয় এবং পরিশেষে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় বেশ সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। সে কালের গ্রাম্যজীবনে আমরা যেমন অধর্ম্মী অত্যাচারী নরপিশাচ দেখিতে পাইতাম, তেমনি পরার্থপর দেবপ্রতিম প্রতিবাসী ও প্রভুভক্ত ভৃত্যও ঘরে ঘরে দেখিতাম। যোগেন্দ্রবাবুর 'রাজলক্ষ্মী ও রাজকুমার বাবুর কিরণশশীতে আমরা এ চিত্র বেশ দেখিতে পাই।

বলা বাহুল্য, কিরণশশী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। তবে ইহার দোষ অল্প। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখিলে সুখী হইব।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত

বঙ্গ-বিজয় বা ভিষক্‌-দুহিতা।

[illegible] "বঙ্গ-বিজয়" [illegible] আলোক-দৃপ্তি, [illegible], বর্ম্মার, [illegible] [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] করিবেন।



"বঙ্গ-বিজয়" [illegible] অবসান চিত্র—স্বদেশের বাণিজ্য, সম্পদ ও সমৃদ্ধির [illegible]—সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণ ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান।

[illegible] চিত্রে কলেবর [illegible]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত

সাবিত্রী-সত্যবান্।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহিত।



[illegible] কাব্যখানি [illegible] পাতায় পাতায় সৌন্দর্য্য, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মাধুর্য্য, ছত্রে ছত্রে ভক্তির লীলা। একবারে [illegible] [illegible]। দেখিতে না দেখিতে এক মাস মধ্যে ইহার যে সংস্করণ বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, যে হিন্দুনারী ইহাকে বহুমূল্য অলঙ্কার হইতেও আদর করিবেন। ঘরে ঘরে ইহাদ্বারা সতী সাবিত্রীর সৃষ্টি হইবে। যদি প্রিয়তমা পত্নীকে, প্রিয় দুহিতাকে ও স্নেহের ভগ্নীদিগকে নারী কুলরত্ন করিতে চান, তবে প্রত্যেককে এক একখানা কিনিয়া দিন, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মনোরঞ্জনও করুন। কাহাকেও প্রীতি উপহার দিতে হইলে ইহার তুল্য আর [illegible] নাই। মূল্য [illegible] টাকা। [illegible]



অতি নূতন রহস্যময় বড় চিত্তাকর্ষক ডিটেকটিভ উপন্যাস।

পুণ্যের জয়।

"বঙ্গবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] বাগচি প্রণীত।

[illegible]



পরিণাম—দেবত্ব হইতে পশুত্বে পরিণতি। তারপর পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয়। অপার্থিব প্রেমের অমর কাহিনী, পবিত্র মন্দাকিনী ধারার বিপুল প্লাবন। বন্ধুত্বের অপূর্ব আদর্শ, প্রেমের অপূর্ব আলেখ্য, স্নেহের বিকাশ, হৃদয়ের স্বর্গীয় সম্পদ, মানবের উপাস্য দেবতা। সুন্দর পুস্তক, সুদৃঢ় বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট, বহু হাফটোন

[illegible]

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ, প্রণীত

মেজবউ

[illegible] আদর্শ উপন্যাস [illegible] ; [illegible] বর্ত্তমান, দ্বারা এই [illegible] করিলে [illegible] কমনীয় [illegible] এমন অনেক স্থান



[illegible] কাঁদিতে হইবে। [illegible] পাতপ্রতিঘাত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইতে হইবে। মেজবউ [illegible] শ্মশান-সংসার বক্ষে পারিজাত-সৌরভ-পরিব্যাপ্ত নন্দন-কানন। সংসার মরুভূমে স্বচ্ছ শীতল বারিপূর্ণ সরসী। এই মেজবউ পুস্তকখানি পাঠ করিলে কঠিন সংসার সোণার সংসারে পরিণত হইয়া পবিত্র শোভায়

২১।১ সুকীয়া ষ্ট্রীট, সাপ্তাহিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক { শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্
ও
শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র

[illegible]—৬৮ নং [illegible] রোড, অর্চনা পোষ্ট অফিস
[illegible]।

সূচী।

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

নবম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৮। [প্রথম সংখ্যা।

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র।

কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ হইতে আবার একটী মহাদীপ্তিশীল জ্যোতিষ্ক বিচ্যুত হইয়া পড়িল। ভারতীর অঙ্ক শূন্য করিয়া নির্ম্মম বিধাতা তাঁহার বরপুত্র গিরিশচন্দ্রকে কাড়িয়া লইলেন। যিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া নানাচিত্র অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন, কাঁদাইয়াছেন—যাঁহার প্রতিভা এতদিন পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়, প্রেমের মহত্ত্ব, ভক্তির উৎসে নাট্যসাহিত্যকে উদ্ভাসিত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্ত আকর্ষণ ও শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিল, বিগত ২৫শে মাঘ তারিখে কালের অশনি-সম্পাতে আমাদের সেই গিরিশচন্দ্র ধরাধাম হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন তারিখে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুর সময় তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। সারাজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিরিশচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যকে মণিমুক্তাহীরক-সম্ভারে বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, অসংখ্য নূতন নূতন চরিত্র-সৃজনের এত অধিক ক্ষমতা ও প্রতিভা লইয়া অন্য কোন নাট্যকার বা লেখক বঙ্গ-সাহিত্যে অবতীর্ণ হন নাই। গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র নাট্যকার ছিলেন না, তিনি নটকুলগুরু, প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি বঙ্গ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা, অভিনেতার শিক্ষক এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য ও প্রধান ভক্ত ছিলেন। সর্ব্ব বিষয়েই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় প্রকট।

গিরিশচন্দ্র কখনও বাজে হুজুগে মাতিতেন না, বাজে গোলযোগের মধ্যে থাকিতেন না। প্রশংসা বা নিন্দাবাদে তাঁহার সাম্যভাব পরিলক্ষিত হইত। আধুনিকের ন্যায় যশঃ বা উপাসনা-লিপ্সা তাঁহার ছিল না, তিনি যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। কলিকাতার এক প্রান্তে বসিয়া নিজের সাধনায়, নিজের কর্ম্মে, নিজের আত্মোন্নতিতে গিরিশচন্দ্র সর্ব্বদাই প্রমত্ত থাকিতেন।

আমরা গিরিশচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই, শোকপ্রকাশ করিতে বসিয়াছি, আক্ষেপ করিতে বসিয়াছি! তিনি বাণীর মানস পুত্র হইলেও, সর্ব্ব-দিকস্পর্শিনী প্রতিভার অধিকারী হইলেও, সর্ব্বপ্রধান নাট্যকার হইলেও আমাদের 'সাহিত্যিক-ধুরন্ধরে'র মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা, উপযুক্ত সম্মানদানে চিরদিনই কৃপণতা করিয়া আসিয়াছে; তাঁহাকে 'সাহিত্যিকের দলভুক্ত' করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র এই 'উপেক্ষা' ভাল করিয়াই বুঝিয়া গিয়াছেন, এইটুকু আমাদের দুঃখ, এইটুকু আমাদের আক্ষেপ। তাই কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে হয়—

"এই অভিশপ্ত ভূমে, বুঝি গুরো পথ ভুলে
পড়েছিলে এসে,
কেন না জন্মিলে কবি, উপযুক্ত কালে আর,
উপযুক্ত দেশে?"

বাঙ্গালী যদি অকৃতজ্ঞ না হয় তাহা হইলে এখনও সকলে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা করিয়া তাঁহার আত্মার প্রীতি-সাধন করিবে, অন্যথা সাহিত্যের উপর যে অভিশাপ আসিবে, তাহা কখনও মোচন হইবে না। আমাদের সামান্য অর্ঘ্যেই যে গিরিশচন্দ্র কৃতার্থ হইবেন একথা ভাবিও না—সর্ব্বদা মনে রাখিও ইহা তোমাদের কর্ত্তব্য এবং মঙ্গলবিধায়ক, এবং ইহাও মনে রাখিও যে তাঁহার স্মৃতি তোমাদের স্তুতি-গীতির অপেক্ষা রাখে না। যতদিন বঙ্গ-সাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে —যতদিন তাঁহার বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, বলিদান, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, সিরাজদ্দৌলা, মুকুলমুঞ্জরা প্রভৃতি গ্রন্থের অস্তিত্ব থাকিবে—যতদিন বিশাল নাট্যশালাসমূহের একখণ্ড ইষ্টকও অবশিষ্ট থাকিবে—ততদিন তাঁহার অমর-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতি বাঙ্গালীর অস্থি-চর্ম্মের সহিত জড়িত থাকিবে।*

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

* বঙ্গ-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় প্রতিভা-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় 'গিরিশচন্দ্র' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। উক্ত প্রবন্ধ আগামীবার হইতে 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক।

সাহিত্যে মৌলিকতা

বাঙ্গালার সাহিত্য-বাজারে 'মৌলিকতা' কথাটার এখন বড় বেশী রকম আমদানী দেখা যায়। এখনকার অধিকাংশ সমালোচকই সমালোচনা করিতে বসিলে ঐ কথাটার ব্যবহার না করিয়া প্রায়ই থাকিতে পারেন না। অবশ্য, ঐ বাক্য-ব্যবহারের আতিশয্য দেখিয়া উহার বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য,—কথাটার উচিত-মত ব্যবহার লইয়া। 'মৌলিকতা' কথার প্রকৃতিগত অর্থ চাপা পড়িয়া যাহাতে উহা দশ জনের অর্থহীন অভ্যস্ত-আবৃত্তিমাত্র হইয়া না দাঁড়ায়, সেদিকে সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, অবস্থা প্রায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই ঐ শব্দটির সুপ্রয়োগ হয় না। প্রায় উহার অপ-ব্যবহারই হইয়া থাকে।

এইরূপ হইবার সাধারণতঃ দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কারণ,—সমালোচক প্রভুদিগের সত্যের প্রতি অনুরাগের অভাব এবং তাঁহাদিগের মানসিক সঙ্কীর্ণতা; দ্বিতীয় কারণ,—অজ্ঞতা।

যাঁহাদের সমালোচনা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা বন্ধুতার অনুশাসনে শাসিত, তাঁহাদের রচনাতেই এই বাক্যের অপব্যবহার-রূপ ব্যভিচারদোষ ঘটিবারই কথা। ইঁহাদের দোষ অমার্জ্জনীয়। এই মিথ্যা ব্যবসায়ী লেখকগণ মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া সাহিত্য-চরিত্র নষ্ট করিয়া থাকেন। সদুপদেশ বা সুপরামর্শ এই লেখক-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিতে পারে না। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিম ইঁহাদের সংশোধনের জন্য চাবুকের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন, তাঁহারা 'মৌলিকতা' কথার ঠিক-মত অর্থ জানেন না। তাঁহাদের রচনাতেও সেই জন্য ঐ শব্দের অপ-প্রয়োগ দোষ ঘটিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এ দোষ ইচ্ছাকৃত নহে। জ্ঞানকৃত পাপের সংস্পর্শ ইহাতে নাই। যে দোষ অজ্ঞতাজনিত, তাহা কতকটা মার্জ্জনীয়। তা' ছাড়া, কথাটার তাৎপর্য্য বুঝাইতে পারিলে, তাঁহাদের এ ত্রুটি সংশোধিত হইবার আশাও আছে। এই আশা-পরবশ হইয়াই আমরা দুই চারিজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সাহায্য লইয়া 'মৌলিকতা' বাক্যের মর্ম্ম সুস্পষ্ট করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছি।

"There is nothing new under the Sun."

এই প্রবাদ-বাক্যে সার সত্য নিহিত আছে। পৃথিবীতে 'আন্‌কোরা' নূতনের অস্তিত্ব আদৌ অসম্ভব। আজ পর্য্যন্ত এমন কোন জিনিষ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা একেবারে পুরাতনের সম্পর্ক শূন্য! পুরাতনই নূতনের বেশ ধারণ করিতেছে মাত্র। পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতনের সৃষ্টি হইতে পারে না। অন্ততঃ, অদ্যাবধি সেরূপ হইতে ত দেখি নাই।

সাহিত্যও কিছু সৃষ্টি-ছাড়া বা জগত-ছাড়া জিনিষ নহে। সুতরাং সেখানেও যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে, এমন আশা করা দুরাশা মাত্র। সৃষ্ট জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহারই সংযোগ-বিয়োগ করিয়া সমুদয় সাহিত্য-সংসার বিরচিত হইতেছে। অতএব সাহিত্য-সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি, প্রকৃত পক্ষে সে সমস্তই পুরাতন। কোন চিন্তাই কোন 'আইডিয়া'ই নিজেকে সম্পূর্ণ নূতন বা মৌলিক বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না।

তাহা হইলে, সাহিত্য-সংসারে 'মৌলিকতা' জিনিষটার কি একান্তই অসদ্ভাব? না,—তাহা নহে। সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে স্বেচ্ছামত টানিয়া টানিয়া সূতা বাহির করিয়া জাল বুনিতে থাকে, 'মৌলিকতা' জিনিষটা সেরূপ ভাবে মনুষ্যমধ্য হইতে উৎপন্ন হয় না। ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত বা কাহারও নিজস্ব সামগ্রী নহে। ইহা দশ জনের যোগেই তৈয়ারী হইয়া থাকে। যদি আমার কোন মস্তিষ্ক-প্রসূত ভাব, অপরের চিন্তার বা বুদ্ধির অতীত হয়, তাহা হইলে সেই ভাবকে মৌলিক মনে না করিয়া পাগ্‌লামী বলাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং যাহা অর্থহীন,—তাহাও 'মৌলিক' নহে। সকলের হৃদয়েই ইহার আসন আছে। মৌলিক-চিন্তা এমন কথা কখনই বলিবে না, যাহাতে আমি বৃত্তকে চতুষ্কোণ বলিয়া বুঝিব। আসল কথা এই যে, সাধারণ-হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক না পাতাইয়া, আপোষ না করিয়া একপদও অগ্রসর হইবার ইহার সামর্থ্য নাই। তবে সাহিত্য-সংসারে মৌলিকতার কার্য্য কি?

মৌলিকতা পুরাতনকে নূতন আকার দেয় মাত্র। কোন এক বিখ্যাত বিলাতী লেখক তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—

"I never had a spontaneously original idea for a story in all my life. I am a copy-book, pure and simple. You say you have never noticed the faintest suggestion of plagiarism about my stories. Ah, my friend, that is because I am such a crafty thief!"

বাস্তবিক, যে পাকা চোর, সে পরের সোনা লইয়া তৎক্ষণাৎ তদবস্থায় তাহা বাজারে বাহির করে না। সে তাহার ভিন্ন গঠন দিয়া জন-সমাজে নিজের বলিয়া তাহা চালাইতে চেষ্টা করে। ভাব-রাজ্যে ভাব-সম্পদ লইয়া এইরূপ কাড়াকাড়ি ব্যাপার প্রতিনিয়তই চলিতেছে। সেইজন্য দার্শনিকপ্রবর Emerson সাহেব বলিয়াছেন,—"The greatest genius is the most indebted man."

যে সেক্সপীয়রকে লোকে 'মৌলিকতা'র আকর বলিয়া স্বীকার করে, যাঁহার সম্বন্ধে পোপ্ (Pope) বলিয়াছেন যে, যদি কেহ 'অরিজিন্যাল' নামের যোগ্য থাকেন, তবে সে কেবল একমাত্র সেক্সপীয়র; সেই সেক্সপীয়রও এই অপহরণ-অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার রচিত 'Henry VI'. নামক তিন খণ্ড গ্রন্থের সর্ব্বশুদ্ধ ৬০৪৩ লাইনের মধ্যে ১৭৭১ লাইন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের লেখা হইতে অক্ষরে অক্ষরে গৃহীত। তা' ছাড়া, ২৩৭৩ লাইন অপর লেখকের লেখার ভাবাবলম্বনে লিখিত। এই সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে Landor সাহেব কিন্তু বলিয়াছেন,—"Yet he was more original than his originals. He breathed upon dead bodies and brought them into life." সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে,'বৈচিত্র্যের চিত্রাঙ্কণ-নিপুণতা'র নামই মৌলিকতা। মৌলিকতা নিতান্ত আকাশ-কুসুমের মত কল্পনাগত জিনিষ নহে।

আমাদের দেশেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহাকবি কালিদাস রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থ না পড়িলে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তিনি নিজেই বলিতেছেন;—

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥

'অথবা সূত্র যেমন হীরকাদিকৃত ছিদ্র পথে মণিমধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণকৃত বাক্যদ্বার দিয়া এই বংশে প্রবেশ করিব।'

একই চিন্তা, একই ভাব কতশত উপায়ে, কতশত আকারে যে সাহিত্য-সংসারে নিত্য প্রচারিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে? নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আদি আবিষ্কারক বলিয়া সভ্য সমাজে পরিচিত, কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কথা নিউটনের বহুপূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য ও আর্য্যভট্ট কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন,—"আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী যৎ তন্না প্রক্ষিপ্যতে

তৎ তয়া ধার্য্যতে।" অর্থাৎ 'পৃথিবী আকর্ষণ-শক্তি বিশিষ্ট। কারণ, যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়, আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পৃথিবী তাহাই ধারণ করে।'

ভারতবর্ষে বিলাতী আলোক আসিবার বহুপূর্ব্বে ভারতবাসী জানিত,— "কপিথফলবদ্বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং।" অর্থাৎ 'পৃথিবী কয়েতবেলের মত গোলাকার এবং উত্তর দক্ষিণে ঈষৎ চাপা।'

এখন বলা হইতেছে, এই মৌলিকতার অধিকারী কে? উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, যিনি প্রতিভাশালী,—মৌলিকতা কেবলমাত্র তাঁহারই করায়ত্ত। কারণ; "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভেত্যুচ্যতে"। নবীকরণ-শক্তির নামই প্রতিভা। নবীকরণশক্তি হইতেই মৌলিকতার উৎপত্তি। সুতরাং প্রতিভা প্রসূত কার্য্য ব্যতীত অন্যত্র মৌলিকতার অস্তিত্ব নাই। নবীকরণ—মৌলিকতারই নামান্তর মাত্র। একই কার্য্য, শক্তির তারতম্য অনুসারে কোথাও অনুকরণ বা অপহরণ বলিয়া গণ্য হয় এবং কোথাও বা তাহা মৌলিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রতিভাশূন্যের কার্য্য অনুকরণে পরিণত হয়। আর প্রতিভাশালীর কার্য্য 'মৌলিক', 'নূতন' বা 'অপূর্ব্ব' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকে। এই অবসরে আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখি।

আমাদের দেশের দুই চারিজন ইংরাজী রায়ুগ্রস্ত বাবু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে ইংরাজী সাহিত্যের নকল বা অনুকরণ বলিয়া অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, যে অনুকরণে প্রতিভা সম্পৃক্ত, তাহা আর অবহেলার সামগ্রী হইতে পারে না। কথাটা প্রমাণ প্রয়োগে বুঝাইয়া দিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছেন, "সমুদায় রোমক সাহিত্য. যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র।......তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউ-রোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এবিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে, এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয় এবং ফরাসীগণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন, যে শেষোক্ত জাতি সকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের

অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা 'নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল।' বিদেশী সাহিত্যের উদাহরণেই বা আবশ্যক কি? আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের কথা আলোচনা করিলেই সে কথা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে। যে সাহিত্যকে তোমরা খাঁটী সাহিত্য বলিয়া থাক, সেই সাহিত্যের ভাবপ্রবাহও পশ্চিম হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন, "সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির হিন্দীপদাবলী গীত ও মহাকাব্য সকল পাঠ করিয়া বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির লেখা পড়িলে মনে হয়, যেন বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মুকুন্দ-রামের চণ্ডীকাব্যে তুলসীকৃত রামায়ণের অনেক ছত্র, অনেক শ্লোক আদত পাওয়া যায়। সুরদাসের গীত-লহরী হইতে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সর্ব্বস্ব পাওয়া যায়।" তাই বলিতেছিলাম, যে সাহিত্য মধুসূদন ও বঙ্কিমাদির প্রতিভা সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তাহাকে খাঁটি জিনিষ না বলা পাগলামী-পরিচায়ক। এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আমরা রবিবাবুর ভাষায় বলিতে পারি, "যে জিনিষটা একটা কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি-জিনিষ বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিষটা কোথাও নাই।"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

গুলে বকাওলি।

(ইহা এক প্রকার পুষ্পবৃক্ষ; কতকটা ভুট্টা গাছের মত আকার। গাছের দাঁড়া উর্দ্ধে উঠে ও তাহার চারি ধারে লম্বা লম্বা পাতা ছড়াইয়া পড়ে; থোলো থোলো শাদা সুগন্ধী ফুল-গুলি কেবল ডগার উপরেই ফুটিয়া থাকে।)

রে বিচিত্র ফুলতরু! কাটাইয়া ধরণীর মায়া,
ধরণীর সুখভোগ, রোগ, শোক, সন্তাপ পাশরি,
উর্দ্ধ দৃষ্টি, উর্দ্ধ গতি, বল্ বল্, কার মুখ স্মরি'?
তোর কায়া-মাঝে আজি পড়িয়াছে কা'র পদ ছায়া?

২

জানিস্ না তোষামোদ—মানবের চরণ লেহন ;
কোনো নৃপতির পদে মাথা তোর নাহি হয় হেঁট !
কার পাদপদ্মতলে রাখিবারে এ রূপালি ভেট,
এ মধুর আকিঞ্চন, প্রাণপণ এই আয়োজন ?

৩

সদা তোর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ! ধ্যানে সদা নন্দন-স্বপন !
ধাত্রী ধরিত্রীর লাগি তবু তোর কেঁদে উঠে প্রাণ !
হে পবিত্র শুভ্র আত্মা ! কি সৌরভ করিস্ প্রদান
বিশ্বজনে !—বিশ্ব হাসে, ভুলি দুঃখ, মুছিয়া নয়ন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

পথের কথা।

ওয়েষ্টন্ ষ্ট্রীট (কলিকাতা)

আজকাল কলিকাতায় ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট্ বলিয়া যে গলিটী সাধারণে পরিচিত, তাহার নামের সহিত অতীত কালের ইতিহাসের একটু সম্পর্ক আছে। লোকে "ওয়েষ্টন ষ্ট্রীটে"র কথা জানেন, কিন্তু এই রাস্তার সহিত যে মহাত্মার নামটী সংযুক্ত, তাঁহার কথা খুব কমই জানেন। আমি এই ওয়েষ্টন সাহেবের সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। যদি এ সম্বন্ধে আর কেহ কিছু নূতন কথা বলিতে পারেন—তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।

ওয়েষ্টন সাহেব, কলিকাতার প্রথম ফিরিঙ্গি। এই দেশে তাঁহার জন্ম—এ দেশের অন্নজলে তাঁহার দেহ পুষ্ট—এ দেশের সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যময় নবজীবনের শেষ অস্তিত্ব লোপ—আজ প্রায় দুই শত বৎসর হইতে চলিল—কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র গলি এই মহাপ্রাণ ফিরিঙ্গির কীর্ত্তি-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।

চার্লস ওয়েষ্টন পলাশী আমলের লোক। এই কলিকাতাতেই তাঁহার জন্ম। বর্ত্তমান টেরিটি বাজারের বিপরীত দিকে একটী বাড়ী আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর সে বাড়ী নাই। তাহা ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে একটী নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। টেরিটি বাজারের এই বাড়ীতেই ১৭৩১ খৃঃ অব্দে চার্লস ওয়েষ্টনের জন্ম। আর ওয়েষ্টন লেন্‌টীও বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়া জিগ্‌জ্যাগ্‌-লেনে গিয়া মিশিয়াছে।

ওয়েষ্টনের পিতা কোম্পানীর প্রথম প্রতিষ্ঠিত Mayor's Court এর সেরেস্তাদার ছিলেন। সেকালের লোকে তাঁহাকে "সাহেব-সেরেস্তাদার" বলিত। তিনি এদেশের লোকের সঙ্গে বড়ই মেশামিশি করিতেন—বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। হিন্দুর পাল-পার্ব্বণে নিমন্ত্রিত হইলে—পাত পাড়িয়া বসিয়া ফলার পর্য্যন্ত করিতেন!

এই সাহেব সেরেস্তাদারের পুত্র, চার্লস ওয়েষ্টনের জীবনের কাহিনীগুলি ধারাবাহিকরূপে এক স্থানে কোথাও পাওয়া যায় না। পাঁচ জায়গায় পাঁচটী টুকরা সংগ্রহ করিয়া, জোড়া তালি দিয়া আমি এই সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাসানুরাগী পাঠক একটু ধৈর্য্যসহকারে সেগুলি পড়িলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। চার্লস ওয়েষ্টনের নশ্বর দেহ এখন মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া, মাটী হইয়া গিয়াছে—কিন্তু পার্কষ্ট্রীটের পুরাতন গোরস্থানে এখনও তাঁহার সমাধিটী বর্ত্তমান। সেই সমাধিস্তম্ভে লিখিত আছে—

CHARLES WESTON.

BORN 1731 DIED 25th DECR. 1809

In the 78th year of his age.

ওয়েষ্টনের অমানুষিক গুণগরিমার পরিচয় তাঁহার সমাধিস্তম্ভের গাত্রে খোদিত, নিম্নলিখিত অংশটুকু পাঠ করিলে জানা যায়।

"A life protracted to unusual length, he marked by an unostentatious life of benevolence and charity seldom equalled or never before exceeded in British India. By the wise economical management of a fortune far from enormous (the production of his own industry) he was enabled to pour forth streams of bounty and mercy. He manifested a grateful mind, by cherishing in his old age his former employer and

benefactor the late Governor Holwell and after being the friend of the destitute, the support of the widow and fatherless,an ornament to British name and a blessing to mankind he descended to the tomb amid the tears of the indigent and lamentations of surviving frends. Reader! this stone is no flatterer. Go and do thou likewise."

এই সমাধিস্তম্ভ গাত্রে যে কাহিনী লিখিত আছে, তাহা হইতেই সেকালের ইংরাজের মহৎ চরিত্রের আভাষ পাওয়া যায়। কষ্ট, বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি দাতব্য খাতে খরচ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানের পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না। দরিদ্র বালক, হতভাগিনী আশ্রয়হীনা বিধবা, অক্ষম আতুর সবাই তাঁহার দয়ার অধিকারী হইয়াছিল। তাঁহার দানের কোনরূপ জাতিগত বা সম্প্রদায়গত পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

অন্ধকূপ হত্যা ব্যাপারে সুবিখ্যাত হলওয়েল সাহেব আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে—অস্ত্রচিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। চার্লস ওয়েষ্টন প্রথম অবস্থায় তাঁহার সহকারী এ্যাপথিকারী ছিলেন। এমন কি, একবার তিনি তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া হলওয়েলের সহিত বিলাত পর্য্যন্ত যান। কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসায়ে সেকালে বিশেষ লাভ ছিল না, কাজেই ওয়েষ্টন এ ব্যবসায়ে কোন কিছুই করিতে পারেন নাই। সহকারীর কথা দূরে থাক—তাঁহার প্রভু হলওয়েলই কোম্পানীর নিকট যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিত না। কারণ ওয়েষ্টন সাহেব নিজ মুখেই এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন—"হলওয়েল সাহেব কোম্পানীর প্রধান সার্জ্জন। তিনি বিলাত হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁ'রই যখন রোগী দেখিয়া ৩।৪ মাসে মোটে পঞ্চাশ-ষাট্ টাকা উপায় হয়, তখন এ ডাক্তারী ব্যবসা ত্যাগ করাই আমার শ্রেয়ঃ।" ওয়েষ্টন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন। আর তাহা না হইলে তিনি লক্ষপতি ধনেশ্বর হইতেও পারিতেন না।

হলওয়েল যখন ফোড়া অস্ত্র করার কাজ ছাড়িয়া, কোম্পানীর অধীনে Covenanted Civilian রূপে নিযুক্ত হইলেন, ওয়েষ্টন ও সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিলেন।

সেরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ড্রেকের পলায়নের পরই,হলওয়েলের হাতে ফোর্ট উইলিয়মের আধিপত্য আসিল। হলওয়েল কিরূপ অসমসাহসিকতার সহিত, নবাবের সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন্ ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। স্বয়ং নবাব সেরাজউদ্দৌলাই নিজ মুখে

সেই বীরত্বের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ওয়েষ্টন এই ভীষণ সময়েও তাঁহার পূর্ব্ব প্রভু হলওয়েলকে ত্যাগ করেন নাই। দুর্গমধ্যে তিনি Militriaman রূপে কাজ করিতেছিলেন। নবাব কর্ত্তৃক দুর্গজয়ের পূর্ব্ব রাত্রে হলওয়েল দুর্গের গুপ্ত দ্বার দিয়া ওয়েষ্টনকে গঙ্গায় নৌকাবক্ষে তুলিয়া দেন। হলওয়েলের অনেক মাল পত্র সেই নৌকায় রক্ষিত হইয়াছিল—ওয়েষ্টন সেই মাল রক্ষার ভার পাইলেন। ধরিতে গেলে হলওয়েল তাঁহার উপকারই করিয়াছিলেন। এরূপ না করিলে ওয়েষ্টনকে হয়ত অন্ধকূপের মধ্যে পচিতে হইত।

ওয়েষ্টন দুর্গজয়ের পর ফলতায় না গিয়া,চুঁচুড়ার দিনেমার ফ্যাকটারিতে আশ্রয় লইলেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বিলাত যাইবার সময় হলওয়েল তাঁহার একান্ত অনুরক্ত সহকারীকে দুই হাজার টাকা দান করিয়া যান। খালি তাই নয়, স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য, তাঁহাকে আরও পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দেন।

হলওয়েল প্রদত্ত এই সাত হাজার টাকাই ওয়েষ্টনের উন্নতির প্রধান উপায়। ওয়েষ্টন এই টাকায় এজেন্সির কাজ আরম্ভ করিলেন। সেকালে এই কাজে বেশ দুপয়সা রোজগার হইত। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান টিরেটা (টেরিটি) বাজার নীলাম হয়। ওয়েষ্টনই সেই সময়ে উচ্চদরে এই বাজারটী কিনিয়া লন। ওয়েষ্টন এই বাজারের দোকান ভাড়া ও তোলা দান প্রভৃতি হইতে নিজের খরচ চালাইতেন, আর তাঁহার সঞ্চিত সম্পত্তির সুদ হইতে যে প্রচুর আয় হইত, তাহা দানকার্য্যে ব্যয় করিতেন।

মৃত্যু সময়ে তিনি কয়েক লক্ষ নগদ টাকা রাখিয়া যান। যেকালে আট টাকা মাহিনার চাকরীতে লোকে দোল-দুর্গোৎসব করিত, সেকালে লাখ্ টাকা সঞ্চয় করা একটা ভয়ানক ব্যাপার। আজীবন দাতব্য ও পরোপকারে অর্থদান করিয়া, এই টাকাটা নগদ রাখিয়া যাওয়াও বড় সহজ কথা নহে।

মহারাজ নন্দকুমার যখন জাল-অপরাধে সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত হন, তখন জুরীগণের মধ্যে আমরা এই ওয়েষ্টনকে দেখিতে পাই। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের এক সংবাদপত্রের মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যায় --Mr. Weston a Eurasian of great wealth and boundless generosity who delighted to distribute with his own hand at his residence in Chinsurah *one hundred gold mohurs* a month to the poor.

চুঁচুড়ায় চার্লস ওয়েষ্টনের একটী বাগান বাটী ছিল। তিনি প্রতি মাসে এক শত মোহর (ষোল শত টাকা) স্বহস্তে গরীব দুঃখীকে দান খয়রাত

করিতেন। এ দানের পরিমাণ ত বড় সহজ নয়! পাঠক! বলুন দেখি, প্রতি মাসে এই দান আজকালকার দিনে সম্ভব কি না?

আজকাল যে বাড়ীটী লালদিঘীর প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা নিউম্যান কোম্পানী অধিকার করিয়া আছেন ঐ বাড়ীটী চার্লস ওয়েষ্টনের ছিল। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের একখানি পাট্টা হইতে দেখা যায়,—"অনারেবল কোম্পানীর নিজ জমাভুক্ত এক বিঘা ষোল কাঠা খামার জমী চার্লস ওয়েষ্টনকে জমা দেওয়া হইল। এই ওয়েষ্টন সাহেব কলিকাতায় গরীব-দুঃখীর মা-বাপ ও কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী হলওয়েল সাহেবের বিশেষ বন্ধু। কোম্পানীর সহিত ওয়েষ্টনের এই স্বত্ব রহিল, যে তিনি ইহার উপর কোনরূপ পাকা এমারত ও দেয়াল নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না। রেলিং বা বেড়া দিয়া কেবল স্থানটী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাহাদের খাস দখলে আনিবেন।"

* এই জমীর উপর ওয়েষ্টন কোনরূপ বাড়ী ঘর করেন নাই। কি উদ্দেশ্যে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে এই জমীটুকু পাট্টা লইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে এক বিক্রয় কোবালা হইতে জানিতে পারা যায়,যে ওয়েষ্টন উক্ত অব্দে ছয় হাজার টাকা মূল্যে বারেটো সাহেবকে ঐ জমী পূর্ব্বস্বত্ব বলবৎ রাখিয়া বিক্রয় করেন। ইহার পর নয় বৎসর কাল এই জমী পতিত অবস্থাতেই থাকে। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সিঁড়ির পার্শ্বে কলিকাতার ঐ সময়ের যে একখানি পুরাতন চিত্র আছে,তাহাতেও মিসনরো'র পুরাতন গির্জ্জার পার্শ্বে এই স্থানটী শূন্য দেখা যায়।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে কোম্পানী উল্লিখিত করারগুলি তুলিয়া দিয়া, এই জমী খণ্ড পুনরায় বিলি করেন। এই সময়ে এই স্থানে একটী বাটী প্রথম নির্ম্মিত হয়। ১৮৩০ খৃঃ এই বাটীতে Alport and Coর সদাগরী আফিস ছিল। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ইহা "বেঙ্গল ক্লবের" দখলে আসে। ইহার পরে দেখা যায়, যে ক্রুটেন্‌ডেন ম্যাকিলপ্ কোং জেমস্ উইলিয়াম নামক এক ব্যক্তিতে ৮২ হাজার টাকায় এই বাটী ও জমী বিক্রয় করিয়াছিলেন। তখনও এই বাড়ী "Club House" নামে পরিচিত। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে স্যর ওয়ালটার ডিসুজা এই জমী ও তদুপরিস্থ বাটী ১৮০০০০ টাকায় ক্রয় করেন। আবার কয়েক বৎসর পরে এই জমী তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। ওয়েষ্টন ১৭৮০ অব্দে যে জমী সামান্য মূল্যে জমা লইয়াছিলেন—১৮৮২ অব্দে তাহার মূল্য ষাট্ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

টিরেটা-বাজার আজকাল বর্দ্ধমানের মহারাজের সম্পত্তি। কিন্তু শতাব্দী পূর্ব্বে এই বাজার হইতেই ওয়েষ্টনের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন। এডওয়ার্ড টিরেটা নামক এক ভেনিসিয়ান এই বাজার স্থাপন করেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা গেজেটে একটী লটারি বা সুরতীর বিজ্ঞাপনে—এই বাজারটী একটী "প্রাইজ" রূপে ধরা হয়। বাজারের আয় সেই সময়ে মাসিক ৩৫০০ টাকা ছিল। নয় বিঘা আট কাটা জমী ব্যাপিয়া এই বাজারের ব্যাপ্তি। ইহার দাম সেই সময়ে ১৯৬০০০ হাজার টাকা ধার্য্য হয়। চার্লস ওয়েষ্টন এই লটারিতে টাকা দেন ও এই লটারির প্রথম পুরস্কার রূপে এই লক্ষ্মীমন্ত বাজারটী তাঁহার নামে উঠে। ইহা হইতেই তাঁহার লক্ষ্মীভাগ্য বাড়িয়া যায়।

ওয়েষ্টনের সন্তান-সন্ততি কি ছিল তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে চুঁচুড়ার দিনেমারদিগের পুরাতন সমাধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, চার্লস ওয়েষ্টনের দুই কন্যার সমাধি সেইখানেই আছে। সম্ভবতঃ ১৭৮০ খৃঃ অব্দেই ওয়েষ্টন চুঁচুড়ায় থাকিয়া প্রতিমাসের প্রথম তারিখে দরিদ্র-দিগকে দেড় হাজার টাকা দান করিতেন।

ব্লাক্‌হোলের ব্যাপারে Eleanor Weston নামক এক স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ দেখা যায়। এলিনারকে "ব্লাকহোলে' থাকিতে হয় নাই। নবাবের সেনাপতি তাঁহার অমানুষিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুরশীদাবাদে চালান দেন। পথিমধ্যে এলিনার কোন উপায়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই এলিনার ওয়েষ্টনের সহিত চার্লস ওয়েষ্টনের কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারা যায় না।

ওয়েষ্টন দাতা ইংরাজের আদর্শ। তিনি এদেশে থাকিয়া যাহা কিছু উপায় করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশের গরীব দুঃখীকেই দান করিয়া গিয়াছেন। এদেশে তাঁহার জন্ম। ধরিতে গেলে তিনি বর্ত্তমান "ইউরোসিয়ান" সম্প্রদায়ের প্রথম গণনীয় পুরুষ। আজও 'ওয়েষ্টন লেন' তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ধন্য ওয়েষ্টন! তোমার মত উদারপ্রাণ দাতা ইংরাজের এ যুগে বড়ই অভাব!

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সারঙ্গ

প্রয়াগের পথে সারঙ্গ বাজায়ে,
ফিরিত ফকির গাইয়া গান—
তরুণ বয়স— মলিন বসন,
মধুর কণ্ঠে ফুটিত তান।

সারঙ্গের তারে সঙ্গীত যবে
ঝরিয়া পড়িত ঝরণা মত,
এক এক করি, দলে দলে দলে,
দাঁড়ায়ে যাইত পথিক যত।

কি ধনী ভিখারী, কিবা মুসাফের,
বিহ্বল লোচনে করিত পান,
সারঙ্গের সুরে অমৃত মাখা
ফকিরের সেই বিরহ গান।

খ্যাতি গেল তার দিক্-দিগন্ত
দিল্লী প্রয়াগে ধ্বনিল তাহা,
তবুও ফকির ঘুরিয়া বেড়াত
তেমনি তরুণ, মলিন, আহা!

করুণ গর্ব্বে ঘুরিয়া বেড়াত,
না চাহে অর্থ, না চাহে মান;
শুধু সে গাইবে সারাটা জীবন,
সারঙ্গের লয়ে বিরহ গান।

বরষটা করে, সঙ্গম তীরে,
কখন কখন বসিত আসি;
গঙ্গা-যমুনা বক্ষে যখন,
চন্দ্র কিরণ পড়িত হাসি।

কখন কখন দূর আমিরের
উদ্যান পানে রহিত চাহি,
নিঃশ্বাস ফেলি, আকুল কণ্ঠে
কখন কখন উঠিত গাহি।

গভীর নিশীথে ভাসিয়া আসিত
লোকালয়ে যবে তাহার গান;
কত বিরহীর ঝরিত অশ্রু,
কত মানিনীর টুটিত মান।

কখন নিরালা আমিরের সেই
উদ্যান পাশে বসিত আসি;
মাথার উপরে এদিকে ওদিকে,
ঝরিত শুভ্র শেফালি রাশি।

স্কন্ধে সারঙ্গ তখন ফকির
কি মধুর তান তুলিত ধীরে,
পাখিরা আসিয়া শাখায় শাখায়,
ডাকিয়া উঠিত তাহায় ঘিরে।

বিহার-কুঞ্জ কুটীরের দ্বারে,
জাগিত কাহার নয়ন দুটি,
শিথিল কবরী, চরণ-প্রান্তে
অঞ্চল কা'র পড়িত লুটি।

আমির-ঘরণী আসিত লুকায়ে,
শুনিতে তাহার বিরহ গান,
নয়নে ঝরিত অশ্রু-মুকুতা
আকুলি বিকুলি উঠিত প্রাণ।

অতীতের কত প্রেমের কাহিনী
স্মরণে তাহার উঠিত ভাসি।
কত পরিচিত গায়ক কণ্ঠ,
কত পরিচিত সে সুররাশি।

একদা ফকির জাহ্নবী তীরে,
ধরিল চিত্তহরণ গান,
নেত্র যুগলে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ
কি প্রেমানন্দে পূর্ণ প্রাণ!

গাইল ক্রমশঃ— ক্রমশঃ করুণ
সঙ্গীত সেই উঠিল ধ্বনি,
চমকি উঠিল গগনে জ্যোৎস্না,
গঙ্গার জলে অযুত মণি।

ক্রমশঃ ছুটিল সঙ্গীত স্রোত,
—মধুর সমীর, মধুর নিশি,—
ক্রমশই ক্ষীণ ক্রমশঃ মধুর,
ছুটিয়া চলিল সারাটা দিশি।

গাইল ফকির তন্ময় প্রাণ
গভীর বিরহ হৃদয়ে বাজে ;
গিয়াছে ভুলিয়া মৃণ্ময়ী ধরা,
সুর-গীতিময় জগৎ মাঝে।

সহসা টুটিল, সে গভীর ধ্যান,
চমকি মেলিল নয়ন দু'টি,
দেখিল মানস- প্রতিমা তাহার
চরণোপান্তে পড়িছে লুটি।

কত বরষের পরে হ'ল দেখা,
আমির-ঘরণী আজি সে নারী,
এ মিলন তরে সে যে মুসাফের,
জগতের সুখ সকলি ছাড়ি।

চাহি একবার শুধু একবার,
নায়িকার পানে নয়ন রাখি ;
ফিরিল ফকির, স্কন্ধে সারঙ্গ
বন পথে মুখ, উদাস আঁখি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ।

পিশাচ-পিতা।

(গোবিন্দরামের কীর্ত্তি-পর্য্যায়।)

১

একদিন প্রাতে গোবিন্দরাম আমার হাতে একখানা পত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আর একটা নূতন ব্যাপার হস্তগত।"

আমি বলিলাম, "কি ব্যাপার ?"

তিনি বলিলেন, "পড়িয়াই দেখ।"

আমি পত্রখানি পাঠ করিলাম। দেখিলাম, পত্রখানি কোন শিক্ষিতা মহিলা লিখিয়াছেন। পত্রখানি এই ;—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য একটি চাকুরী জুটিয়াছে ; আমি এ সম্বন্ধে আপনার সহিত একবার পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি। কাল সকালে আটটার মধ্যে দেখা করিব। ইতি

অনুগতা

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

আমি পত্রখানি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "ইনি কে ?"

"ইনি একজন ব্রাহ্মিকা, বিশেষ সুশিক্ষিতা, আমার একটী মৃত বন্ধুর ভগিনী!"

"চাকুরী লইবেন, তাহার আবার পরামর্শ কি ?"

"কিছুই জানি না।"

"আটটা তো বাজে, বোধ হয় এখনই আসিবেন।"

"হাঁ, ঐ আসিতেছেন, শোনা যাক্ ব্যাপারটা কি ?"

এই সময়ে একটি পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার বেশভূষা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মুখমণ্ডল সারল্যমণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত।

তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই গোবিন্দরামকে বলিলেন, "আপনি ত শুনিয়াছেন যে, আমার দাদা মারা গিয়াছেন, এখন আমার এমন আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই যে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করি। আপনি চিরকালই আমাকে স্নেহ করেন, এইজন্য আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ইহাতে আর বিরক্ত কি ? বসুন—ঐ চেয়ারে। ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, ডাক্তার বসু।"

রাধারাণী চকিতে মুখ তুলিয়া একবার আমার দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই নতনেত্রে আমাকে নমস্কার করিলেন। আমিও তাঁহাকে নমস্কার করিলাম।

আমি দেখিলাম ইত্যবসরে গোবিন্দরাম তাহার আপাদমস্তক বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন।

রাধারাণী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনি তো জানেন, মেয়ে পড়াইয়া আমার এক রকম চলে; সম্প্রতি বসিয়া আছি; কয়দিন হইল, একটি লোক আমার বাটীতে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। লোকটির বয়স হইয়াছে—পঞ্চাশের উপর। দেখিলে ভক্তি হয়, নিতান্ত ভাল লোক বলিয়াই বোধ হয়। তিনি আসিয়াই আমাকে বলিলেন, "আপনি চাকরি খুঁজিতেছেন ?"

আমি বলিলাম,—হাঁ এখন বসিয়া আছি।"

"আপনার নাম শুনিয়া আসিলাম। আমার একটী শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক।"

"আপনার কোথায় থাকা হয় ?"

"আমার বাড়ী চন্দননগরের কাছেই, ষ্টেশন হইতে ক্রোশখানেক দূরে। আমি আমার স্ত্রী, আর একটি সাত-আট বৎসরের মেয়ে আছে—এই মেয়েটিকেই আপনার পড়াইতে হইবে।"

"তা আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া—"

"এ অনুগ্রহ নয়, এক রকম আপনিই অনুগ্রহ করিতেছেন—কত মাহিনা চাহেন ?"

"আমি পূর্ব্বে যাঁহার বাড়ীতে ছিলাম, তিনি আমাকে প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা করিয়া দিতেন।"

"সামান্য! আপনার মত শিক্ষয়িত্রীর ত্রিশ টাকা মাহিনা কিছুই নহে, আমি আপনাকে একশত টাকা দিব।"

"আপনি আমাকে যতদূর মনে করিতেছেন, আমি ততদূর নহি।"

"নিজের গুণ নিজে কেহ বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, আপনি নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন। ইহাও আমার নিয়ম যে, আমি লোক রাখিলে অর্দ্ধেক মাহিনা অগ্রিম দিই—এই লউন পঞ্চাশ টাকা।"

এই বলিয়া তিনি পাঁচখানা দশ টাকার নোট আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমার বোধ হইল, এরূপ ভদ্রলোক সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম লইলে আমার আসবাবের সমস্ত দ্রব্যাদি কিনিয়া লইতে পারিব। আমি অতি কষ্টে মনের আনন্দোদ্বেগ গোপন করিয়া বলিলাম, "মেয়েটিকেই কেবল পড়াইতে হইবে ?"

"হাঁ, বড় ভাল মেয়ে, তবে আমার মেয়ের আরসুলা মারা বড় বদ্‌-অভ্যাস — আমার এ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে কি না। আমার আর একটি আগেকার পক্ষের স্ত্রীর বড় মেয়ে আছে, সে এখন শ্বশুর বাড়ীতে রহিয়াছে; তবে সে মেয়ে একটু আদুরে।"

"তাহা হউক, আমি বিশেষ আদর-যত্ন করিব।"

"পড়ানো ছাড়া আমার স্ত্রী যাহা বলে, তাহাও আপনাকে করিতে হইবে।"

"অবশ্য করিব বই কি!"

"হাঁ, তাহাতে আপনার বোধ হয় বিশেষ আপত্তি হইবে না। তবে একটা কথা হইতেছে, আমার স্ত্রীর গোটাকতক বিশ্রী রকমের খেয়াল আছে। এই মনে করুন—আমরা যে রকম কাপড় আপনাকে দিব, তাহাই পরিতে হইবে। ইহাতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হইবে না ?"

আমি তাঁহার কথায় বিশেষ বিস্মিত হইলাম। বলিলাম, "না, ইহাতে আর আপত্তি হইবে কেন ?"

"তাহার পর এই মনে করুন—আমার স্ত্রী হয় ত বলিলেন, এইখানে বসো, ঐখানে দাঁড়াও, আপনাকে সেই রকম করিতে হইবে।"

"তাহাতে আপত্তি কি?"

"বেশ ভাল। আর এক কথা, আমার স্ত্রী লম্বা চুল আদৌ ভালবাসেন না। আপনাকে আমাদের বাড়ীতে যাইবার আগে চুল কিছু ছোট করিয়া কাটিতে হইবে।"

আমি এ কথা প্রকৃতই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। পাগল ব্যতীত কোন বিবেচক ব্যক্তি যে এরূপ প্রস্তাব করিতে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না।

আমি বলিয়া উঠিলাম, "সে কি মহাশয়!"

তিনি আমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "এটা আমার স্ত্রীর সব চেয়ে বিশ্রী খেয়াল, লম্বা চুল সে সহ্য করিতে পারে না, দেখিলে তাহার বমি হইতে থাকে। এইজন্য এটা করা আবশ্যক—"

আমি এবার সবেগে বলিলাম "সে কি—তা হতে পারে না!"

তিনি যেন এ কথায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন; বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি চুল কাটিবেন না?"

"না মহাশয়, আপনি বলেন কি!"

তিনি দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে উপায় নাই—আমাকে বিদায় লইতে হইল।" তিনি উঠিলেন। গমনোদ্যতভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কিছুতেই চুল কাটিবেন না?"

"না মহাশয়, আমাকে মাপ করুন।"

তিনি চলিয়া গেলে আমার মনে অনুতাপ আসিল। খরচ-খরচা বাদ প্রতি মাসে একশত টাকা সাধারণ নহে! এ রকম মাহিনা আর আমি কোথায় পাইব? চুল কাটিলেই বা ক্ষতি কি ছিল! চুলে আমার প্রয়োজনই বা কি! বিশেষতঃ ইহাদের বাড়ী ছাড়িয়া দিলেই, আবার শীঘ্রই চুল বড় হইত। একবারে নেড়া হইতে বলিতেছে না তো! আমি লোকটির নাম জিজ্ঞাসা করি নাই, সুতরাং তাহাকে যে পত্র লিখিব, তাহারও উপায় নাই। না বুঝিয়া এমন চাকুরীটা হারাইলাম! তখন মনে মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল, কি করিব স্থির করিতে পারিলাম না। পরদিন ডাকে তাহার এই পত্র পাইলাম। আপনাকে দেখাইব বলিয়া সঙ্গে আনিয়াছি।

এই বলিয়া তিনি গোবিন্দরামের হস্তে একখানি পত্র দিলেন, পত্রখানি এই;—

"শ্রীমতী রাধারাণী দেবী,

আপনার মত শিক্ষয়িত্রী সহজে পাওয়া যায় না। তবে চুল সম্বন্ধে? এটা আমি দুঃখের সহিত অনুরোধ করিতেছি। চুল কাটায় আপনার যে অসুবিধা হইবে, তাহার জন্য আমি আপনার মাহিনা আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত আছি, বোধ হয় ইহাতে এবার আর আপনি অমত করিবেন না, ইতি।

অনুগত

শ্রীরাখালদাস নেউগী।"

রাধারাণী বলিলেন, "দেড় শত টাকা মাহিনা আমি আর কখনও পাইব না, লোভ বড় ভয়ানক জিনিষ, চুল রাখিয়াই বা ফল কি? তবে সন্দেহ হওয়ায় আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি, আপনি কি বলেন?"

গোবিন্দরাম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সন্দেহজনক ব্যাপার সন্দেহ নাই।"

"তাহা হইলে আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন?"

"যখন এত বেশী মাহিনা দিতে চাহিতেছে, তখন অবশ্য ভিতরে একটা কিছু আছে।"

"তা হ'লে কি বলেন?"

"এখন কিছুই বলিতে পারি না, এই পর্য্যন্ত যে, ভিতরে একটা কিছু আছে।"

"তাহা হইলে আমি যাইব না?"

"যাইতে ক্ষতি নাই, কোন বিপদাপদের সম্ভাবনা দেখিলে আমাদিগকে পত্র লিখিলেই আমরা গিয়া উপস্থিত হইব।"

"আপনি ভরসা দিলেই যেতে পারি।"

"যাও—ব্যাপারটা কি জানাও উচিত।"

"কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি?"

"না থাকিতে পারে, এত অধিক মাহিনা দিয়া যখন লইতেছে, তখন কিছু ব্যাপার আছে।"

"তাহা হইলে যাইব?"

"যাও।"

"আপনি ভরসা দিলে, আমি জানি, আমার কেহই কিছু করিতে পারিবে না" এই বলিয়া রাধারাণী প্রস্থান করিলেন।

আমি বলিলাম, "এ স্ত্রীলোকের যে কেহ কিছু করিতে পারে, তাহা বোধ হয় না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, বিদুষী, বুদ্ধিমতীও খুব।"

২

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। আমরা প্রায় রাধারাণীর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। গোবিন্দরাম ভুলিয়াছিলেন কি না, জানি না, তবে তিনি এ কথার আর উত্থাপন করেন নাই।

এক মাস পরে একদিন আমার সম্মুখে গোবিন্দরাম একখানি পত্র ফেলিয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, পত্রখানি রাধারাণী লিখিয়াছেন। পত্র এই ;—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ ৩টার গাড়ীতে অবশ্য অবশ্য আসিবেন, আমি ষ্টেশনে থাকিব, ইতি।

রাধারাণী।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার যাইবে!"

আমি বলিলাম, "হাঁ এ রহস্যের ভিতর কি আছে, জানিবার জন্য আমিও একটু ব্যগ্র হইয়াছি।"

"তবে প্রস্তুত হও।"

আমবা তিনটার গাড়ীতে চন্দন-নগর যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে বহুক্ষণ গোবিন্দরাম নীরবে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "কি বুঝিতেছ, ডাক্তার ?"

আমি বলিলাম, "কি বিষয়ে ?"

"এই রাধারাণীর বিষয়।"

"আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

"একটা বিষয় স্থির যে, ইহাকে কেহ আটকাইয়া রাখে নাই।"

"কিসে জানিলে ?"

"তাহা হইলে রাধারাণী ষ্টেশনে আসিতে পারিত না।"

"হাঁ, এখন বুঝিতেছি। কিছু স্থির করিতে পারিলে ?"

"অনেক বিষয় মনে মনে স্থির করিতেছি, কিন্তু কোন বিষয়ে এখনও স্থির নিশ্চিত হইতে পারি নাই।"

তিনি আবার নীরব হইলেন। অন্যমনস্ক হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী চন্দন-নগরে দাঁড়াইল। আমি মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, রাধারাণী ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

আমরা নামিলে তিনি সহাস্য মুখে আমাদের নিকটে আসিলেন। বলিলেন

"আমি আজ সুবিধা পাইয়া আপনাদিগকে আসিতে লিখিয়াছি। আজ রাখাল বাবু তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কুটুম্বের বাড়ীতে গিয়াছেন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বেশ, এখন ব্যাপার কি শুনি। এই দিকে এস, ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে।"

গোবিন্দরাম ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি ওয়েটিং রুম খুলিয়া দিলেন। আমরা তিন জনে সেই ঘরে বসিলাম। বসিয়াই গোবিন্দরাম বলিলেন, "এখন শুনি—একে একে সব বলিয়া যাও।"

"তাহাই বলিতেছি।"

"হাঁ, আদ্যোপান্ত যাহাতে সব বুঝিতে পারি।"

"প্রথমে এখানে আমার কোন কষ্ট নাই, সকলে খুব যত্ন করেন।"

"তবে, অসুবিধা কি ?"

"এই আমি ইঁহাদিগকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কেন ?"

"সব বলিতেছি, রাখাল বাবুর বাড়ী একটা বাগানের ভিতরে ; বেশ ভাল বাগান—বাড়ীটাও ভাল। তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদা বিষণ্ন, দেখে মনে হয়, যেন তাহার কি একটা পীড়া আছে, আর আদর দিয়া দিয়া মেয়েটির মাথা একেবারে খাইয়াছে—মেয়েটির যে কিছু লেখাপড়া হইবে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না।"

"তা যা হউক, সেজন্য আমার বিশেষ দুঃখ নাই : তাহার পর কি, বল।"

"তাহাদিগের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে বিশেষ ভালবাসা আছে, এমন কিছু দেখি না।"

"ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই ; নূতন খবর কি ?"

"আমি যেদিন এখানে আসি, তাহার দুই দিন পরে একদিন রাখাল বাবুর স্ত্রী রাখালবাবুর কানে কানে কি বলিলেন। তখন রাখালবাবু আমাকে বলিলেন, "আপনার জন্য এই নীলরঙ্গের কাপড়খানি আনিয়াছি। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা, আপনি এখনই এ কাপড়খানা পরুন।"

অগত্যা বাধ্য হইয়া আমি সেই কাপড়খানি পরিলাম। তখন রাখাল বাবু বলিলেন, "এই জানালার কাছে বসুন, এই দিকে মুখ ফিরাইয়া বসুন।"

আমি এ প্রস্তাবে বিস্মিত হইলাম। কিন্তু করি কি, পূর্ব্বেই ইহাতে সম্মত হইয়াছিলাম, কাজেই কোন আপত্তি না করিয়া সেইরূপ করিলাম। তখন রাখাল বাবু আমার সম্মুখে বসিয়া নানা হাসির খোসগল্প করিতে লাগিলেন,

আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ এই রকম গল্পসল্প করিয়া রাখাল বাবু বলিলেন, "এখন এ কাপড় ছেড়ে ফেলুন।"

কি করি —তাহাই করিলাম। এই রকম প্রায় রোজ হইতে লাগিল। আমি সন্দেহ করিলাম যে, ইহা কেবল খেয়াল নহে, ইহার ভিতরে কিছু রহস্য আছে। বোধ হয়, জানালা দিয়া আমাকে কেহ দেখে, কিন্তু আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। কারণ রাখাল বাবু আমাকে জানালার দিকে পিছন করিয়া বসিতে বলেন। আমার পিছনে কেহ থাকে কি না, দেখিবার জন্য আমি একদিন একখানা ছোট আর্সি ভাঙ্গা আঁচলের মধ্যে লুকাইয়া লইলাম, পরে আঁচলে মুখ মুছিবার ছলে সেই আর্সি গোপনে ধরিয়া দেখিলাম, কে একজন যুবক দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের এই জানালার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। মুখ হইতে আঁচল অপসারিত করিয়া দেখি, রাখাল বাবুর স্ত্রী আমার মুখের দিকে সন্দিগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহার দিকে চাহিবামাত্র তিনি সেই গবাক্ষ-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "দেখ, একটা ছোঁড়া আমাদের বাগানের বাহিরে বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

রাখাল বাবু বলিলেন, "হাঁ, বদ্ লোকটা এই দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে।"

রাখাল বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "কে এই অসভ্য লোক—আমাদের রাধারাণীর দিকে অমন করে চেয়ে আছে?"

রাখাল বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কোন চেনা লোক নয়?"

আমি বলিলাম, "এখানে আমার চেনা লোক কেহ নাই।"

"তাহা হইলে উহাকে ওখান হইতে চলিয়া যাইতে বল।"

আমি বলিলাম, "উহাকে না দেখাই ভাল।"

"না না—লোকটা তাহা হইলে রোজ এই রকম বিরক্ত করিতে আসিবে।"

কাজেই তাঁহাদের অনুরোধে আমি হাত নাড়িয়া সেই লোকটাকে সরিয়া যাইতে বলিলাম। তখন রাখাল বাবু জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেই দিন হইতে আর আমাকে সে কাপড় পরিতে হয় নাই, আমাকে সেই জানালায় আর বসিতেও হয় নাই। সে দিন হইতে আমি সেই লোকটিকেও আর দেখিতে পাই নাই।"

ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

হংকঙের পথে।

সন্ধ্যার সময় সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজে উঠিলাম, কিছুক্ষণ পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। পরদিবস আমরা চীন-সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। বঙ্গোপ-সাগরের ন্যায় ইহা তরঙ্গসঙ্কুল নহে বটে কিন্তু ফিরিবার সময় চীন উপসাগরে আমরা যে ভীষণ ঝটিকার মধ্যে পড়িয়াছিলাম তাহা মনে হইলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়! এই সকল ঝড়কে "টাইফুন" কহে। বঙ্গোপসাগরের "সাইক্লোন" অতীব ভীষণ। "টাইফুন" তাহা অপেক্ষা ভীষণ! সেদিন প্রভাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ফোঁটা ফোটা করিয়া সমুদ্রের নীলজলে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তরঙ্গরাজি স্বাভাবিক হইতে কিঞ্চিদধিক সচঞ্চল; পবন কিছু অধিক বেগে বহিতেছিল। ক্রমে পবনের ও সমুদ্রের গর্জ্জন বাড়িতে লাগিল। আমাদের জাহাজখানি তরঙ্গের সহিত উঠিতে পড়িতে লাগিল। তরঙ্গের শিরে জাহাজ স্থির থাকিতে পারে না। একদিকে না এক-দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেই হইবে। এইরূপে জাহাজ এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তরঙ্গগুলি আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। উত্তাল তরঙ্গ জাহাজকে বহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া ছাড়িয়া দেয়। জাহাজের পশ্চাদবর্ত্তী গতি চক্র (Propellor) তখন জল হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যে ঘুরিতে থাকে। তখন একটা এমন শব্দ হয় যে মনে হয় যেন জাহাজখানি ভগ্ন হইয়া গেল। আবার যখন তরঙ্গটী অপসারিত হইল তখন জাহাজখানি ভীষণ বেগে বারিগর্ভে নিপতিত হয়। তখন দুই পার্শ্ব হইতে পর্ব্বত সদৃশ ঢেউ আসিয়া জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া যায়। জাহাজের যাত্রীরা ফুটবলের মত জাহাজের ভিতর গড়াইতে থাকে। আমরা তখন উপুড় হইয়া শুইয়া এক একটা খোঁটা ধরিয়া কোন রকমে আপনাদের দেহ একস্থানে রক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সময় বায়ু এত প্রবল হয় যে, জাহাজ তাহার অনুকূল গতিতে থাকিলে তাহাকে যে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে তাহা বলা অসম্ভব। সেই জন্য এ সময় জাহাজকে বায়ুর প্রতি-কূলে চালাইতে হয়। দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির সহিত মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত জাহাজের এই রণ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

জাহাজের গতি প্রতিকূল বায়ুর দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে। ওদিকে চারি-

দিকে ভীমকায় তরঙ্গরাশি, ক্ষুদ্র পোতখানিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে. সেই বিপদে অন্য একটী তরঙ্গ আসিয়া জাহাজকে সেই বারিরাশির কবর হইতে তুলিয়া ফেলিল। ক্ষণিকের জন্য জাহাজ তরঙ্গ শিরে বিশ্রাম করিয়া আবার এক পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল। আবার চতুর্দ্দিক হইতে তরঙ্গরাশি আসিয়া জাহাজকে আবরণ করিয়া ফেলিল। জাহাজের ঘর, অলিন্দ, ডেক সব জলে ধৌত হইতে লাগিল। ডেক চারিদিক হইতে আঁটা। সেখানে জল প্রবেশ করিবার উপায় নাই। উপরে চারিদিক উন্মুক্ত। জল পতিত হইবামাত্র বাহির হইয়া যাইতেছে। পবন ও তরঙ্গের কি ভীষণ গর্জ্জন! যেদিকে চাও কেবল পর্ব্বতাকারে তরঙ্গ; কোন দিক্ দর্শন হইবে না। এই তরঙ্গরাজি ভেদ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। যাত্রীদের মুখে কথা নাই, ভয়ে পাংশু বদন। জাহাজের কর্ম্মচারী সাহেবেরা জুতা খুলিয়া হাঁটু অবধি ইজের গুটাইয়া জাহাজ ধরিয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব। আবার গুণ গুণ করিয়া তান ধরিয়াছেন। আমি তখন নিরাশ অন্তরে উপুড় হইয়া "সেলুন" ডেকে শুইয়া আছি। সাহেবেরা সকলকে ক্যাবিনে যাইতে বলিলেন। সকলেই প্রায় ক্যাবিনে গেল, আমি যাইলাম না। আমি ভাবিলাম, ক্যাবিনে আবদ্ধ হইয়া মরণ অপেক্ষা জলে ভাসিয়া মরণ শ্রেয়ঃ। আত্মীয় স্বজনের জন্য মনটা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। বোধ হয় আমার মনের ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেন না সেই সময় একজন কর্ম্মচারী সাহেব আমার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া বলিল "Don't you like it ?" আমি বলিলাম,—না, ইহা আমার মনের মত নহে। তখন সে আমায় আশ্বাস দিয়া গেল "Don't be afraid, it will pass off." সেই সময় দুর্দ্দান্ত পবনদেব জাহাজের পার্শ্বস্থিত একখানা "লাইফ বোট" উড়াইয়া লইয়া গেল। আমার মনে আরও ভয় হইল, কিন্তু ঈশ্বরের নাম স্মরণ ব্যতীত কোন উপায়ান্তর ছিল না। যাহা হউক, সমস্ত দিনের পর পবনের গতি একটু মৃদু হইয়া আসিল, ঢেউগুলির কলেবরও ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। নিশার আগমনের সহিত সমুদ্র যেন কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলেন। এইরূপে সে যাত্রা আমরা রক্ষা পাইলাম। শুনিলাম, কখন কখন এইরূপ ঝড় পাঁচ ছয় দিন থাকে। যাহা হউক, জাহাজ কোনরূপে ভগ্ন না হইলে কিম্বা কোথাও না আটকাইলে বিশেষ ভয়ের কারণ নাই।

ষষ্ঠ দিবস প্রত্যুষে আমরা হংকঙের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। চারিদিকে কেবল ছোট ছোট পাহাড়, এক পাহাড়ের পর আর এক পাহাড়। সকল পাহাড়েই কিছু কিছু বসবাস আছে। তাহার মধ্য দিয়া জাহাজ যাইতে লাগিল। এখানে জল স্থির অচঞ্চল। এই সময় একটী পর্ব্বতের গাত্র দিয়া লোহিত বরণ তরুণ তপন উদিত হইতে লাগিলেন। বালার্কের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় সাগর এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রকৃতির এই অভিনব সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম।

হংকঙ্।—অর্ণবপোতের গতি মৃদু হইয়া আসিলে, দূর হইতে এক উচ্চশির পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। চিত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকায় পর্ব্বত গাত্র আচ্ছন্ন। অট্টালিকার উপর অট্টালিকা, পথ কোথায় তাহা নির্ণয় করা যায় না। এ পর্ব্বতটী যে কি তাহা একজন সাহেব কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, ইহারই নাম 'হংকঙ'। "হংকঙ" এই বিশ্রী নামে যে এমন অমরাবিনিন্দিত স্থান দেখিতে পাইব তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। সুনীল অম্বুরাশির মধ্যে ধবলকায় অদ্রি, সেই অদ্রির কলেবরে মানব-শিল্পের অপূর্ব্ব চাতুর্য্যে নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। এক অদ্রির শোভাই কিরূপ চিত্তাকর্ষক, তাহার উপর আবার সমুদ্রের সুনীল শোভায় তাহা শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমাদের জাহাজখানি ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুইদিকে তিন চারি খানি চীনাদের নৌকা দেখিলাম। নৌকাগুলি দাঁড়াইয়া ছিল, যেমন জাহাজখানি সম্মুখে আসিল অমনি তাহারা একটা খুব লম্বা বাঁশের আঁকসি জাহাজের কোন একটা স্থানে লাগাইয়া দিল। তখন নৌকাখানি জাহাজের গতিতে চালিত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে তাহারা একটা দড়িতে বাঁধা হুক্ জাহাজের উপর নিক্ষেপ করিল। জাহাজের একটী খালাসী সেই হুকটী জাহাজের এক স্থলে আটকাইয়া দিল। নৌকা হইতে তিন চারিজন চীনা সেই দড়ি ধরিয়া জাহাজের গা বাহিয়া জাহাজে উঠিয়া পড়িল। ইহাদের উদ্দেশ্য জাহাজ বন্দরে উপনীত হইলে মাল নামাইবে। কুলীর জন্য আর অপেক্ষা করিতে হইবে না।

জাহাজ বন্দরে আসিয়া উপনীত হইল। নিয়মিত ডাক্তারের পরীক্ষার পর যাত্রীরা নামিবার জন্য ব্যস্ত হইল। জাহাজ হইতে তীরে যাইতে হইলে নৌকায় যাইতে হয়। এখানে নৌকাকে 'শ্যাম্পন' (Shampon) বলে।

এত অধিক নৌকার সমষ্টি এক চীনদেশ ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। 'শ্যাম্পন' গুলি বেশ বৃহৎ। সমস্ত বন্দরটীর যে দিকে চাও, নৌকায় পরিপূর্ণ দেখিবে। ইহাকে একটী "তরণী উপনিবেশ" বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। প্রত্যেক নৌকাতেই একটী সম্পূর্ণ পরিবার বাস করিয়া থাকে। স্বামী, স্ত্রী ও অনেক-গুলি পুত্র কন্যা। তাহাদের আর বিভিন্ন বাসস্থান নাই। বৎসরের সকল ঋতুতে এই সাগর মধ্যেই বাস। নৌকার মধ্যস্থলে একটী কামরা, তাহার তিন দিকে বেঞ্চি। বেশ পা ঝুলাইয়া বসা যায়। নৌকাস্বামীর ছেলেপুলেগুলি চারিদিকে ক্রীড়া করিতেছে। তোমার নিকট হইতে হয়ত কাতর স্বরে দু'একটী পয়সা ভিক্ষা করিতেছে। এই সকল চীনেদের প্রতি মা ষষ্ঠীর বেশ কৃপা দেখি-লাম। সব নৌকাগুলিই ছোট বড় বহু সন্তানে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত প্রায় নৌকাস্বামীনিদের পৃষ্ঠে একটী করিয়া শিশু কাপড়ের থলিতে বাঁধা।

নৌকার সম্মুখভাগের কাঠ উঠাইলেই একটী উনান দেখা যায়—তাহাতেই এই পরিবারের পাকক্রিয়া হইয়া থাকে। পশ্চাদভাগে, যেখানে কর্ণধার দণ্ডায়মান হয়েন, তাহার পদনিম্নে ইহাদের ভাণ্ডার, তাহারই মধ্যে ইহাদের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হয়। রাত্রে বসবাস অবশ্য মধ্যস্থ বৃহৎ কামরাতেই হইয়া থাকে।

বৃহৎ মাল বোঝাইয়ের নৌকাগুলির ব্যবস্থা আরও সুন্দর। ইহার দুই প্রান্ত ভাগে বেশ স্বচ্ছন্দে দুইটী পরিবার থাকিতে পারে।

পরিবারস্থ সকলেই নৌকা পরিচালনা করিয়া থাকে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই পৃষ্ঠেই "কাল ভুজঙ্গিনী সম" বেণী লম্বিত। (আজ কালকার কথা বলিতেছি না) পুরুষদেরও বদন মণ্ডল গুম্ফ শ্মশ্রুবিরহিত। স্ত্রী পুরুষের একই প্রকার বেশভূষা। তাহাদের দেখিলে মনে হয় 'তুমি পুরুষ কি নারী চিনিতে না পারি'।

অনেক নৌকাতেই পুরুষে দাঁড় টানে; সে নৌকাস্বামী। যদি দাঁড় ধরিতে পারে এমন যুবতী থাকে, তবে পুরুষকে আর সে কার্য্য করিতে হয় না।

নৌকার কর্ণধার সকলেই রমণী। যেদিকে চাও, যে নৌকাতেই দেখ, সর্ব্বত্রই রমণী কর্ণধার। কাহারও পৃষ্ঠে, সদ্যজাত শিশুসন্তান বাঁধা। ক্ষুদ্র শিশু অকাতরে ঘুমাইতেছে, রমণী তবুও হাল ধরিয়া দণ্ডায়মান। অধিকাংশই যুবতী—কারণ যে নৌকায় অবিবাহিতা যুবতী কন্যা থাকে, সে নৌকার কর্ত্রী আর হাল ধরে না, দাঁড় টানে। সৌখীন যাত্রীরা যুবতী কর্ণধারের নৌকাই

অধিক পছন্দ করেন। তবে বৃদ্ধারাও এককর্ম্মে উদাসীনা নহে। অনেকগুলি নৌকায় দেখিলাম সকলেই রমণী। পুরুষেরা স্থলে কেনা বেচা করে। তাহারা নৌকায় আসিয়া নিশিযাপন করিয়া থাকে।

ইহাদের সকলেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। বেশ মোটা কাপড়, অনেকটা আমাদের ছাতার কাপড়ের ন্যায়। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পরিধানে একটা ঢিলে পায়জামা ও চায়না কোট। অবিবাহিতা যুবতীদের মাথায় একটা ঐ কৃষ্ণ বস্ত্রের ছোট আবরণ আছে। এই কাল পোষাকের মধ্যে তাহাদের শুভ্র বদনমণ্ডল, সরসীর নীলজলে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় দেখাইতে থাকে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অতি সুস্থ সবলকায়। চীনেদের মত এরূপ কর্ম্মী সতেজ দেহ অতি অল্প দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।

জাহাজে উঠিয়া চীনা পুরুষেরা নৌকায় লইয়া যাইবার জন্য যাত্রীর জিনিষ পত্র লইয়া টানাটানি করিতে থাকে। ওদিকে নৌকা হইতে যুবতী কর্ণধারেরা আপন আপন নৌকায় আনিবার জন্য যাত্রীদের ডাকাডাকি করে।

এ সময় নৌকা ঠিক করা দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষের পক্ষে বড়ই সমস্যার কথা। সর্ব্বপ্রথম যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহার নৌকাতেই এ সময় উঠা উচিত। আমার অদৃষ্টে এক বৃদ্ধা কর্ণধারের বহু সন্তানসন্ততিপরিপূর্ণ নৌকা জুটিয়াছিল। তাহাতেই তীরে অবতরণ করিলাম। ইহাদের মধ্যে কোন রমণীকেই ক্ষুদ্র পাদবিশিষ্ট দেখি নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

হিমাচল

ঢাকিয়া আকাশ কে ঐ দাঁড়ায়ে,
স্বর্গ ধরিতে হস্ত বাড়ায়ে ?
বিশ্বে শরীরী ধূর্জ্জটি উনি—
মহাযোগী হিমালয় !

যেন মায়া-পটু কুহকী-কুহকে
দ্যুলোকে ভূলোকে বিথারি পুলকে—
স্তব্ধনিথর ক্ষিপ্ত পাগল
নীরধি-উর্ম্মিচয় !

নীহার-মৌলি উদ্যত কূট
লট্‌পটি লোটে মেঘ জটাজুট,
হিম-শুক্লিমা গ'লে গ'লে পড়ে
হাজার বর্ণ ফোটে—

ঝরে ঝরণার রূপালী নিঝর,
ঠিকরে শীকরে মুকুতা-নিকর—
টিট্‌কারি দিয়ে পিচ্‌কারি খেলে
উপলঘাতিনী ছোটে !

* * *

লুপ্ত রবির স্বর্ণ-পতাকা,
নীচে, দূরে—দূরে উড়িছে বলাকা—
মধুর মধুর মধুজা বধূর
মধুর কুঞ্জচয়।

ললিতা সন্ধ্যা জড়িমা-কলিতা,
দীপ্ত তারার রৌপ্য-সলিতা ;
হের, ধীরে ধীরে নিরালা শিখরে
মৌন চন্দ্রোদয়।

মাঝে গিরিপথ,—দু'ধারে পাহাড়,
এদিকে আলোক,—ওদিকে আঁধার!
নিম্নে অতল অন্ধ গহেরা
পড়িলে ফুরাবে আয়ু!

গুঁড়ি মেরে গিরি—ধূসর, আহুড়,
ঝট্‌পটি পাখা উড়িছে বাদুড়,
দূর গহ্বরে পাক্‌সাট্‌ দিয়ে
চীৎকার করে বায়ু!

* * *

উল্লোলে হো হো! কর্ণ বধির,
উল্লাসে একি লাস্য অধীর,
নামে উদগ্র আকাশগঙ্গা
দীপ্র উল্কাসম।

কুহরে কুহরে আছাড়ি' গাত্র,
ফোটে টগ্‌বগ্‌ ফেনার পাত্র,
কুল্‌কুচা করি লক্‌লকি বেগে
ফুঁসিছে উরগোপম।

ঐ দাবাগ্নি উগ্রচণ্ড,
ধ্বস্তকীর্ণ শৈলখণ্ড,
বৃক্ষকাষ্ঠ রুক্ষ শব্দে
তীব্রে ক্ষিপ্র ফাটে—

উড্ডীন ব্যোমে ছন্ন পর্ণ,
অগ্নিস্তোম ধূম্রবর্ণ,
নর্ম্মহ্লাদে ক্রুদ্ধ দৈত্য
মত্ত হিক্কাঠাটে!

* * *

কোথায় মানব—কোথায় ধরণী,
কোথায় চলেছি—এ কোন্ সরণী,
আগুনের তাপে তামাটে আকাশ,
কোথায় এসেছি আমি!

যত উঠে যাই—তত উঠে যাই,
যত নেমে যাই—আরো নীচু পাই,
উর্দ্ধে অসীম,—নিম্নে অসীম,
কোথা উঠি,—কোথা নামি?

নিয়তির নেমি ঘুরে অহরহ,
ঘুরে রবি সোম তারকা-গ্রহ
বিশ্বনিখিল ;—লক্ষ তটিনী
জলধি নৃত্য করে।

সচল ভুবনে তুমি অচপল,
আত্ম-মগন, স্তব্ধ অটল,
উদাসীন ঠাটে দেখিছ, কাহারা
আসে, যায়, ওঠে, পড়ে!

দেখেছ অতীতে তরুণ তপনে,
পূত তপোবনে, প্রভাত-পবনে,
দীপ্তসমিধ—অগ্নিহোত্রে
অগ্নিধ-হুত-দান।

দেখেছ কোশল—নাই সে রাঘব,
রয়েছে মথুরা—নাই সে মাধব,
কোথা হস্তিনা, কপিলাবস্তু,
উজ্জয়িনীর মান?

* * *

তুমি কি বিশাল জগৎ-প্রাকার!
বিরাট ধ্যানের মূর্ত্তি সাকার!
তুমি কি প্রেমিক! তুমি কি বিরহী!
তোমার উপমা নেই!

কত সভ্যতা, গেছে কত দেশ,
কত জাতি গেছে, কত যুগ শেষ,
কত প্রাণ গেছে মহাপ্রাণে মিশে,
তুমি একরূপ সেই।

মোদের জীবন—নিশার স্বপন!
আমার ভুবন,—আমার ভবন,
আমার গগন, আমার পবন,
ক্ষণিকে আমার নয়।

কঠিন মরণ কহিবে সেদিন,
"ভেঙ্গে গেছে বীণ, ওঠ্ রে প্রবীণ!"
টুটিবে নবীন হেম সংসার
নবীন পুলকময়।

*　*　*

অহো আনন্দ! বিপুল ছন্দে,
ভুমার নন্দে হৃদয় বন্দে,
তোমার অতনু উরসে উঠিয়া
ক্ষুদ্রতা যাই ভুলি'।

ধরণীতে থাকে ধরণীর প্রাণ!
মানবের দীন মান-অপমান,
বন্য পশুর হিংসা-গরল
দুঃ নয়ন তুলি।

ছাড়িয়া তোমার ঝরণা-ঝরণ,
উপত্যকার পাটল বরণ,
শ্যামল কানন, ধবল শিখর,
পবন, গগন, চাঁদে।

ফিরে যেতে হবে বিদায়—বিদায়!
আবার চলিনু ধরণী-হিয়ায়,
বর্ব্বরতার নিঠুর পীড়নে
আতুর-আর্ত্তনাদে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বিষ্ণু সংহিতায় দণ্ডবিধি।

(১)

কোনও সমাজ জ্ঞানালোকদীপ্ত হইয়া যতদিন সুসভ্য না হয়, ততদিন সে সমাজে প্রকৃত দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত হয় না, পাশ্চাত্য আইন-শাস্ত্রকার (Jurist) দিগের ইহা ধারণা। আধুনিক সমাজে আমরা যেমন স্বত্ব সম্বন্ধীয় (দেওয়ানী) এবং দণ্ডসম্বন্ধীয় (ফৌজদারী) পৃথক পৃথক আইনের প্রচলন দেখিতে পাই, প্রাচীন সমাজে আইন শাস্ত্রের সেরূপ পার্থক্য ছিল না,এই কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। রোম, গ্রীস, প্রাচীন জার্ম্মানী প্রভৃতিতে এক প্রজা কর্ত্তৃক অপর প্রজার স্বত্বা-পহরণের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আইন ছিল; কিন্তু আধুনিক সমাজে যাহাকে crimes বা ফৌজদারী অপরাধ বলে, প্রাচীন সমাজে সেরূপ কোনও ধারণার অভাব ছিল, সার হেনরী মেন প্রমুখাৎ পণ্ডিতদিগের ইহা অভিমত।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিবাদের পার্থক্যটা ব্যবহারজীবী ব্যতীত সাধারণ

পাঠকের পক্ষে ততদূর সহজে বোধগম্য নহে। রাম কলহ করিয়া লগুড়াঘাতে শ্যামের নাসিকার অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্র বিবাদটা কেবল রাম ও শ্যামের ইহা ভাবিয়া ক্ষান্ত হয় না। রাম সমস্ত সমাজের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে, শ্যামের সহিত কলহ করিয়া রাম সমস্ত সমাজের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, আধুনিক সমাজ রাম-শ্যামের কলহটা এইরূপ চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। সুতরাং রাম কেবলমাত্র শ্যামের ক্ষতি করিলেও, রাজা স্বয়ং রামের বিপক্ষে বাদী হইয়া দাঁড়ান এবং আহত শ্যাম নিজে রামের সহিত বিবাদ মিটাইয়া লইতে চাহিলেও আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্রের বিচারালয় রামকে নিষ্কৃতি দিতে চাহে না। চুরি জুয়াচুরি, দস্যুতা বা গৃহদাহন কেবল ব্যক্তিগত বিবাদ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এ সকল অপরাধে রাষ্ট্রের শান্তিভঙ্গ হয়, সুতরাং এ সকল রাষ্ট্রের বিপক্ষে অপরাধ।

যেদিন হইতে সমাজ প্রজামাত্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করে, সেই দিন হইতেই সমাজে দণ্ডবিধির প্রচলন হয়। সেই দিন হইতেই শস্যাপহরণ করিলে অপরাধীকে দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়, নরঘাতককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় এবং পরস্ত্রী হরণ পাতকের জন্য বিধিমত শাস্তি ভোগ করিতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সমাজ বেশ উন্নত না হইলে তথায় এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় না। রোম, গ্রীস প্রভৃতি প্রদেশ য়ুরোপীয় আইনের জন্মস্থান হইলেও তথায় বহু পরে দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সমাজ আদিম বর্ব্বরতার অবস্থা কাটাইয়া উঠিলে, সমাজরক্ষককে রাষ্ট্রাভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেক প্রজার স্বত্বরক্ষা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ আপনাপন পরিশ্রমের ফলভোগ হইতে বঞ্চিত হয়, যে দেশের লোক আপনার উপার্জ্জনলব্ধ ধন ভোগ করিতে না পারে সে দেশের পক্ষে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং মনুষ্য সমাজ গঠনের প্রথমাবস্থা হইতেই সমাজনায়ককে প্রজাদিগের স্বত্ব সম্বন্ধে নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। যে নেতা তাহা করিতে পারে না, সমাজে তাহার নেতৃত্ব বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব।

এই স্বত্ব সাধারণতঃ ত্রিবিষয়ক। প্রথম স্বত্ব প্রত্যেকের শরীর রক্ষা সম্বন্ধীয়। যে কেহ ইচ্ছা করিলে অপরের হস্ত পদ বা নাসিকা ছেদন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না বা তাহাপেক্ষা হীনবল ব্যক্তির বাহু ধরিয়া তাহাকে স্রোতস্বতীর জলে

নিক্ষেপ করিতে পারিবে না—সে বিষয়ে নিয়মাদি সকল সমাজকেই উদ্ভাবিত করিতে হয়। দ্বিতীয় স্বত্ব সম্পত্তি সম্বন্ধীয়। যাহাতে রাজ্যের একজন প্রজা অপর প্রজার পরিশ্রমলব্ধ ধনরত্নাদি ইচ্ছাক্রমে নিজস্ব করিয়া লইতে না পারে, প্রত্যেক রাজাকে সে বিষয়ে আইন প্রবর্ত্তন করিতে হয় কেবল শরীর বা সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ক নিয়ম করিলেই মানবের সকল অভাব দূর হয় না। সমাজ যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হয় মানুষের যশের মূল্য সেই পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহাতে কেহ কাহারও নিন্দা বা অপযশ ঘোষণা করিতে না পারে, যাহাতে একজন প্রজা আপনার ইচ্ছামত অপরকে গালি দিয়া সাধারণের নিকট তাহাকে হেয় করিতে না পারে, সভ্য সমাজকে সে বিষয়েও নিয়ম বাঁধিতে হয়।

প্রাচীন সমাজে দণ্ডবিধি ছিল না বলিয়া প্রাচীন সমাজে এই ত্রিবিষয়ক স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় ছিল না, পাশ্চাত্য মনীষিগণ তাহা বলেন না। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জীবননাশ করিলে আধুনিক বিচারপতি যেমন হত্যাকারীর প্রাণবধের আজ্ঞা দেন, প্রাচীন সমাজে সেরূপ দণ্ডাজ্ঞার প্রচলন ছিল না। "Eye for eye and limb for limb," চক্ষুর জন্য চক্ষু এবং ইন্দ্রিয়ের জন্য ইন্দ্রিয়—ইহা প্রাচীন অৰ্দ্ধসভ্য জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতির নিয়ম ছিল। একজন অপরকে হত্যা করিলে নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গ হত্যাকারীকে বধ করিত, তাহাতে রাজা কিছু বলিতেন না। কেহ কাহারও হস্তচ্ছেদ করিলে খণ্ডিতবাহুর গোষ্ঠীবর্গ ইচ্ছা করিলে অপরাধীর হস্তচ্ছেদ করিয়া আপনাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিত। তাহা না পারিলে তাহারা রাজদ্বারে বিচারের জন্য আসিত। তখন রাজা নিহত ব্যক্তির জীবনের বা কর্ত্তিত হস্তের একটা মূল্য নিরূপণ করিয়া অপরাধীর নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া নিগৃহীত ব্যক্তির পরিবারকে প্রদান করিতেন। এখনকার 'হরজতের দাবী' বা Damage suitএ যে পদ্ধতির বিচার হয় তখনকার বিচার সেই মত হইত। আধুনিক সভ্যজগতে একজন অপরের অপবাদ করিলে সে torts আইন মত তাহার নিকট হইতে যশের মূল্য স্বরূপ কিছু অর্থ আদায় করিতে পারে কিম্বা ফৌজদারী বিচারে তাহার দণ্ড করাইতে পারে। প্রাচীন সমাজে শেষোক্ত উপায়ে অপরাধের শাস্তি দিবার পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল। হত্যা, চুরি বা মানহানির জন্য একজনকে অপরের ক্ষতি-পূরণ করিতে হইত মাত্র।

(২)

প্রাচীন ভারত সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র,

ন্যায়, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের কীর্ত্তিকাহিনী চিরদিন ভারতের সভ্যতার মহিমা ঘোষণা করিবে, স্মৃতি বা আইন শাস্ত্রেও তেমনি ভারতের সর্ব্বদিকস্পর্শিণী প্রতিভার অমল যশ সৌরভ যুগ যুগান্তর স্থায়ী। দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তন যদি উচ্চ সভ্যতার প্রমাণ হয় তাহা হইলে ভগবান মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের সময়ে ভারতবর্ষ যে সভ্যতার সোপানের অতি উচ্চে আরোহণ করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। মনুসংহিতা প্রভৃতির শরীর সম্পত্তি বা মান সম্বন্ধীয় স্বত্বের তত্ব যেমন বিশদ উহাতে দণ্ডবিধির রহস্য বর্ণনাও তাদৃশ বিশাল। আমরা এ প্রবন্ধে বিষ্ণু সংহিতায় দণ্ডবিধি আইনের কিঞ্চিৎ আভাষ দিব। তাহা হইতেই সপ্রমাণ হইবে যে, প্রাচীন হিন্দুজাতি সভ্যতা ও নীতি সম্বন্ধে জগতে কিরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিত।

(৩)

সমাজ উন্নত হইলে দণ্ডবিধি উদ্ভাবিত হয়, সমাজ যেমন উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় দণ্ডবিধিও তেমনি উৎকর্ষ লাভ করে। শিক্ষিত সমাজ যেমন দণ্ডবিধির উন্নতি সাধন করে দণ্ডবিধিও তেমনি সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। সমাজে নীতিজ্ঞানের প্রসারের সহিত দণ্ডবিধির প্রসার হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সমাজ বিভিন্ন আদর্শে গঠিত। কালের সহিত মানবের আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। জ্ঞানের উন্নতির সহিত মানুষের নীতির উন্নতি হয়। এক সমাজে যাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তদপেক্ষা অল্পসভ্য সমাজে তাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় না। আজিও আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে মানুষ মানুষ মারিয়া ভক্ষণ করে। আমাদের সমাজে নরশোণিত যত মূল্যবান বর্ব্বর সমাজে নরশোণিত তত মূল্যবান নহে। ঐ সকল নরভোজী সমাজ যত উন্নতির দিকে ধাবমান হইবে উহাদের নীতিজ্ঞানও তত বিশুদ্ধতা লাভ করিবে। নীতির উন্নতি হইলেই তাহাদের আইনের উন্নতি হইবে এবং এক দিন সেই পশু সমাজ সদৃশ নর সমাজেও নরহত্যা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোনও কর্ম্ম যখন সমাজাভ্যন্তরস্থ সকল লোকে নীতিবিরুদ্ধ ও গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করে তখন সেই কর্ম্মকে আইনপ্রবর্ত্তকগণ আইন বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ফলে কালের প্রভাবে আদিম সমাজের কুকর্ম্মগুলা ক্রমে নীতিবিগর্হিত, পরে আইন বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।* দণ্ডের ভয়ে লোকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া আপনার সমাজকে উন্নত করে।

---

* বিলাতের একজন প্রধান আইন গ্রন্থ রচয়িতা Pike সাহেব বলেন—"The moralist may and frequently does influence the legislator and that which is but a moral lapse in one generation may become a criminal offence is anotner

কোন্ সমাজে নীতিজ্ঞান কিরূপ উন্নত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় সেই দেশের দণ্ডবিধি বিচার করা। যে সমাজ যত উন্নত হইয়াছে সেই সমাজ তত অধিক কার্য্যকে পাপ বা অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে ইংরাজ যখন ক্রীতদাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া মহাপ্রাণতা দেখাইয়াছিল তখন ইউরোপের অপর জাতি সকল ইংলণ্ডকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। এখন তাহারাও ইংরাজ মহাজন প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এক্ষণে ইংরাজ শাসিত প্রদেশ সমূহে সহৃদয় ইংরাজমনীষিদিগের প্রভাবে পশুক্লেশ নিবারিণী সভাসমূহ গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতির উদ্যোগে, তাহাদিগের সৎসাহসের প্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র অসহায় পশুদিগের নিগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় অপর জাতিদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে ইংরাজ জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহাদের সভ্যতা অপর দেশের সভ্যতা অপেক্ষা এ বিষয়ে অধিক।

উপরোক্ত কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়া বিষ্ণু সংহিতার দণ্ডবিধি অধ্যয়ন করিলে আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। অনেক স্থলে আমরা আধুনিক সভ্যতার চক্ষে বিচার করিলে লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান দেখিতে পাই বটে কিন্তু বিষ্ণু সংহিতায় যে সকল কার্য্য অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি প্রাচীন হিন্দুজাতি সভ্যতার কিরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যে সকল কর্ম্ম সভ্যতাভিমানী জাতি সকল নীতিবিগর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করে অথচ যেগুলাকে এখনও দণ্ডের দ্বারা দমন করিতে পারে না, প্রাচীন হিন্দু সমাজে সেই সকল কর্ম্ম পাতক মহাপাতক বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাদিগের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিষ্ণু সংহিতা হইতে আমরা সে সকল অপরাধের নামোল্লেখ করিব।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত হইলেও ইহা হইতে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্য জাতির দণ্ডবিধির ধারণা বুঝিতে পারা যায়। লর্ড মেকলে প্রভৃতি মনীষিগণ প্রভূত পরিশ্রমে সমগ্র পাশ্চাত্য দণ্ডবিধি আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সামান্য পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে এই গ্রন্থ বর্ণিত অপরাধই আধুনিক সভ্যজাতির নিকটেও অপকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের ফল স্বরূপ বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইব যে,ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সমস্ত অপরাধের উল্লেখ বিষ্ণু সংহিতায় পাওয়া যায়। উপরন্তু হিন্দু দণ্ডবিধির মধ্যে এমন অনেক পাতক বা অপরাধের বর্ণনা আছে, যে সকল কার্য্যকে নীতিবিগর্হিত মনে করিলেও পাশ্চাত্য সমাজ এখনও দণ্ডবিধির মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতে পারে না। অথচ সেই সকল বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুজাতি কতদূর করুণ হৃদয় ও পরদুঃখকাতর ছিল, এমন কি ইতর শ্রেণীর পশুদিগের জন্যও তাহারা কিরূপ সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিত।

(ক্রমশঃ)

আবদুল্লা।*

(১)

জীবনের এ কাহিনী যে কখনও মনুষ্য-কর্ণগোচর হ'বে, এমত আশা ছিল না। কিন্তু রুষরাজ-স্বাক্ষরিত ক্ষমাপত্রের অভয় পেয়েই এ ঘটনা অক্ষরাবদ্ধ করিতে সাহস পেয়েছি। নহিলে মনের গোপন-গুহাতেই ইহাকে চিরদিন লুকিয়ে রাখ্‌তে হ'ত।

বয়স তখন আমার একত্রিশের বেশি হ'বে না। লণ্ডন নগরের দক্ষিণে চিকিৎসকের ব্যবসা করিতেছি। ব্যবসায়ের পরিশ্রমে স্বাস্থ্যটার এমনি অবস্থা হ'ল যে বায়ুপরিবর্ত্তনের একান্ত আবশ্যক হ'য়ে উঠল। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে জলপথে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে মোরোকোর পথে যাত্রা করিলাম।

জাহাজ হ'তে নামিবার পর সেখানে কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম। আরে ছি ! ছি ! সেই আরবদেশীয় নোংরা কুলীদের অঙ্গভঙ্গী করে ডাকাডাকি, মোট নিয়ে টানাটানি—কি বিপদেই পড়েছিলাম ! আমার কথাও তা'রা বোঝে না, আর তা'দের ভাষায় তো আমি একেবারে পণ্ডিত মশায় ! যা'হোক বিধাতার ইচ্ছায় একটু কিনারা পাওয়া গেল। একটা মূর বালক একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে আমার সঙ্গে কথা কয়ে আমাকে কতকটা আশ্বস্ত কল্লে। তার সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণটা বাঁচলো। তাকেই আমার পথ প্রদর্শকরূপে সে দেশ দেখাবার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে একখানা গাড়ীতে উঠ্‌লাম ও হোটেলের দিকে নিয়ে যেতে বলে দিলাম।

* সঙ্কলিত।

চলেছি, কিন্তু পথ আর ফুরায় না! কত গলি ঘুঁজি দিয়ে যে সেই ছোট গাড়ী খানা জনতাভেদ করে ছুটতে লাগলো তার আর কি শেষ হয় না! একটু ভয় হলো! অপরিচিত স্থান—ভাবনা, এ ছোঁড়া হয়তো আমাকে বিপদে ফেলবে। কিন্তু গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবার জন্য উপর্য্যুপরি বলায়ও যখন সন্তোষজনক উত্তর পেলাম না, তখন আমার ধারণাটাই ঠিক বলে বোধ হ'ল। রাগে তার ঘাড়টা টিপে ধরে বল্লাম "এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি হোটেলে গিয়ে না পৌঁছুতে পারিস্ তবে তোর জীবন আমার হাতে জানবি!"

ও সর্ব্বনাশ! ছোঁড়াটা তো মূর বালক নয়. সেই মারের চোটেই তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি ঘুচে গেলো! সে দিব্যি আমারি মত আমার ভাষায় বল্লে, "ঈশ্বরের শপথ করে বলছি আপনাকে কোনও বিপজ্জনক স্থানে নিয়ে যাবো না। একটু নির্জ্জন স্থানে আপনাকে নিয়ে যাচ্চি—আমার দু'টো কথা আছে। আর আমার জীবন! সেতো সত্যই আপনারই হাতে।"

আমি অবাক্ হয়ে তার পানে চেয়ে রইলাম। তখনো আমার হাতটা তা'র ঘাড়ের উপরে ছিল; কিন্তু, তার কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রাণে কেমন একটা আঘাত লাগলো! সেই মুহূর্ত্তেই হাত নামিয়ে একটু সংযত ভাবে বল্লাম "আচ্ছা দেখি!"

ভালকথা, সে ছোকরার নাম—আবদুল্লা। অবশ্য সে নিজেই আমার কাছে এই নামে পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু, সেই মূর ছোকরা, আবদুল্লা হ'য়ে যে আমার ভাষায় কেমন ক'রে এমন কথা কইতে শিখ্‌লে, এইটা যখন ভাব্‌ছি, তখন দেখি সে আমাকে কতকটা নির্জ্জন পথেই এনে ফেলেছে। তারপর এক দোকানে এসে তার ভিতরের কয়েকটা নির্জ্জন কক্ষ অতিক্রম করে শেষ কক্ষের মধ্যে আমাকে এনে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে আমার সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। আমি বিস্ময়ে ও ত্রাসে কতকটা হতবুদ্ধি হয়ে তার পানে চেয়ে রইলাম।

সে আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, "আমি মূর নই। হাত মুখ সব রং করেছি।"

আমি বলিলাম, "আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম ছোক্‌রা!"

"আমি পুরুষ নই, স্ত্রীলোক!"

"কি বল্লে? স্ত্রীলোক! অন্তঃপুর হ'তে পালিয়ে এসেছ?"

মূর বালক (অবশ্য উপস্থিত বালিকা) বলিল "না—তা নয়। তবে আপনি

যদি না রক্ষা করেন তবে অন্তঃপুরই আমার একমাত্র রক্ষাস্থল। আপনি কি আমাকে রক্ষা কর্ব্বেন না? আমি রুষদেশীয় রাজদ্রোহীদের তালিকাভুক্ত উপস্থিত পলাতক। আমার নাম প্রিন্সেস্ চিরস্কি। আপনি বোধ হয় এ নাম শুনে থাক্‌বেন!"

আমি বলিলাম, "কই—না।"

"রুষরাজের পরিবারের মধ্যে যে বিদ্রোহ ঘটেছিল সে সংবাদ তো জানেন।" আমি ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—"হুঁ"।

"আমি সেই রুষরাজ পরিবারভুক্ত। বিদ্রোহের পর আমাকে ধরে ও আমার মৃত্যুদণ্ড হুকুম দেয়। কোনও রকমে আমি ফ্রান্সে পালাই বটে কিন্তু আমাকে ফরাসীরাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য রুষরাজ আজ্ঞা প্রচার করেন। অনেক কৌশলে ফরাসীদের জাহাজে করে এখানে এসে এই রং মেখে মূর বালক সেজে বেড়াচ্চি। বড় ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়! রাত দিন সন্দেহ—কেবল মনে হয় এই বুঝি গোয়েন্দা পিছু নিয়েছে। একটু স্বস্তি নেই। কি অবস্থায় যে দিন কাটাচ্চি, তা' আর কি বলব! এখন আপনি যদি রক্ষা করেন! আমার বোধ হচ্চে গোয়েন্দার হাতে আমাকে শীঘ্রই পড়তে হবে—তা' হ'লে সেই দণ্ডেই আমার মৃত্যু! আপনি কি রক্ষা কর্ব্বেন না? কোনও উপায়ে কি আপনাদের জাহাজে আমাকে গোপনে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন না?"

এই কথাগুলি বলে আবদুল্লা আমার হাতের উপর হাত রেখে আমার মুখের দিকে বড়ই করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল! রং মেখে কালো সাজলে কি হ'বে! তার মুখশ্রী যে অপরূপ! যেমন ভাসা ভাসা চোখ তেমনি সুন্দর নাক! গায়ে একটা ঢলঢলে পিরাণ্, পায়ে একজোড়া চটী আর মাথায় কাল টুপী—তা'তেই কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল!

আমি বলিলাম, "আমি যদি তোমাকে জাহাজে তুলে নিতে পারি তা' হ'লে তোমাকে আর সেখানে লুকিয়ে থাকতে হ'বে না। ব্রিটিশের পতাকা তলে—"

বালিকা অর্থাৎ আবদুল্লা একটা উপেক্ষার হাসি হেসে বল্লে, "আপনার ব্রিটিশ-পতাকাও আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার বোধ হয় তা'দের প্রতিও এই বহিষ্করণ-আজ্ঞা প্রচার হয়ে থাকবে।"

আমি একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলাম "সম্ভব বলে বোধ হয় না, আবদুল্লা!"

আবদুল্লা মনে মনে যেন কি একটা সমস্যার মীমাংসা করে নিয়ে বল্লে—"রাজনীতি বড়ই জটিল। আপনি জানেন না, তাই অমন কথা বলছেন।

রুষরাজ আমার বন্ধুদের প্রায় সকলকেই গুলি করে মেরে ফেলেছে। ব্রিটিশ-রাজের নিকট হ'তে তা'রা যদি আমাকে না পায়, তা' হ'লে তা'রা আমাকে গোয়েন্দা লাগিয়ে গুলি ক'রে হোক, বিষ খাইয়ে হো'ক্, জলে ডুবিয়েই হো'ক্ যেমন করে পারে মেরে ফেল্‌বে। রুষগভর্ণমেণ্ট আমার সন্ধান পেলে আমাকে কিছুতেই বাঁচ্‌তে দেবে না, আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না! একমাত্র উপায়—আপনার সঙ্গে গোপনে পলায়ন! আপনাদের জাহাজে আপনার কাছে যদি একটু স্থান দেন!"

আমি বলিলাম, "তাইত! বিশ্বাস করা—"

আবদুল্লা বাধা দিয়া বলিল, "আমি জানি। কিন্তু, আপনি যদি আমার কথায় অবিশ্বাস করেন, তা হ'লে মৃত্যুকেই আমার আলিঙ্গন কর্‌তে হ'বে।"

বিষম সমস্যায় পড়িলাম। একবার মনে হয় এর সকল কথাই কি সত্যি! সত্যই কি এ প্রিন্সেস্ চিরস্কি—রাজ সংসারের কন্যা! আবার কিন্তু তার সেই বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, সেই সুন্দর ভ্রূযুগল, সেই মুখশ্রীতে সে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর আমি তাহাকে বলিলাম "আবদুল্লা, তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্চে বটে, কিন্তু, তোমার দেহের বর্ণ ও আকৃতি যে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। তুমি সত্য করে বল, তুমি কি সত্যই রাজকুমারী?"

"সত্য বলছি।"

"তবে কি তুমি কেবলমাত্র পলাইতে চাও? আমাদের জাহাজের বা অন্য কাহারও কোনও ক্ষতি করিবে না তো?"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল্লা গম্ভীর হইয়া উঠিল ও ধীরে ধীরে বলিল, "কোন্ কথায় আপনাকে বিশ্বাস করাইব? ভগবানের শপথ করে বল্‌ছি আমার দ্বারা কাহারও কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

আমি বলিলাম, "উত্তম। তোমাকে তা' হলে আমার বালকভৃত্য হয়ে জাহাজে উঠ্‌তে হবে। কেমন?"

আবদুল্লা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তা' কি কখন হয়! জাহাজে উঠবার সময়েই তা' হলে তা'রা আমাকে সন্দেহ কর্ব্বে। এখানকার গোয়েন্দাদের প্রতারণা করা যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। আমার মতলব শুনুন। আমি এখানে যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি একজন মহাজন। বিলাতের জাহাজে তাঁর অনেক মাল প্রেরিত হয়ে থাকে। আপনাদের এ জাহাজ যখন যাবে আমি

তখন অন্যান্য কুলীদের সঙ্গে মাল ঘাড়ে করে শেষাশেষি গিয়ে জাহাজে উঠে পড়ব। তারপর জাহাজের খোলের ভিতর সেই সব মালের আড়ালেই এক-স্থানে লুকিয়ে থাকব। সেই সময় আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে। যে কয়দিন থাকবো সেই কটাদিন আমাকে যৎসামান্য খাবার ও জল দিতে হবে। পারবেন না কি ? –যদিই না পায়েন—মৃত্যু তো একদিকে আছেই !"

আমি বলিলাম, "আবদুল্লা, তুমি পাগল !"

সে একটু হেসে বল্লে, "হ'তে পারে।" পরক্ষণেই কম্পিতকণ্ঠে বল্লে, "কিন্তু, দেখছেন, যেদিকেই যাই না কেন মৃত্যু আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরছে !"

তার একথায় বিচলিত হয়ে উঠ্‌লাম। বল্লাম, "আবদুল্লা, মনে করো তাই যেন হ'লো। কিন্তু, তারপর ? ইংলণ্ডে গিয়ে জাহাজ হ'তে কি করে নাম্‌বে ?"

আবদুল্লা কাতর দৃষ্টিতে আমার প্রতি চেয়ে বল্লে, "জানি, বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার ! তবে মরণের দ্বারেই ত আছি, একবার শেষ চেষ্টা ! সে অবসরদানেও কি কৃপণতা কর্ব্বেন ?" সে কাতরতার সহিত আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলে।

আমি বলিলাম, "তুমিই যেন পাগল, আমি তো আর পাগল হই নি' ! তোমার জন্য শেষ কি আমিও প্রাণটা দেব ?"

সে বেশ স্থিরভাবে বল্লে, "সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয় ! তা'রা যদি জান্‌তে পারে যে আপনি আমার পলায়নে সহায়তা কচ্চেন তবে আপনার ও তা'রা প্রাণদণ্ড কর্ত্তে পারে ! দেখুন, লণ্ডনে আমার অনেক বন্ধু আছেন ; তা'দের কাছে আমার অনেক সম্পত্তি আছে। আপনাকে আমি যথেষ্ট অর্থ দিতে ও দেওয়াতে পারি ; কিন্তু আপনি যে সামান্য অর্থলোভেই একার্য্যে অগ্রসর হবেন, আমি তা' মনেও করি না। এক জাহাজ লোকের মধ্য হ'তে আমি আপ-নাকেই বেছে বাহির করে নিয়েছি।"

"আমাকে ! কেন আবদুল্লা !"

"কেন ! তা বল্‌তে পারি না। তবে যত লোককে নাম্‌তে দেখেছিলাম, তার মধ্যে আপনাকে দেখেই আমার মন যেন আমাকে বল্লে যে,এই ঠিক মানুষের মত মানুষ ! এর দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হ'বার সম্ভাবনা। হাঁ, ঠিক তাই-- আপনার মধ্যে যে যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। নইলে আমার দুঃখের কথা আপনি এত মনোযোগের সহিত শুনবেন কেন ? কে কা'র দুঃখের কথা শোনে !"

আমি বলিলাম, "আবদুল্লা, তুমি দেখছি যাদু জান! কোন্ মন্ত্রের বলে আমাকে এমন বশ করে ফেল্লে!"

আমার কথা শুনে সে একটু হা'স্‌লে। সে হাসি তার চোখের—নিমেষে ফুটে উঠ্‌ল, নিমেষেই মিলিয়ে গেল। সে হাসির অর্থ কি বুঝান যায়!

আমি বলিলাম, "কিন্তু দেখ, তুমি যদি জাহাজের খোলের ভিতর লুকাতে না পার, তা' হ'লে আমি জাহাজের কাপ্তেনকে বলে তোমার জন্যে একটু আশ্রয়ের ভিক্ষা চাইব। আমার জন্যে যে তুমি অনাহারে মারা যাবে, আমি তেমন কাজ পারব না।"

সে ব্যস্ততার সহিত বললে 'না না তা' হবে না। আমি যদি অনাহারে মরি সেও আমার পক্ষে ভাল, তবুতো মনে জানব যে, আমি একজন বীরের আশ্রয় নিয়েছি, একজন প্রকৃত পুরুষের আশ্রয় পেয়েছি!" এই কথা কয়টী বলেই সে যেন আমার ক্রীতদাসের মত সেই ধূলার উপর হাঁটু গেড়ে বসে আমার হাতে চুম্বন করতে লাগ্‌লো। কিন্তু,সত্য কথা বলতে কি, সেই সময় আমার মনে হ'ল যে, এই আবদুল্লাই বুঝি আমাকে তার ক্রীতদাস করে ফেললে!

(২)

আজ বিলাতে ফিরিব। জাহাজে বসে সেই মূর কুলীদের মাল বোঝাই দেখছি বটে; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আমার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিটা সেই মূর আবদুল্লার অন্বেষণেই ঘুরছিল। কিছু পরে দেখলাম, আবদুল্লা একটা মোট লয়ে জাহাজের খোলর ভিতর নেমে গেল। দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত সেই দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। কিন্তু তা'কে আর বাহির হ'তে দেখলাম না। আমাদের জাহাজও অপরাপর কুলীদের নামিয়ে দিয়ে মোরোকো বন্দর ত্যাগ করে বিলাত অভিমুখে চলিল। বড়ই ভয় হ'ল! ভাবলাম, সাধ করে এ বিপদ কেন ঘাড় পেতে নিলাম! কি আহাম্মকিই করেছি! ছি ছি! আপনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিলাম! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, আর আত্মগ্লানিতে ফল কি! এখন যেমন ক'রে হো'ক্ একটা উপায় দেখতে হবে।

সন্ধ্যার পর আমাদের আহারের ঘণ্টা পড়ল। আমি কিন্তু ঠিক সে সময়ে গেলাম না। যখন অন্যান্য সকলের আহার প্রায় শেষ হ'ল, আমি সেই সময়ে গিয়ে আহারে বসিলাম। আহার সমাপন করে সকলেই প্রায় চলে গেল। সেই অবসরে আমি দুই পকেট ভরে ফল ও বিস্কুট লয়ে আমার কেবিনে এসে একটু বিশ্রাম করতে লাগলাম।

কিন্তু আরাম উপভোগ করবার কি সেই সময়! আমার প্রাণটা যে তখন কি রকম ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে তা' আর কাহাকে বুঝাব! কেবিন ত্যাগ করে জাহাজের খোলের উপরের রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। সেই খোলের ভিতরটা মালে পূর্ণ—ততোধিক পূর্ণ দেখলাম সূচিভেদ্য অন্ধকারে। সেই ঘোর অন্ধকারে আবদুল্লা একা আছে—রাজকুমারী চিরাস্কি অন্ধকারকে জড়িয়ে নিয়ে আছে! এখন অন্ধকারই তার একমাত্র ভরসা! এই কথা যখন ভাবছি, সেই সময় কাপ্তেন এসে আমার পার্শ্বে দাঁড়াল। তা'কে নিকটে পেয়ে ভাবলাম, এর সঙ্গে পরামর্শ করে যদি আবদুল্লার একটা কিছু উপায় করতে পারি তা'র চেষ্টা একবার দেখি। সেই জন্য তা'র সঙ্গে আলাপ করে কথা প্রসঙ্গে রুষ বিদ্রোহের কথা পাড়লাম।

কাপ্তেন রুষ বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিবৃত করে উপসংহারে বল্লে, "মশায়, আমাদেরও বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়েছে। রুষরাজদ্রোহী রাজকুমারী চিরস্কি যাতে কোন প্রকারে লুকিয়ে আমাদের জাহাজে উঠতে না পারে, সে জন্য আমাদিগকে বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হয়েছে। বলব কি, তা'কে ধরিয়ে দিতে পার্‌লে রুষ গভর্ণমেণ্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। তা' ছাই আমার কি আর সে কপাল, যে চিরস্কি আমারই জাহাজে এসে উঠ্‌বে। তা' বলে, যেন আপনি মনে কর্ব্বেন না যে, আমি স্ত্রীজাতির উপরে এমনি খড়্গ-হস্ত। স্ত্রীলোক বলে নয়—রাজদ্রোহী বলে, তা' সে যেই হোক। যে রাজদ্রোহী, সে পুরুষও নয় রমণীও নয়; সে একটা হিংস্র ইতর জীববিশেষ। সে রকম লোককে ধরিয়ে দিতে আমি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করি না।"

কাপ্তেনের এই কথাগুলো যেন আমাকে বর্ষার মত বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো। কথাগুলা যে সে অন্যায় বলেছিল, তা' নয়। তবে এই সকল কথা যদি আবদুল্লা শুন্‌তে পেয়ে থাকে—আমরা তো তা'র মাথার উপরেই দাঁড়িয়ে আছি—আহা, সে তবে কি ভাবছে!

আবদুল্লাকে একটু আশা দিবার জন্য আমি কাপ্তেনকে বলিলাম, "দেখুন একটা কথা ভেবে দেখ্‌তে হবে। যে দেশে স্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত রাজদ্রোহী হয়ে উঠে, সে দেশের রাজা যে কতদূর অত্যাচারী সেইটা চিন্তা করা উচিত। আমার মনে হয় আমি যদি সেই রাজকুমারীকে পাই তবে তাকে তখনি ছেড়ে দিই।"

কাপ্তেন বেশ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল "আমি তা' দিই না। পঞ্চাশ

হাজার টাকা পেলে আমার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে খেয়ে বাঁচে; আর আমিও এ চাকরি ছেড়ে একটা বড় কাজ আরম্ভ করে দি'। কেন? যে স্ত্রীলোক বোমা ফেলে মানুষ হত্যা করে, তা'কে পালাতে দেব?"

"সত্যি! সত্যিই কি চিরস্কি বোমা ফেলেছিল?"

কাপ্তেন বেশ একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়। কিম্বা সুবিধা পেলেই যে সে ফেলিত সেটা তো নিশ্চয়।" এই কথা বলিয়াই কাপ্তেন কণ্ঠস্বরটা একটু খাদে ফেলিয়া বলিল "যাক্ মশায়, ওসব কথায় আমাদের আর আবশ্যক নাই। রাত্ অধিক হয়েছে। আমি তবে চলিলাম। নমস্কার মশায়!"

কাপ্তেন জাহাজের অন্যদিকে চলিয়া গেল। তখন প্রায় সকলেই আপন আপন কেবিনে শয়নের আয়োজন করিতেছে। জাহাজের ডেক্‌টা প্রায় একরূপ জনশূন্য। সেই অবসরে আমি একগাছি দড়ি ধরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলের ভিতর নামিলাম। ভিতরটা কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! খুব সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে খোলের ভিতর পৌঁছে খুব ভাল করে একবার চেয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা করিলাম। কারণ, সেই পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে আমার নয়নযুগল নেহাৎ বেকার ভাবে শ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হ'য়ে আপনা আপনিই মুদে আস্‌ছিল। তার পর খুব চাপা আওয়াজে "আবদুল্লা" "আবদুল্লা" বলে বারদুই ডাক্‌লুম।

মালগুলোর ভিতর হ'তে একটা খস্ খস্ করে আওয়াজ হ'ল। তার পর সেই স্থান হ'তেই অতি ক্ষীণকণ্ঠে ধ্বনিত হল, "এসেছেন, দয়া করে এসেছেন! আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা তো আমি জানি না। আমি আর কি বলব! ভগবান আপনাকে জয়যুক্ত করুন, আপনার মঙ্গল করুন!...... আপনার কাছে সত্য করেই বল্‌ছি, আমি কিন্তু কখনও বোমা ফেলি নি'!" সেই কণ্ঠস্বরে আমার মনে হলো যেন সে দারুণ দুঃখে ও বিপদে নিতান্তই ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছে। ক্ষণপরেই তার যেন বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস পড়িতে শুনিলাম—প্রাণটা বড়ই কাতর হয়ে উ'ঠল!

আমি বলিলাম, "হায় হতভাগিনী, কোথায় তুমি!"

সে ধীরে ধীরে কতকটা ঠাওর করে এসে আমার হাত ধরে বল্লে "এই যে আপনার দাসানুদাস আবদুল্লা।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম "কার্য্য গতিকে কিন্তু আমাকেই আবদুল্লার

দাসানুদাস হতে হয়েছে।" সে আমার হাতটা সজোরে টিপিয়া দিল। আমি তা'কে পাশে লয়ে সিঁড়ির উপর বসিলাম ও বিস্কুট ও ফল প্রভৃতি খাইতে দিলাম। আমি তাহার জন্য এক বোতল জল ও একখানি কম্বলও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য কম্বলখানি পেয়ে তা'র যে কি আনন্দ হ'ল তা' আর কি বলিব!

আহারান্তে সে বলিল, "আপনি যখন উপরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গল্প কচ্ছিলেন, আমি তখন আপনাকে নীচে হ'তে এই সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম। আপনাদের কথাও আমি সব শুনেছি। কিন্তু কাপ্তেন আমার সম্বন্ধে যা বল্লেন, আপনি দয়া করে আমার বিষয় সে ধারণাটা রাখ্‌বেন না।"

আমি বলিলাম, "এখন তোমার বিষয় একটা মন্দ ধারণা পোষণ করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে প্রিন্সেস্!"

সে ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে "আমাকে প্রিন্সেস্ বলে সম্বোধন কর্ব্বেন না। আমি আপনার অধম দাস আবদুল্লা। আমাকে আপনি যেন একটা হীনপ্রকৃতির মানুষ বলে না বোঝেন, এই আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। রুস-বিদ্রোহের প্রকৃত কারণটা এখন শুন্‌বেন কি? না থাক—রাত্ অনেক হয়েছে—আপনার শোবার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে! আমি কি স্বার্থপর!"

আমি একটু হেসে বল্লাম "আমি তোমার কাছে আর খানিকক্ষণ থাক্‌লে কি তুমি সুখী হও?"

"হই, তবে আপনাকে কষ্ট—" আমি বাধা দিয়া বলিলাম "কিছু না।" সে বেশ সংক্ষেপে সমস্ত ইতিহাসটা আমাকে বুঝিয়ে দিলে। সকল কথা শুনে আমি বলিলাম, "আনন্দের বিষয় এই যে, তোমার দ্বারা কোনও গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হয় নি'।"

সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "তবে আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস হয়েছে! এখন আপনাকে আমার বন্ধু বলে দাবী কর্ত্তে পারি!"

আমি বলিলাম "তোমার দাবী করিবার পূর্ব্বেই তো আমি তোমাকে বন্ধুরূপে বরণ করেছি আবদুল্লা!"

(৩)

এই ভাবেই এ কয় দিন আমাদের কাটিয়াছে। কাল প্রাতে আমাদের ইংলণ্ডে পৌছিবার কথা। দারুণ উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিনটা কেটে গেল। গভীর রাত্রে অতি সংগোপনে আবদুল্লাকে আমার কেবিনে লয়ে এলাম। খুব ভাল

সাবান দিয়ে সে তার মুখের ও হাতের রং গুলো ধুয়ে ফেল্লে। তার মাথার চুল আমাদেরই মত ছোট ছোট ছিল। প্রভাতের পূর্ব্বেই তা'কে আমার একটা ঢিলা পায়জামা পরিতে দিলাম। তার দীর্ঘাকৃতির দরুণ সেটা একেবারেই অমানান হয় নি'। বরং সে যখন কোট, প্যাণ্টেলুন ও হ্যাট্ পরে দাঁড়াল, তখন তাকে একজন নব্য ছোকরা না বলে সাধ্য কার!

সৌভাগ্যক্রমে আমার কেবিনটা জাহাজের এক পাশের দিকে ছিল; সে দিকে লোকজনের যাতায়াতও কিছু কম। জাহাজ থামিবার কিছু পরে সে ছড়ি হাতে করে আমার আগে আগে চলিল, যেন সে আমাকে জাহাজ হ'তে নিতে এসেছে। আমিও তাকে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বলিতে বলিতে চলিলাম। বিধাতার আশীর্ব্বাদে তা'কে লয়ে নিরাপদে বাসায় পৌঁছিলাম।

কিন্তু আমার মত দীন দরিদ্রের বাসায় প্রিন্সেস্ চিরস্থির স্থান কি হ'তে পারে? একদিন না একদিন সে তার ঐশ্বর্য্য ও অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত হবে। বিশেষতঃ, তার বড় লোক বন্ধুবান্ধব যখন এখানে রয়েছে, তখন আমার এ সামান্য উপকার স্মরণ করে সে যেতে না চাহিলেও আমি তা'কে আমার কাছে রেখে কেন কষ্ট দিই! কাজেই আমি তাকে বাধ্য হ'য়ে সকল কথা খুলে বল্লাম। সে অনেক বাদানুবাদের পর নিরুত্তর হ'ল বটে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়ল!

আমি বলিলাম "আবদুল্লা, কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা কর, যদি কখনও এ দীনের সাহায্য আবশ্যক হয়, তবে আমাকে স্মরণ কর্ব্বে?" সে অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া গেল।

(৪)

সন্ধ্যার সময় আমার কক্ষে সহসা এক সুন্দরী যুবতীর আবির্ভাবে আমি বিস্মিত হইলাম। দেখি এ যুবতী আমার সেই আবদুল্লা। আবদুল্লা এখন রমণীর পরিচ্ছদ পরিহিতা।

ইহার মধ্যে এখন আর সেই আবদুল্লার—সেই ছোকরার হাবভাব কিছুমাত্র নাই। তাহার মুখের প্রতি চাহিবামাত্র সে লজ্জায় মুখ নত করিল। এখন রমণীর রমণীয়তা যেন তা'র সর্ব্বাঙ্গেই জড়িত রহিয়াছে। তাহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আমি যেমন সসম্ভ্রমে চেয়ার হইতে উঠিতে যাইতেছিলাম, সে ত্রস্তভাবে আমার দুই কাঁধে তাহার হাতের ভর দিয়া আমাকে বসাইয়া দিয়া বলিল, "ইহারই মধ্যে আমাকে তোমার সাহায্যপ্রার্থিনী হয়ে আস্তে হয়েছে। অবশ্য তোমার এ সাহায্য আমার জীবনব্যাপী আবশ্যক। এখন হ'তে আর তোমাকে 'আপনি' বলিব না—সে সম্বন্ধ দূর হো'ক্! মনে পড়ে কি, সেই কাল, কুৎসিত ছোক্‌রা আবদুল্লাকে বলেছিলে যে "তুমি কি যাদু জান, কোন মন্ত্রের বলে আমাকে বশ করে ফেল্লে।" এখন বল—একবার সেই কথা বল—সত্যই কি তোমায় পাবার আশা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা?"

কলিকাতা ৫।১২ সুকীয়া ষ্ট্রীট মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।